শুক্লসন্ধ্যা

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী

ত্রিবেণী প্রকাশন
২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৬৬

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
ভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড় বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক
সিগনেট ফটো টাইপ
১২৩ বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
স্কোয়ার প্রিণ্টার্স

বাঁধাই
ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্ক্‌স্

দাম : পাঁচ টাকা

ডক্টর ধীরেন্দ্রলাল দাস

সুহৃদ্বরেষু—

এই লেখকের

বন্ধনী

আকাশ ও মৃত্তিকা

পান্থনিবাস

ঘরের ঠিকানা

বসন্ত রজনী

নতুন ফসল :

ময়ূরাক্ষী,

গৃহকপোতী

সোমলতা

শতাব্দীর অভিশাপ

কালোঘোড়া

ক্ষুধা

শৃঙ্খল

মনের গহনে

হংসবলাকা

মধুচক্র

বহ্ন্যুৎসব

মহাকাল

কৃশানু

অনুষ্টুপ্‌ ছন্দ

তিমির-বলয় (১ম ও ২য় পর্ব)

নীলাঞ্জন

শ্রেষ্ঠ গল্প

মধুমিতা

এই উপন্যাসটি ১৩৬৫ সালে শারদীয় সংখ্যা 'বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। তার পরে অনেক পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে।

অহল্যার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়। গ্রীষ্মকালেও আটটার আগে সে উঠতে পারে না। বলে, রাত্রে তার নাকি ঘুম হয় না। ভোরের দিকে ঘুম আসে। কাজেই উঠতে বেলা হয়।

সীতানাথ এজন্যে বড় উদ্বেগ বোধ করে। অনিদ্রা-রোগ ভাল নয়। বলে, সময় থাকতে ডাক্তার দেখানো দরকার।

অহল্যা গ্রাহ্যই করে না। হাসে। বলে, ভারি তো রোগ, তার জন্যে ডাক্তার দেখানো!

সীতানাথ রোগের গুরুত্ব ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে। অহল্যা শুনতেই চায় না। বলে, বোঝাওগে তোমার মক্কেলদের, যেখানে ফি পাবে। আমাকে বুঝিয়ে লাভ নেই।

অগত্যা সীতানাথ লাইব্রেরি-রুমে গিয়ে মক্কেল নিয়ে পড়ে, আর অহল্যা যথারীতি আটটাতেই প্রত্যহ উঠতে থাকে। সীতানাথ থেকে আরম্ভ করে বাড়িশুদ্ধ সবাই কিছুকাল পরে অহল্যার রোগের কথাটা ভুলেই গেল। কেবল একটা জিনিস রয়ে গেল। সে হচ্ছে, সকালে যতক্ষণ সে ঘুমিয়ে থাকে, বাড়ির ম'নব থেকে ছেলেমেয়ে, এমন কি চাকর-বাকর পর্যন্ত সেই সময়টা তার ঘরের সামনে দিয়ে পা টিপে-টিপে হাঁটে। পাছে অসময়ে তার ঘুম ভেঙে যায়। এ বাড়িতে এইটেই এখন সর্বজন-প্রতিপালিত প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে।

ঘুম থেকে কখন সে উঠবে, ঠাকুর-চাকর উৎকর্ণ হয়ে থাকে। তার নড়া-চড়ার শব্দ পেলেই বিছানার কাছে চা নিয়ে আসে। আধ-শোয়া অবস্থায় চা টুকু খাওয়ার পরও কিছুক্ষণ সে অবশভাবে পড়ে থাকে। তারপরে বাথরুমে যায়।

স্নান সেরে ফিরে এসে যখন সে ওপরে তার নিজের বসবার ঘরে এসে বসে তখন আসে প্রাতরাশ। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে অহল্যা অলসভাবে ঠাকুর-চাকরের সঙ্গে গৃহস্থালীর কথা বলে।

সেদিন সে সবে তার বসবার ঘরে সোফায় এসে বসেছে, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। তখন আটটা পঁয়ত্রিশ কাঁটায় কাঁটায়। রিসিভার

তোলবার আগেই অনুমান করতে অসুবিধা হল না, এমন সময় একেবারে ঘড়ি ধরে কে টেলিফোন করতে পারে।

—হ্যালো!

—ঘুম ভেঙেছে?

—অনেকক্ষণ।

—বাজে কথা বোল না। এখন সবে আটটা পঁয়ত্রিশ।

—পঁয়ত্রিশ মিনিট কি কম সময়! এর মধ্যে একটা যুদ্ধে জয়-পরাজয় স্থির হয়ে যায়। তার পরে বল

—বলছিলাম, তোমার কিছু হারিয়েছে?

—হারিয়েছে।

—কী বল তো?

—মন।

—সে কোথায় হারিয়েছে তুমিই জান।

—তুমি জান না?

—না। তা ছাড়া আর-কিছু হারিয়েছে?

—তা ছাড়া আর কিছুই তো আমার নেই।

—কিচ্ছু না?

—আর কী থাকবে বল? দেহ আর মন। দেহ আমার নয়, মনও হারিয়েছে।

—দেহের সংলগ্ন কিছু? মনে কর, কানের হীরের দুল এক জোড়া?

—সে-ও তো আমার নয়।

কিন্তু বলতে গিয়েও অন্যমনস্কভাবে অহল্যা কানে হাত দিয়ে দেখলে। দুল নেই সত্যিই।

—কার তবে?

—দেহের যে মালিক তার। ইচ্ছে করলে

—শোন। আমার বিছানা ঝাড়তে গিয়ে বালিশের তলায় ও-দুটো দেখতে পেয়ে চাকরটা দিয়ে গেল। কী করব বল তো?

—বেচে দাও।

—দিয়ে নিলে কী হয় জান না?

—জানি, কিছু হয় না।

—হয়। কালীঘাটের কুকুর হয়।

—কালীঘাটের কুকুরের ওপর তোমার অত ঘেন্না কেন? বেচারা মা-কালীর চরণাশ্রিত জীব।

—সেই জন্যেই তো আপত্তি। যে চরণ আশ্রয় করে আছি, তা ছেড়ে আর স্বর্গে যেতেও ইচ্ছে নেই।

—মিষ্টি মিথ্যে কথা খুব বলতে শিখেছ!

—মিষ্টি, কিন্তু মিথ্যে নয়। শোন, ওটা কি কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দোব, না, তুমি এসে নিয়ে যাবে?

—তোমার কী ইচ্ছে?

—বলা বাহুল্য, শেষেরটা।

—যো হুকুম।

আরও দু-চারটে কথাবার্তার পর অহল্যা রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিলে। তার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার ঠোঁটের কোণে একটুখানি বাঁকা হাসির রেখা খেলা করতে লাগল।

টেলিফোন করছিল অংশুমান। সার্ অংশুমান মিত্র। প্রকাণ্ড বড় শিল্পপতি। তার মোটা মোটা থাবায় মুঠো মুঠো সোনা উঠে আসে। কত যে কারবার তার ইয়ত্তা নেই।

বাংলা দেশে একটা বিখ্যাত নাম।

যেমন প্রকাণ্ড দেহ, তেমনি প্রখর বুদ্ধি আর তেমনি প্রবল প্রতাপ। মেঘগর্জনের মত কণ্ঠস্বর। দুই চোখে রুদ্র তেজ। ললাটে প্রলয়ঙ্কর ভ্রূকুটি। সারা দেশ তার সামনে তটস্থ, যুক্তপাণি। ইংরেজ তাকে খাতির করে, কংগ্রেসেরও সে স্তম্ভবিশেষ। তাকে পাশ কাটিয়ে কোনোদিকে যাবার পথ নেই।

অহল্যার সঙ্গে পরিচয় তার আজকের নয়। বলতে গেলে, তখন অহল্যা নিতান্ত শিশু। কী যেন প্রয়োজনে অংশুমান আসত ওর বাপের কাছে। প্রায়ই আসত। অহল্যার বাবা ওকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

কিন্তু ভদ্রলোক একদিন হঠাৎ মারা গেলেন। এবং বাঙালী ভদ্রলোক হঠাৎ মারা গেলে যা হয়, ওদেরও তাই হল।

বাড়িতে চিররুগ্না মা এবং অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। বড় ছেলেটি সেই-বারই বি-এ পাস করেছে। অংশুমানের কারবার তখন খুব বড় নয়। তবু ছেলেটিকে তৎক্ষণাৎ নিজের অফিসে একটি মাঝারি গোছের চাকরি দিলে।

তাতে করে ওদের দুবেলা দুটি শাকান্নের ব্যবস্থা হল বটে, কিন্তু একটি ভদ্র গৃহস্থ-পরিবারে অন্যান্য যে সব প্রয়োজন থাকে তা মেটবার কথা নয়। সেই প্রয়োজন অকাতরে অংশুমান নিজের মাথায় তুলে নিলে।

অহল্যার সেইবার ম্যাট্রিকুলেশন দেবার কথা।

মা বললেন, আর পড়ে কাজ নেই। একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখ। দাদা একাই বা করবে কী?

অংশুমান বললে, সে কি একটা কথা হল? ম্যাট্রিকটা পাস না করলে চাকরি-বাকরিই বা পাবে কোথায়?

অহল্যা ম্যাট্রিকুলেশন তো দিলেই, তার পরেও এম-এ পর্যন্ত পাস করলে অংশুমানেরই সাহায্যে। আর তাও নিতান্ত যেমন-তেমন করে পড়া নয়, বড়লোকের মেয়ে যেমন করে পড়ে তেমনি করে পড়েছে। তার সাজ-পোশাক চাল-চলন সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থকন্যার মত ছিল না।

সর্বশেষে তার বিবাহও অংশুমানই দিয়ে দিয়েছে।

অহল্যার মা আজ বেঁচে নেই, কিন্তু বিবাহের সময় ছিলেন। এবং তার পরেও জীর্ণ দেহটাকে নিয়ে আরও কয়েক বৎসর বেঁচে ছিলেন। এই বিবাহে তিনি খুশি হন নি।

পাত্র হিসাবে সীতানাথ খারাপ তো নয়ই, বরং ওদের সাংসারিক অবস্থার পক্ষে যথেষ্ট লোভনীয়। আইন পাস করে তখন সে ওকালতি আরম্ভ করেছে। তখনও পশার তেমন না জমলেও বোঝা যেত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সীতানাথের পক্ষে পশার জমানো অদূরভবিষ্যতে কঠিন হবে না।

তথাপি এই বিবাহে অহল্যার মা মনে মনে খুশি হন নি। তাঁর মনে মনে কেমন একটা প্রত্যয় জন্মেছিল যে, অংশুমানের সঙ্গেই অহল্যার একদিন বিবাহ হবে। উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য অনেকখানি থাকলেও অহল্যার উপর অংশুমানের স্নেহ তাঁর মনে বিশ্বাস এবং অংশুমানের ক্রমবর্ধমান ঐশ্বর্য লোভ জাগিয়েছিল।

তিনি আরও আশ্চর্য হয়েছিলেন এই জন্যে যে, অহল্যা এই বিবাহে কোনো প্রকার আপত্তি করে নি। স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছিল।

মা এ নিয়ে মুখ ফুটে কোনোদিন কন্যার সঙ্গে আলোচনা করেন নি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে তার মনের ভাব অনুমান করার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। কিন্তু কিছু অনুমান করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না।

একদিন কেবল অংশুমানকে কথায় কথায় বলেছিলেন, অহল্যার বিয়ে তো দিলে, এইবার নিজে একটা বিয়ে কর।

উত্তরে অংশুমান হেসে বলেছিল, বিয়ে যে করব তার ফুরসুত কোথায়?

—কেন, বিয়ে করতে আর কত সময় লাগে?

—ওরে বাবা! অনেক সময় লাগে।

অহল্যা হেসে বলেছিল, তুমি মিথ্যে অনুরোধ করছ মা। যে সময়টা ও বয়েতে খরচ করবে তার মধ্যে কয়েক হাজার টাকা রোজগার করে ফেলবে। সে লোভ ও ছাড়তে পারে?

কে জানে সেই জন্যে কি না, কিন্তু অংশুমান বিয়ে করে নি। অহল্যাকেও না, অন্য কাউকেও না। তার প্রকাণ্ড বড় গৃহ গৃহিণী-বর্জ্জিত। বাবুর্চি-খানসামার কারবার। তারাই যা পারে করে।

মাঝে মাঝে অহল্যা গিয়ে গুছিয়ে দিয়ে আসে। দূর-সম্পর্কের আরও আত্মীয়া মহিলারাও আসে। তারাও আবশ্যকমত গোছগাছ করে। কিন্তু অংশুমানের নিজের এ বিষয়ে কোনো উৎসাহ আছে বলে মনে হয় না। তার কাছে গোছালো-অগোছালোর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলেও বোধ হয় না।

আসলে সে সম্বন্ধে লক্ষ্য করবার মত তার সময়ও নেই। দিনের অধিকাংশ ভাগ কাটে বাইরে-বাইরে। সমস্ত দিন টাকার পিছনে ছুটে ছুটে সন্ধ্যার পরে যখন ফেরে তখন গৃহশ্রী দেখবার মনও থাকে না, দৃষ্টিও থাকে না। তখন সে ক্লান্ত। মন তখন অন্য আনন্দ চায়।

তখন কোনোদিন আসে অহল্যা। কোনোদিন বা অন্য কোনো নারী। এবং তখন আর দিনের সেই মানুষটি ও নয় যে কঠিন, কঠোর, নির্মম এবং স্বার্থপর।

সমস্ত দিন ওর মনের মুঠি বন্ধ থাকে। সকল সময় সতর্ক। সমস্ত কিছুতে সন্দেহ, কোথায় কে তাকে ঠকায়! সে সবাইকে ঠকাবে, কিন্তু তাকে কেউ ঠকাতে পারবে না, সেইজন্যেই কঠিন সতর্কতা। কর্মচারীরা সন্ত্রস্ত। তার সঙ্গে যাদের কারবার তারাও সতর্ক।

দিনে অংশুমান হাসে না। কিংবা যখন হাসে, লোকে তখন আরও সতর্ক হয়।

অহল্যার প্রাতরাশ শেষ হল। খবরের কাগজের ওপরও মোটামুটি চোখ বুলনো শেষ হল। এইবার সে একখানা মাসিকপত্র নিয়ে পড়ল। কয়েক পাতা উলটে দেখল, এটা ক'দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। বিরক্ত ভাবে একখানা ইংরিজী উপন্যাস আলমারি থেকে বের করল। এবং সেখানার কয়েক পৃষ্ঠা পড়েই উঠে দাঁড়াল।

সীতানাথের খাবার দেওয়া হয়েছে।

এও একটা আশ্চর্য রহস্য!

এই ঘরে বসেই সে টের পায়, কখন সীতানাথের খাবার দেওয়া হল। এবং তখনই সমস্ত কাজ ফেলে উঠে দাঁড়ায়। হয় সে তার একটা কান খাবার-ঘরের টেবিলের কাছে পেতে রাখে, নয় দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে এই ক্ষমতাটা অর্জন করেছে।

অহল্যা খাবার-ঘরে গিয়ে টেবিলের কাছে একটি চেয়ারে বসল। একবার সীতানাথের পাতের দিকে চেয়ে দেখলে, সমস্ত জিনিস যথাযথ দেওয়া হয়েছে কি না! তার পরে হাতের উপন্যাসটা খুলে সম্ভবত পড়তেই লাগল।

- কী বই ওটা?—সীতানাথ জিজ্ঞাসা করলে।

বই থেকে চোখ না তুলেই অহল্যা গ্রন্থকার এবং উপন্যাসের নামটা জানালে।

—সবে শুরু করছ?

অহল্যা ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

—ভাল লাগলে বোল।

এইটেই ওদের পদ্ধতি। উকিল হিসাবে সীতানাথের খুব নাম হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় যথেষ্ট মক্কেলের ভিড় জমে। সাহিত্যে তার অনুরাগ আছে, কিন্তু পড়বার সময়ের একান্ত অভাব।

প্রতি মাসে অহল্যার প্যাকেট-প্যাকেট বই আসে, বাংলা এবং ইংরিজী। সাহিত্যই বেশি। অহল্যা সাহিত্যের ছাত্রী। ভাগ্যক্রমে লেখার বাতিক পায় নি, কিন্তু পড়ার বাতিক প্রচুর। তা ছাড়া সময় কাটাবার অন্য উপলক্ষ্যই বা কী আছে?

আজকের দিনে উপলক্ষ্য একটা কেন, একাধিক সৃষ্টি করা তার পক্ষে কঠিন হত না। ক্লাব-পার্টির অভাব তো নেই। তাতে যোগ দিলে প্রচুর উত্তেজনার মধ্যে হু-হু করে সময় কেটে যেত।

কিন্তু ওর মনের গড়নটা অন্য রকম। শান্ত, গম্ভীর। হট্টগোল ও সইতে পারে না। নিরিবিলি থাকতে ভালবাসে। যে-কারণে এ বাড়িতে ছেলে-মেয়ে থেকে দাসী-চাকর পর্যন্ত কেউ জোরে কথা বলে না, এবং যে-কারণে সকলেই এই গম্ভীর স্বল্পভাষিণী মেয়েটিকে সমীহ করে চলে। মায় সীতানাথ পর্যন্ত।

সুতরাং বেশির ভাগ সময় ওর পড়াশোনা নিয়েই কাটে। কখনও কখনও বোনার কাজও করে।

অহল্যা পড়ে। যা আসে সমস্ত বই-ই পড়ে। যেগুলো ভালো লাগে, কেনে। যেগুলো ভালো লাগে না, সেগুলো ফেরত দেয়। কিন্তু যেগুলো ভালো লাগে, তারও সংখ্যা কম নয়। সীতানাথের অত বই পড়ার সময় নেই। ফুরসতের মধ্যে শনিবার রাত্রি আর রবিবার সকাল আর লম্বা ছুটির দিনগুলো।

সেই সময়টা সীতানাথ পড়ে। সব বই নয় এবং বাংলা বই প্রায়ই নয়—শুধু যে-বইগুলো অহল্যার খুব ভালো লাগে সেইগুলো।

সীতানাথের কথায় অহল্যা আবারও ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

হঠাৎ সীতানাথের চোখ পড়ল অহল্যার কানের দিকে।

জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কানের দুল কী হল ?

অহল্যা এই আকস্মিক প্রশ্নে চমকে উঠল কি না বোঝা গেল না। ভারি শক্ত মেয়ে। সহজে কেউ তার মনের ভাব বুঝতে পারে না। কিন্তু এবারে সে চোখ তুলে চাইলে।

হেসে জিজ্ঞাসা করলে, কেন ? দুল নিয়ে কী করবে ?

প্রশ্নের ধরনে সীতানাথ হেসে উঠল : আমি কিছু করব না। কান দুটো খালি দেখছি, তাই জিজ্ঞেস করছি।

হাতের বই বন্ধ করে অহল্যা হাসতে হাসতে বললে, তাই বল। আমি ভাবলাম তোমার বুঝি দরকার হয়েছে।

হাসতে হাসতে বললে বটে, কিন্তু এর পিছনে একটা ইতিহাস আছে। সীতানাথের ওকালতি যখন তেমন জমে নি, তখন সংসার চালাবার জন্যে

মাঝে গহনা বন্ধক দেওয়ার প্রয়োজন হত। অহল্যা আপত্তি করা দূরে থাক্, ইঙ্গিতেও তখন বিরক্তি প্রকাশ করে নি। আজ সীতানাথ অনেক টাকা রোজগার করে বলেই এই পরিহাস করতে পারলে। সেদিন পারতও না, করতও না।

খাওয়া বন্ধ করে সীতানাথ এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলে। বোধ হয় পিছনের সেই দুর্গত দিনগুলি কল্পনার চোখে দেখে নিলে।

বললে, মনে আছে সেই দিনগুলোর কথা ?

—না।

অহল্যার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

—মনে নেই তো বললে কী করে ?—সীতানাথ প্রশ্ন করলে।

—মনে নেই বলেই বলতে পারলাম। থাকলে বলতে পারতাম না।

সীতানাথ বুঝলে, কথাটা সত্যি। শুধু সেই দুর্দিনে নয়, তার পরেও অহল্যা এমন ইঙ্গিত কখনও করে নি।

বললে, আমি কিন্তু ভুলি নি। শুয়ে শুয়ে এখনও মনে পড়ে, দূর অতীত কালের কথা দুঃস্বপ্নের মত।

—ওটা তোমার স্বভাব।

—বোধ হয়। তুমি কিছুই মনে রাখ না, না ?

—কিছুই মনে রাখব না কেন, যা মনে রাখবার তা রাখি। কিন্তু মনটাকে ডাস্টবিন করতে চাই না।

সীতানাথের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে উঠল। অহল্যাও উঠল তার টিফিন ঠিক গোছানো হয়েছে কি না তদারক করবার জন্যে। কিন্তু সীতানাথ কোর্টে বেরিয়ে গেলেই তার কাজ শেষ হবে না। এর পরে ছেলে-মেয়েদের নাওয়া-খাওয়ার তদারকি আছে। তাদের স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। তারপরে বাজারের হিসাব বুঝে নেওয়া।

এ সব চোকার পর যখন সে একটু নিশ্চিন্ত হল, তখন প্রথমেই মনে পড়ল ফুলের কথা। আজকাল অত্যন্ত বেশি অন্যমনস্ক হয়ে আসছে সে। এতটা ভালো নয়।

কোর্ট থেকে ফিরে চা-খাবার খেয়ে সীতানাথ বেরিয়ে পড়ে গাড়ি নিয়ে। গড়ের মাঠে গিয়ে ঘণ্টাখানেক ভ্রমণ করে। তারপর ফিরে এসে আবার

মক্কেল নিয়ে পড়ে দশটা-এগারোটা পর্যন্ত, জটিল মামলা থাকলে বারোটা-একটাও হয়।

আগে অহল্যাকেও সঙ্গে যাবার জন্তে অনুরোধ করত। অহল্যা কোনো-কোনোদিন যেত, কিন্তু বেশির ভাগ দিনই যেতে চাইত না। বিনা প্রয়োজনে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো তার ভালো লাগে না।

এখন সীতানাথও আর অনুরোধ করে না, অহল্যাও যায় না। যেদিন সীতানাথের অন্য কোথাও কাজ না থাকে, সেদিন ছোট ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে যায়।

বাবার সান্ধ্যভ্রমণে বেরুবার প্রাক্কালে তারা যথারীতি তৈরী হয়ে এসে দাঁড়াল।

তাদের দিকে চেয়ে সীতানাথ বললে, তোমরা আজ নয়। মাঠ থেকে আমাকে একটি বন্ধুর বাড়ি যেতে হবে। ফিরতে রাত হতে পারে।

শেষের কথাগুলো আসলে সে অহল্যাকেই বললে।

অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, তোমার মক্কেল আসবে না?

—না। তাদের কাল সকালে আসতে বলে দিয়েছি।

বলে সে বেরিয়ে গেল।

খানিক পরে অহল্যা চাকরটাকে একটা ট্যাক্সি ডাকতে বললে। ছেলে-মেয়ে দুটিকে বললে, তোরা আমার সঙ্গে চল্।

—কোথায়?

—তোদের বড় মামার ওখানে।

সেজে-গুজে এসে গড়ের মাঠে যেতে না পারায় ওরা বিলক্ষণ ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। এই আহ্বানে সানন্দে সাড়া দিলে।

ওদের নিয়ে অহল্যা প্রথমে তার দাদার বাড়ি গেল, কিন্তু সেখানে সে দাঁড়াল না। ওদের নামিয়ে দিয়ে বউদিকে বললে, ওরা রইল। আমি একটি বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরে ওদের নিয়ে যাব।

বলে আর সে দেরি করলে না। সেই ট্যাক্সিতেই চলে গেল অংশুমানের বাড়ি।

উপরের বসবার ঘরে বসে অংশুমান তখন কী কতকগুলো জরুরী কাগজ-পত্র দেখছিল। সিঁড়িতে অহল্যার পায়ের সাড়া পেয়েই সহাস্যে বাইরে এসে দাঁড়াল।

হাসতে হাসতে বললে, ভাগ্যি ফুল ফেলে গেছলে তাই তো এলে! নইলে আজ আর কখনই আসতে না।

অহল্যা হেসে উত্তর দিলে, খুব সম্ভবত না। কিন্তু যদি বল ফুলের জন্যে এসেছি, তাও ঠিক নয়।

—কিসের জন্যে এসেছ তবে?

—যদি বলি এই উপলক্ষ্যে তোমাকে একবার দেখবার জন্যে?

—বিশ্বাস করব না।

—কেন?

—আমাকে দেখবার জন্যে ডাক্তার ছাড়া আর কেউ আসে, তা বিশ্বাস করি না।

অহল্যা কিন্তু এই পরিহাসে হাসল না। ওর নীলপদ্মের মত আশ্চর্য সুন্দর দুই চোখ অংশুমানের চোখের উপর একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে স্থাপন করে বললে, আমিও আসি না?

অংশুমান চমকে থমকে গেল। সাধারণ নারী-পুরুষ সম্পর্কে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রত্যয়ও যেন একটু দুলে উঠল।

দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বল কণ্ঠে বললে, কী জানি তুমি আস কি না! চল, ও-ঘরে বসিগে।

একখানা সোফায় দুজনে পাশাপাশি বসল। অন্য দিন তৎক্ষণাৎ একখানি হাত অংশুমান ওর কাঁধের উপর তুলে দিত। আজ কিছুই করলে না।

নতমুখে কী যেন ভেবে নিয়ে বললে, সংসার দেখে দেখে মানুষ আর অর্থ সম্বন্ধে আমি বিশ্বাস হারিয়েছি অহল্যা। দুটোরই ওপর নির্ভর করা চলে না।

—কী রকম?—অহল্যার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ।

—ওরা কেন আসে, কেন যায়, কেউ জানে না।

—তা হলে আমার ওপরও তোমার বিশ্বাস নেই বলতে চাও?

—বলতে চাই, কিন্তু পারি না।

—কেন পার না? চক্ষুলজ্জায়?

এবারে অংশুমান হেসে উঠল: আমার চক্ষুলজ্জা আছে, এমন অপবাদ কোথাও শুনি নি।

—তবে পার না কেন?

একটু ভেবে অংশুমান জবাব দিলে, বোধ হয় তোমার সম্বন্ধে আমি কৃত

নিশ্চয় হতে পারি নি বলে। কিংবা হয়তো তোমার সম্বন্ধে আমার একটু দুর্বলতা আছে।

—হ্যাঁ, দুর্বলতা।—অহল্যা হেসে বললে,—সেটা আমিও বুঝতে পারি।

ওর হাতে একটা ঝাঁকি দিয়ে অংশুমান সাগ্রহে বললে, পার?

—পারি। তোমার হিসেব সর্বত্র অনড়। বাজেটের বাইরে তুমি কিছুতে যাও না। কিন্তু দেখেছি, আমার সম্বন্ধে তুমি অবাধ বেহিসেবী।

খুশিতে অংশুমানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হেসে অহল্যা আবার বললে, কিন্তু ওটা দুর্বলতা, তার বেশি নয়।

—তার মানে?—অংশুমান সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—তার মানে, কাব্যে-সাহিত্যে অথবা সাংসারিক জীবনে সাধারণভাবেও যাকে প্রেম বলে, তা নয়। দুর্বলতা মাত্র।

অত্যন্ত ধীরে, প্রত্যেকটি শব্দ যেন ওজন করে করে অহল্যা কথা ক'টি বললে।

অংশুমানও অন্যমনস্কভাবে বললে, জানি না কাকে প্রেম বলে। দুর্বলতাটা বুঝতে পারি।

বলেই হঠাৎ অহল্যার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি জান?

—কী?

—কাকে প্রেম বলে?

অহল্যা দেখলে, একটা অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে অংশুমান একাগ্রভাবে ওর দিকে চেয়ে আছে। এর আগে অংশুমানের এই দৃষ্টির সঙ্গে অহল্যার কখনও পরিচয় হয় নি। সন্ধ্যার পরে এ দৃষ্টি অংশুমানের চোখে দেখা যায় না। এ দিনের দৃষ্টি, যা দিয়ে অংশুমান মাল দেখে নেয়, লাভের হিসাব করে, কড়ি গুনে নেয়।

অবাক হয়ে অহল্যা সেই উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠ একাগ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল।

মৃদুকণ্ঠে বললে, না।

—না?

সঙ্গে সঙ্গে একটা ইস্পাতের মত কঠিন হাসির বিদ্যুৎ ওর চোখে, ওর ঠোঁটের কোণে ঝিলিক দিলে।

—না।

সঙ্গে সঙ্গে লোহার মত শক্ত একজোড়া বাহু ওকে প্রচণ্ড বলে শৃঙ্খলিত করে ফেললে।

একটু পরে ওকে মুক্তি দিয়ে অংশুমান বললে, তুমি বললে 'না'। যদি 'হাঁ' বলতে কী হত জান?

—কী হত?—অহল্যা তখনও দম নিচ্ছে।

—তা হলে আমি এখান থেকে লাফিয়ে উঠে ওই কুশনটায় গিয়ে বসতাম।

দুজনেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

॥ দুই ॥

না। প্রেমের সঙ্গে অহল্যার পরিচয় নেই। যাদের ও ভালোবেসেছে, তা প্রেম নয়। অন্তত পক্ষে কাব্যে-সাহিত্যে প্রেমের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, এই ভালোবাসার সঙ্গে তা মেলে না। তা 'নিকষিত হেম' নয়, 'কামগন্ধলেশ' নয়, এমন কি বিরহ-মিলনের দিক দিয়েও কাব্যিক উন্মাদনা তার মধ্যে নেই। তা নিতান্তই মানবীয়।

তাকেও বলা যেতে পারে দুর্বলতা।

কিন্তু কাদের সে ভালোবেসেছে?

অংশুমানকে?

হ্যাঁ। জীবনে যখন তার যৌবন ভালো করে জাগে নি, বলতে গেলে যখন সে কিশোরী, তার জীবনে অংশুমান এসেছে তখন। শুধু এসেছে নয়, তার জীবনের ভার নিয়েছে। অপ্রত্যাশিত আরাম এবং বিলাসের মধ্যে তাকে লালন করেছে। তার সম্বন্ধে অহল্যার দুর্বলতা আছে।

কে জানে কাকে বলে প্রেম, কিন্তু অংশুমানকে সে ভালোবাসতে পারত, যদি অংশুমানকে ভালোবাসা যেত।

কিন্তু অংশুমানকে ভালোবাসা যায় না। যে নিজে ভালোবাসতে জানে না, সে অন্যকে ভালোবাসতে দেয়ও না। সুতরাং যে বয়সে মেয়েদের মনে প্রেম জাগে, অংশুমানের জন্যে সেই বয়সে অহল্যার মনে প্রেম তো জাগলই না, তার অঙ্কুর পর্যন্ত উৎপাটিত হয়ে গেল।

মনে পড়ে একদিন অংশুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিল, যে-কথা তার মা একদিন অংশুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিল : তুমি বিয়ে কর না কেন? তোমার তো অনেক টাকা-পয়সা।

অংশুমান হেসে জবাব দিয়েছিল, টাকা-পয়সা থাকলেই কি বিয়ে করা যায়?

—কেন যাবে না? লোকে তো ভরণপোষণের কথা ভেবেই বিয়ে করতে ভয় পায়।

—আর-কিছু ভয় পায় না?

—আর কী ভয় ?

অংশুমান কী এক রকম করে হেসেছিল। বলেছিল, দাম্পত্য-জীবনে ভয় তো কত রকমেরই থাকতে পারে।

—যেমন ?

—যেমন ধর, স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসবে কি না, তার মন অন্য কোনো প্রলোভনে অন্য কোথাও বাঁধা পড়বে কি না,—এমনি কত ভয়ই তো থাকতে পারে।

সেদিন হয়তো অহল্যার মনের মধ্যে ছিল অংশুমান তাকেই বিয়ে করবে। সরল বিশ্বাসে বলেছিল, স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসলে তেমন হবে কেন ?

অংশুমান হো-হো করে হেসে উঠেছিল : স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসলে! কিন্তু সব স্বামী কি স্ত্রীকে ভালোবাসতে পারে ?

অহল্যা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, পারবে না কেন ? অবশ্য স্ত্রী যদি নিতান্ত কালো-কুৎসিত না হয়।

অংশুমান আবারও হেসে উঠেছিল : অহল্যা, যে ভালোবাসতে পারে, সে কালো-কুৎসিত হলেও পারে। যে পারে না, সে অপ্সরীকেও পারে না।

—তার মানে ?

—তার মানে, সবাই ভালোবাসতে পারে না।

—তুমিও পার না ?

—না।

—কেন ?

—কারণ, ভগবান আমাকে সে শক্তি দেন নি। কারণ

—কারণ ?

—সে কারণটা আর-একদিন বলব।

অহল্যা জেদ করলে : না। এখনই বলতে হবে।

—এখন তুমি বুঝতে পারবে না।

—আহা, আমি কি কচি খুকী ?

—কচি খুকী হয়তো নও। কিন্তু এ কথা বুঝতে গেলে যে বয়স হওয়া দরকার, তাও হয় নি।

অহল্যা তথাপি ছাড়ে নি। অংশুমানকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছিল :

মেয়েদের ওপর আমার শ্রদ্ধা নেই। যেখানে শ্রদ্ধা নেই, সেখানে ভালোবাসা থাকে না।

কথাটা সত্যই সেদিন অহল্যা বুঝতে পারে নি। তখন কত বা তার বয়স হবে? সবে আই-এ পাস করেছে, .ক সেবার আই-এ দেবে।

কিন্তু কথাটা, যে কারণেই হোক, তার মনের মধ্যে দাগ কেটেছিল। হয়তো বুঝতে পারে নি বলেই। তাই কোনোদিন অংশুমানকে সে বিয়ের জন্যে চাপ দেয় নি; বরং যদি হঠাৎ অংশুমান একদিন তাকে বিবাহের প্রস্তাব করেও বসত, সে ভয় পেয়ে যেত।

তাই যখন সীতানাথের, অর্থাৎ যে-কোনো একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে, তার বিয়ের কথা হল, সে উল্লসিতও হল না, বাধাও দিল না। তখন সে এম-এ পাস করেছে এবং অংশুমানের অনেক-দিন-আগেকার কথাটার মানে এক রকম করে বুঝতে শিখেছে।

মনে পড়ে, বিয়ের দু-তিন দিন আগে নিরিবিলি পেয়ে অংশুমান এক সময় বলেছিল, আমার খুব ভয় হয়েছিল অহল্যা।

—কিসের ভয়?

—ভয় হয়েছিল, তুমি হয়তো বিয়েতে আপত্তি করবে।

—আপত্তি কেন করব?

—তাও কি বলতে হবে?

—বুঝতে পারছি। তা হলে একটা কথা তোমাকে বলি। .কন্তু কথা দাও, এ প্রসঙ্গ আর কোনোদিন তুলবে না।

অংশুমান কথা দিয়েছিল।

কঠিন শীতল কণ্ঠে (তার কণ্ঠস্বরে এমন কাঠিন্য ও শীতলতা অংশুমান আর কখনও প্রত্যক্ষ করে নি) অহল্যা বলেছিল, তোমার সংস্পর্শে এসে আমিও পুরুষের ওপর শ্রদ্ধা হারিয়েছি।

—তাই নাকি?

অংশুমানের কণ্ঠে বিস্ময়ের সঙ্গে একটুখানি আনন্দও যেন মেশানো ছিল।

তেমনি স্বরে অহল্যা বলে চলেছিল স্বাভাবিক ভাবেই: কিন্তু পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের একটা তফাত আছে।

—কী তফাত?

—পুরুষেরা যে কারণে বিয়ে করতে আপত্তি করে, মেয়েরা সেই একই

কারণে বিনা আপত্তিতে বিয়ে করে। তাদের লোকসানের কোনো আশঙ্কা নেই।

অহল্যার কথায় অংশুমান সেদিন খুশি হয়েছিল কি আহত হয়েছিল, আজ আর সে প্রশ্ন তার মনে আসে না। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত, কোনো দিকেই বিবাহের ফলে তাকে লোকসান সইতে হয় নি। নিজের কাজ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত তার মনে অনুতাপের কোনও কারণ ঘটে নি।

না, তার নিজের কোনো লোকসান ঘটে নি। কে জানে, সীতানাথের ঘটেছে কি না।

সে একটা প্রশ্ন।

অহল্যা মাঝে মাঝেই ভাবে সীতানাথের কথা।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষ এই সীতানাথ!

মক্কেল আর কোর্ট, এই নিয়ে তার দিন কাটে। এবং মানুষ হিসাবে এত শান্ত, এত সংযত এবং এত ভদ্র যে, এই দীর্ঘকালে একদিনও ওদের মধ্যে কলহ হয় নি। কেউ একদিন একটা রূঢ় কথা বলে নি।

একদিনের কথা মনে পড়ে:

অহল্যার একবার কঠিন অসুখ হয়েছিল। ডাক্তারে বোধ হয় একটু ভয়ই দেখিয়ে গিয়েছিলেন। সীতানাথ কখনও কোর্ট কামাই করে না। বলে, মক্কেলের কাজ, ফি নেওয়া হয়েছে, যেতেই হবে।

কিন্তু সেদিন, সেই একদিন, সীতানাথ কোর্ট কামাই করেছিল। আর কী মুখের ভাব! বেদনায় মানুষের যে এমন চেহারা হতে পারে, অহল্যার তা ধারণা ছিল না।

সেই মুখ অহল্যার এখনও মনে পড়ে।

প্রশ্ন জাগে, একেই কি প্রেম বলে?

ওকে অহল্যা বোঝবার চেষ্টা করে, জানবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে ওকে আরামে রাখবার, শান্তিতে রাখবার। আন্তরিক চেষ্টা। ভাবে, তাতে যদি ওর লোকসানের মাত্রাটা কমে।

চেষ্টা করে আন্তরিক। কিন্তু বুঝতে কিছুই পারে না, জানতে কিছুই পারে না—এমন মানুষ সীতানাথ।

বস্তুত, অংশুমানের সঙ্গে অহল্যার ঘনিষ্ঠতার কথা সীতানাথ আদৌ জানে কি না, জানলে কতটুকু জানে, তার ব্যবহার থেকে কিছুই বোঝা যায় না।

আকারে-ইঙ্গিতে একদিনের জন্যেও অহল্যা বুঝতে পারে নি, তার উপর সীতানাথের মনের নিভৃততম কোণেও কণামাত্র সন্দেহ রয়েছে।

এক-একবার অহল্যা রেগে যেত। ইচ্ছা করত, সীতানাথকে কথাটা পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করে বসে। ভয়ঙ্কর ইচ্ছা করত। কিন্তু সত্যই তো. আর সে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। সুতরাং চুপ করে যেত।

কে জানে, একেই প্রেম বলে কি না!

এ সম্বন্ধে অহল্যার কোনো ধারণা নেই। অংশুমানেরও না। মাঝে মাঝে তবু একে প্রেম বলে ভাবতে তার ভালো লাগে।

কী একটা পর্বোপলক্ষ্যে দু'দিন কোর্ট বন্ধ। সীতানাথ এই সুযোগে সেই ইংরিজী উপন্যাসখানা পড়ছে। পড়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় অহল্যা এসে দাঁড়াল।

একবার ওর দিকে চেয়েই সীতানাথ আবার বইতে মন দিলে।

অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগছে?

সীতানাথের মন তখন ইসাবেলাকে নিয়ে মশগুল।

সংক্ষেপে উত্তর দিলে, ভালো।

কিছুক্ষণ পরে অহল্যা আবার জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, তুমি এটা বিশ্বাস কর?

—কোনটা?

এবার সীতানাথ মুখ তুলে চাইলে।

—ওই যে ইসাবেলা তার প্রেমের জোরে দূর বিদেশ থেকে বিপথগামী স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে এল, ওটা। বিশ্বাস কর?

—করি।

—ওই রকম কাউকে আনতে দেখেছ?

—না।

—শুনেছ কোথাও?

—না।

—তবু বিশ্বাস কর?

—করি।—সীতানাথের চোখ-মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সেটা কৌতুকের, না সত্যকার বোঝা গেল না।

—কেন কর ?

—করি, কারণ ওর চেয়েও বড় গল্প ছেলেবেলায় শুনেছি এবং চোখের জলের সঙ্গে মেনে নিয়েছি। সাবিত্রী-সত্যবানের গল্প।

—ছেলেবেলার বিশ্বাস এখন তো আর নেই ?

—আছে। সেবার যখন তোমার বড় অসুখটা হয়েছিল তখন আমার মনে হয়েছিল, সাবিত্রীর মত আমিও যমের সঙ্গে যুদ্ধ করছি। তোমাকে বাঁচাতেই হবে।

অহল্যা মুহূর্ত কয়েক স্তব্ধভাবে সীতানাথের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু তখনই মনে হল, সীতানাথের চোখের আড়ালে কৌতুক নাচছে।

অহল্যা বললে, কিন্তু সাবিত্রী তো আর সামনে ডাক্তার রেখে যুদ্ধ করেন নি। একাই লড়েছিলেন।

—তার কারণ সেকালে যতটা সম্ভব ছিল, একালে তো আর ততটা হয় না।

অহল্যা হেসে বললে, অর্থাৎ তোমাকে ছোট সাবিত্রী বলা যেতে পারে।

—বরং বলতে পার ছোট বাবর।

কিন্তু প্রশ্নটা অহল্যার মনে এমন জাঁকিয়ে বসেছে যে, পরিহাসও সে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না।

বললে, না, সত্যি বল, তোমার মত কী ?

সীতানাথ তখনও পরিহাস করছে : সত্যি কি আমার মতের ওপর নির্ভর করে ?

—তার মানে ?

—তার মানে প্রেমের এ শক্তি যদি সত্যিই থাকে, তা হলে আমরা বিশ্বাস করি আর না-করি, আছে।

—কিন্তু এ বিষয়ে তোমার তো একটা মতামত আছে ?

—না, নেই। দেখ, প্রেমের কতটুকু আমরা জানি যে মতামত দোব ? হয়তো আছে, হয়তো নেই।

—অর্থাৎ প্রসঙ্গটা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।

—অর্থাৎ ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

ও-প্রসঙ্গটা অহল্যাও ছেড়ে দিলে। বললে, আচ্ছা, আমার আর-একটা প্রশ্নের জবাব দাও।

—বল।

—আমাকে তুমি কতখানি ভালোবাস?

প্রশ্ন শুনে সীতানাথ অবাক হয়ে গেল। অহল্যার আজ হয়েছে কী? এতদিনের বিবাহিত জীবনে এ প্রশ্ন সে কোনোদিন তোলে নি।

নিরীহভাবে উত্তর দিলে, সেরের মাপে বলতে হবে, না ইঞ্চির মাপে?

হেসে ফেলে বিব্রতভাবে অহল্যা বললে, আচ্ছা, ও প্রশ্ন থাক। আমি যদি মরে যাই, তুমি কী কর?

—কী করি?–মাথা চুলকে সীতানাথ বললে, প্রথমে একচোট কেঁদে নিই।

—তার পরে?

—তারপরে যে কী করি,

সীতানাথ মাথা চুলকুতে লাগল।

অহল্যা বললে, আর-একটা বিয়ে কর নিশ্চয়?

—না।—চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললে,—আর যাই করি, আর-একটা বিয়ে করছি না।

—কেন? আমাকে ভালোবাস বলে?

—সেটা না বললে তুমি দুঃখিত হবে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, কোনো বুদ্ধিমান লোক দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চাইবে না।

—কেন?

—ওর অনেক ঝামেলা। ছেলেবয়েসের অজ্ঞতায় একবার পোষায়। দুবার পোষায় না।

কৃত্রিম কোপে অহল্যা বললে, আমি কি এখন তোমার ঝামেলা?

—তুমি নও, বিয়েটা ঝামেলা। সেই কথা বললাম।

—বিয়ে কি স্ত্রীকে বাদ দিয়ে

—না, স্ত্রীকে নিয়েই। কিন্তু স্ত্রী তো একটি সাড়ে তিন হাত মেয়ে-মানুষ। বিয়েটা চোদ্দ হাত। যাকগে ও-কথা। সিনেমা যাবে? কখনও তো যাও না।

—যাব। কোথায়?

—যেখানে হোক। প্রথম যেখানে টিকিট পাব। যাবে

—যাব।

—তা হলে তৈরি হয়ে নাও। সময় বেশি নেই।

উৎসাহের সঙ্গে অহল্যা তৈরি হতে গেল। সীতানাথের সঙ্গে সিনেমা যাওয়ার অভ্যাস নেই। প্রথমত, সীতানাথ সিনেমা খুব কম যায়। দ্বিতীয়ত, তার যদি সময় হয় তো অহল্যার হয় না। প্রায়ই এমনি ঘটে।

॥ তিন ॥

সীতানাথের সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া অহল্যার জীবনে এই যে প্রথম তা নয়। সংখ্যা হিসাব করলে অনেক দিনই হবে। কিন্তু বিবাহিত জীবনের দৈর্ঘ্যে তাকে 'ক্বচিৎ-কখনও' বললে ভুল হবে না। বিশেষ, সম্প্রতিকালের মধ্যে অনেক দিন যায় নি। সুতরাং অহল্যার মনে হচ্ছিল, যেন এই প্রথম।

বাড়ি ফিরেই অহল্যার মনে প্রশ্ন ওঠে, কেমন লাগল ?

তার উত্তরে যে কথা তৎক্ষণাৎ তার ঠোঁটের ডগায় আসে, সে হচ্ছে : মন্দ কী ? আর-একটু ভেবে উত্তর দিলে বলতে হয়, ভালোই।

আরও ভেবে : হ্যাঁ, ভালোই। ভালোই।

তারপরেই তার মন এর সঙ্গে তুলনা করতে আরম্ভ করে অংশুমানের সঙ্গে সিনেমা যাওয়া।

সে একটা সমারোহ ব্যাপার !

অংশুমানের প্রকাণ্ড বড় গাড়িতে দুজনে পাশাপাশি যখন বসে, কিছুটা পথ যেতেই উত্তেজনায় অংশুমানের মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে, উষ্ণ নিশ্বাস পড়তে আরম্ভ করে, দুই চোখে তার ক্ষুধার উগ্র জ্বালা। দেখতে দেখতে সেই জ্বালা সঞ্চারিত হয় তার নিজের দেহে। তার সঙ্গে যখন মেলে সিনেমার আলো এবং বাজনা, তখন তাদের উভয়ের স্নায়ু-শিরাতেই উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ হয়। মাথা ঝিমঝিম করে, চোখ দুটি নেশায় জড়িয়ে আসে। বাড়ি ফিরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত ঘুম আসে না। মস্তিষ্কের কোষে কোষে জাজ-নৃত্যের বাজনা চলে।

কিন্তু সীতানাথের সঙ্গে অন্য অভিজ্ঞতা।

সমস্ত শান্ত, সুস্থ, মন্থর।

মনে হয়, শুক্ল সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে গাছের তলায় একটি বেঞ্চে বসে আছে দুজনে। শান্ত সন্ধ্যা, সুস্থ মন, সিনেমার দৃশ্য জেলে-ডিঙির মত মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে। দুই চোখে ঘুম নিয়েই বাড়ি ফেরে।

এও ভালো। বরফ-দেওয়া শরবতের মত। সুস্নিগ্ধ। শীতল। সুমধুর। যদিচ অংশুমানের সঙ্গে সিনেমায় যাওয়ার মত উগ্র নয়, মদির নয়, মোহময়ও নয়।

এও ভালো।

সিনেমা থেকে ফিরে গা ধুয়ে একটা হালকা আটপৌরে শাড়ি পরে অহল্যা এ-ঘরে এল। রঙ-করা মুখ নয়, শুধু অল্প পাউডারে মার্জিত। সীতানাথের দিকে চেয়ে হাসলে

—হাসছ যে?—সীতানাথ জিজ্ঞাসা করলে।

—কেন? হাসা নিষেধ নাকি?

—নিষেধ নয়। কিন্তু হাসার একটা কারণ থাকবে তো!

—তা হয়তো আছে। কিন্তু আমি ঠিক জানি না।

এমন হয়। মানুষ হাসে। খুশির হাসি। সব সময় তার কারণ থাকে না। কিংবা থাকলেও যে হাসছে সে জানে না।

কথাটা ঘুরিয়ে সীতানাথ জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগল ফিল্মটা?

—ভালো। তোমার?

—আমারও। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভাল লাগল—

সীতানাথ মিটি মিটি হাসতে লাগল।

—কী তার চেয়ে বেশি ভালো লাগল?

—বলব না।

—না বল। বলতেই হবে।

অহল্যা আবদারের ভঙ্গিতে ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

আনন্দে সীতানাথের চোখ বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। এত সুখ তার বিবাহিত জীবনে এত অল্পবার এসেছে যে আঙুলে গোনা যায়। আনন্দে তার কথা বেরুচ্ছিল না।

অহল্যা আবার একটা ঠেলা দিলে: বল। বলবে না?

সীতানাথ গদগদ কণ্ঠে জানালে, তোমার পাশে বসে সিনেমা দেখা।

অহল্যা খুশি হল। ওর চোখ চঞ্চল হয়ে উঠল। এবং খুশিতে-চঞ্চল মুখখানা আড়াল করবার জন্যে আলোটা নিবিয়ে দিলে।

বললে, রাত্তির অনেক হয়েছে। শুয়ে পড়।

কিন্তু সুস্নিগ্ধ আনন্দের গভীরে অহল্যার তাপদগ্ধ চিত্ত এমনি করে ডুবে না গেলে সে টের পেত আর-একজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের লক্ষ্য করছে।

সে অংশুমান।

একটা বিলিতি হোটেলে লটি দত্তের সঙ্গে অংশুমানের দেখা হয়। লটি দত্ত অংশুমানের বিশেষ পরিচিত। বিলেত থেকে লটি ফিরে আসার পরে সেই পরিচয় অন্তরঙ্গতায় এসে পৌছেচে।

লটি দত্ত কলকাতা শহরে একটা বিখ্যাত নাম। আগে চৌধুরী ছিল, অমূল্য দত্তকে বিয়ে করার পরে দত্ত হয়েছে। অনেকে এখনও ভুল করে লটি চৌধুরীও বলে। কিন্তু লটি নামটাই এমন পরিচিত যে, চৌধুরী অথবা দত্ত যাই তার পরে বসানো যাক, বোঝবার পক্ষে কারও অসুবিধা হয় না।

লটির অনুগ্রহভাজনের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে সার্ অংশুমানও একজন। ঠিক যেমন সার্ অংশুমানেরও অনুগ্রহভাজনের সংখ্যা অনেক, তার মধ্যে লটি দত্ত একজন।

সুতরাং দেখা যখন অপ্রত্যাশিতভাবে হয়ে গেল এবং অংশুমানের হাতেও কোনো জরুরী কাজ ছিল না, তখন অংশুমানের মনে সন্ধ্যাটা ওকেই নিয়ে সিনেমায় কাটানোর ইচ্ছা জাগল।

লটিকে সে যে খুব পছন্দ করে তা নয়। লিকলিকে লম্বা গড়ন। হাই-হীল জুতো পরে খুটখুট করে দ্রুত হাঁটে। মাথায় ছাঁটা চুল ঘাড়ের কাছে রোল-করা। রঙ-করা মুখ। আর চোখ দুটো কোনো সময় এক জায়গায় বসে না। প্রজাপতির মতো সর্বদা চঞ্চল পাখায় ঘুরছে।

না-মেম না-বাঙালিনী এই মেয়েটিকে অংশুমান পছন্দ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারে নি। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। অনেক দিন পরে আজ দেখা হতে ওকেই কাণ্ডারী করে সন্ধ্যার নৌকা দিলে ভাসিয়ে। একেবারে সিনেমায়।

জৌলুস আছে দুজনেরই। একজনের উগ্র ঐশ্বর্যের, অন্যের উগ্র মেম-সাহেবিয়ানার। সুতরাং দুজনকে ঘিরে সস্তা মার্কিন ফিল্মের রঙমশাল একটা চমৎকার মোহবৃত্ত রচনা করে ফেললে।

'বিরাম' পর্যন্ত।

আলো জলে উঠতেই নিচের দিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ অংশুমানের চোখ পড়ল অহল্যা আর সীতানাথের উপর। অংশুমান চমকে উঠল।

সীতানাথের সঙ্গে অংশুমানের বলতে গেলে পরিচয়ই নেই। বিয়ের সময় যা একটু পরিচয় হয়েছিল, সে কিছুই নয়। তারপরেও এখানে-সেখানে দেখা দু'চারবার হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সেও কিছুই নয়।

অহল্যাকে অন্য পুরুষের সঙ্গে দেখে অংশুমান চমকে উঠেছিল। কিন্তু ও যে সীতানাথ তা বুঝতেও তার বিলম্ব হল না। কিন্তু বুঝেও চোখ ফেরাতে পারলে না। ওদের বসার ভঙ্গীটি সুন্দর। দুজনেই নিঃশব্দে বসে। কথা সম্ভবত কইছেই না। শুধু মাঝে মাঝে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে একটু-খানি হয়তো হাসছে।

লটি আপন মনে বকেই যাচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল হল, অংশুমান নিঃশব্দ। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে নিচের দিকে চাইলে।

—কে ওরা? চেন?

মেমসাহেবের ঢঙে ইংরিজিতে লটি প্রশ্ন করলে।

উত্তরে নীরবে ঘাড় নেড়ে অংশুমান জানালে, চেনে।

—কাকে চেন? মেয়েটিকে, না পুরুষটিকে?

অংশুমান অকারণে মিথ্যে করে বললে, পুরুষটিকে।

কাকের মতো ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে লটি ওদের দেখলে।

—লাভার্স?

—সম্ভবত।

লটি খিল খিল করে হেসে উঠল: নন্‌সেন্স! ওরা স্বামী-স্ত্রী।

বিস্ময়ের ভান করে অংশুমান বললে, কী করে বুঝলে?

—অত্যন্ত সহজে। পুরুষে বাইরে স্ত্রীর কাছে খুব ভদ্রভাবে বসে। দেখছ না, কী শান্তভাবে বসে আছে ওরা দুজনে? তোমার মতো করে নয়।

অংশুমান বিনীত ছাত্রের মতো বললে, তাই বটে।

তারপর বললে, এস, আমরাও ওদের মতো ভদ্রভাবে বসি।

হাতের রঙিন পাখা দিয়ে ওর গালে মৃদু আঘাত করে লটি খিল খিল করে হেসে উঠল: তুমি কী বোকা! এই সামান্য সময়টুকু তুমি ভদ্রভাবে নষ্ট করতে চাও?

—তাই বটে।

অংশুমান আর কথা বাড়াতে চাইলে না। তবে ভয় হল, লটির উচ্চ কণ্ঠের হাসিতে উচ্চকিত হয়ে অহল্যা উপরের দিকে তাকিয়ে ফেলতে পারে। অবশ্য তাকিয়ে ফেললে এমন আর কী হবে! অহল্যা না-জানে কী?

হয়তো জানে। কিন্তু মেয়েটা এমন গম্ভীর এবং এমন নিখুঁতভাবে না-জানার ভান করে যে, অন্যে দেখলে অংশুমান হয়তো লজ্জা পায় না, কিন্তু অহল্যা দেখলে পাবে।

তা ছাড়া,

এই 'তা ছাড়া'টাই বড় কথা। অংশুমানের বুকের ভিতরটা কেমন জ্বালা করছে। কেন করছে, তা সে জানে না। সীতানাথের সঙ্গে অহল্যাকে কয়েকবারই সে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে দেখেছে। কিন্তু সিনেমা-হলে এমন ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি বসে থাকতে এই প্রথম দেখলে।

এর মধ্যে লটি কত কথা বললে। কতবার হাসলে। অংশুমানের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে কতবার নিজের দেহ দিয়ে ওর দেহকে ধাক্কা দিলে। অংশুমান কথার উত্তরে কথা হয়তো কইলে। হাসির উত্তরে হাসি। কিন্তু আলো থাকলে লটি বুঝতে পারত, এর ভিতর ওর মন নেই। এই প্রেক্ষাগৃহের মধ্যেই ওর মন নেই। অংশুমানের মন উড়ে বেড়াচ্ছে দূর অতীতের মধ্যে।

পরদিন সকালেই অংশুমান টেলিফোন করলে। অহল্যার বাথরুম থেকে আসার সঙ্গে সঙ্গে। তখনও তার চা আসে নি।

—কী ব্যাপার! ঘুম ভেঙেছে?

—তুমি কী ভাবছিলে, ঘুম আর ভাঙবে না?

অহল্যা খিলখিল করে হেসে উঠল।

অপ্রস্তুতভাবে অংশুমান বললে, বালাই ষাট! সে কথা ভাবব কেন? সিনেমায় গেলে তোমার ঘুম তো দেরিতে ভাঙে। তাই বলছিলাম।

—সিনেমায় গেলে? সিনেমায় আবার কবে গেলাম?

—কাল সন্ধ্যের কথা বলছিলাম।

অহল্যা অবাক হয়ে গেল: তুমি কোথায় ছিলে?

—তোমার কাছেই।

—বাজে কথা।

—মোটেই না।

—তা হলে আমি দেখতে পেলাম না কেন?

—সেই কথাই তো জানতে চাইছি। অত কাছে অথচ দেখতে পেলে না কেন?

প্রবল জোরের সঙ্গে অহল্যা বললে, কখ্খনো না। তোমার মত,—বলেই তার মনে পড়ে গেল: কিন্তু কাছে থাকবে কী করে? তুমি তো বক্সেই যাও সাধারণত।

—বক্সেই ছিলাম।

—তাই বল। তবে কাছে ছিলে বলছ কেন?

—তোমার আসন থেকে উপরের বক্স কি খুব বেশি দূর?

—অনেক দূর। তোমার সঙ্গে আর-কেউ ছিলেন?

—আবার কে থাকবেন? যাঁর থাকবার কথা তিনি তো অন্যের সঙ্গে অন্যত্র ছিলেন।

অংশুমান হাসল।

অহল্যাও পাল্‌টা আক্রমণ করতে ছাড়লে না: তোমার কি সঙ্গিনীর অভাব আছে?

—অত্যন্ত অভাব।

—কী জানি, লোকে তো অন্য কথা বলে।

—তা জানি। কিন্তু তুমি এ অপবাদ এই প্রথম দিলে।

—তা হতে পারে।

অহল্যা চুপ করলে। কথাটা সত্য। অনেক দিন অনেক জিনিস তার চোখে পড়েছে। কিন্তু সে দেখেও দেখে নি। উপেক্ষাভরে পাশ কাটিয়ে গেছে, না-দেখার ভান করে। তার মর্যাদায় কেমন যেন বেধেছে। অংশুমান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে খুশি হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে যেন নিজেকে ছোটও বোধ করেছে। অহল্যার উপেক্ষা অংশুমানের সঙ্গিনীটিকে অতিক্রম করে যেন তাকেও স্পর্শ করেছে।

অংশুমানের এই অসংখ্য বান্ধবীদের জন্যে নিজের মনে মনেও সে কখনও কৌতূহল বোধ করে নি। জানতে চায় নি—ও কে, কার কন্যা, কার বধূ। প্রভূতবিত্ত ও প্রভাবশালী অংশুমান সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক অবস্থাটা নিতান্ত সহজভাবেই সে গ্রহণ করেছে। ঠিক যেমন সেকালে পট্টমহারানীরা করতেন।

অহল্যার এই উচ্চ মর্যাদাবোধ অংশুমান অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করে এসেছে এবং বিনিময়ে তাকে মর্যাদা দিয়ে এসেছে।

তার নীরবতার স্থযোগ নিয়ে অংশুমান জিজ্ঞাসা করলে, তোমার ঘরে ক্যালেণ্ডার আছে ?

—ক্যালেণ্ডার ? আছে। কেন বল তো ?

—তাতে বিশেষ-বিশেষ দিনগুলো দাগ দাও ?

—না। তার কারণ আমার জীবনে বিশেষ দিন বড়-একটা আসে বলে স্মরণ করতে পারছি না।

—তা হলে এই দিক দিয়ে আমি তোমার চেয়ে ভাগ্যবান।

—শুধু এই দিক দিয়ে কেন, সকল দিক দিয়েই তুমি আমার চেয়ে সহস্র গুণ ভাগ্যবান। এ তো আমি সব সময়ই স্বীকার করি।

—তা হলে একদিন তুমি আসবে ?

—কেন ?

—আমার ক্যালেণ্ডারে তোমার আসার দিনটা দাগ দেওয়া থাকে। এসে দেখে যেতে শেষ দাগটা কোন তারিখে পড়েছে।

অংশুমান হাসতে লাগল একটা মস্ত বড় কথা বলার বিজয় গৌরবে।

অহল্যা জবাব দিলে: সে তারিখটা তোমার ক্যালেণ্ডার না দেখেই বলতে পারি। কিন্তু, ব্যাপার কী জান,

বাধা দিয়ে অংশুমান বললে, জানি। আসতে ইচ্ছে করে না।

অহল্যা হেসে বললে, তা নয়। আসলে সময় পাই না।

—কেন ? রোজই কি সিনেমায় যাও ?

—পাগল !

—তবে সময় পাও না কেন ?

—সংসারের কাজকর্ম তো কম নয়।

অংশুমান চুপ করে গেল। দমে গেল যেন। তার মস্ত বড় বাড়ি এবং সেই অনুপাতে মস্ত বড় এস্টাব্লিশমেণ্ট সত্য। কিন্তু সেটা সংসার নয়। ছেলে-মেয়ে স্কুল থেকে ফেরে না। এটার সর্দি, ওটার জ্বরও নয়। কোনোটা সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ে, তাকে সকাল-সকাল খাইয়ে দেবার বালাই নেই।

না। অংশুমান সংসারী নয়।

অহল্যা তার সংসারের ঘরণী-গৃহিণী, সন্তানের জননী।

অজ্ঞাতসারেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার অন্তরের একেবারে নিভৃততম তলদেশ থেকে। টেলিফোনের ও-প্রান্তে অহল্যার কানে গেল না সেই একান্ত মৃদু দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। বোধ হয় এ-প্রান্তে অংশুমানের কানেও গেল না।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, রেগে গেলে ?

—না। রাগি নি তো।

—কী ভাবছ তা হলে ?

—তোমার সংসার রয়েছে, তাই সময়ের অভাব। এই কথাটাই ভাবছিলাম। কথাটা খুব নতুন লাগল।

—নতুন কেন ?

—এইজন্যে বোধ হয় যে, সংসারের মধ্যে তোমাকে কোনোদিন দেখি নি। সংসার-সমেত তোমাকে তাই ভাবতে অভ্যস্ত নই। যাই হোক, আমাকে একেবারে পরিত্যাগ কোর না যেন সংসারের জন্যে।

—পরিত্যাগ!—আবেগে অহল্যার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠল: তুমি কি জান না, আমার এক দিকে সমস্ত সংসার, অন্য দিকে তুমি ?

—সেই কথাই তো এইমাত্র জানালে অহল্যা। কিন্তু আমার কী জান, আমার উভয় দিকেই তুমি, শুধু তুমি।

একটা প্রকাণ্ড বড় দ্বৈরথ যুদ্ধের দুই ক্লান্ত যোদ্ধাই দম নেবার জন্যে একটুখানি থামল।

—তোমার অনেক সময় নিলাম অহল্যা। এইবার লাইন ছেড়ে দিই ?

—শোন। তুমি আজ সন্ধ্যেয় থাকবে ?

—তুমি বললেই থাকি।

—থেকো।

—ক'টায় বল ?

—সাতটা থেকে আটটার মধ্যে পৌছব।

—বেশ। আমি প্রতীক্ষায় রইলাম।

দু'জনে হাসল। এবং হাসতে হাসতেই টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

॥ চার ॥

অংশুমান অত্যন্ত কর্মঠ এবং কর্মব্যস্ত লোক।

ভোর পাঁচটার মধ্যে তার ঘুম ভাঙে। সওয়া পাঁচটার মধ্যে সাইকল্ চড়ে নাপিত এসে কামিয়ে দিয়ে যায়। তারপরে স্নান এবং প্রাতরাশ সেরে ছ'টায় অতিথি অভ্যাগত এবং অর্থী-প্রত্যর্থীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে তৈরি হয়ে বসে।

সকালের দিকে অতিথি-অভ্যাগত এবং বিশিষ্ট বন্ধুদের ভিড় কমই হয়। সকলেই জানে, এই সময়টা তাকে নিরিবিলি পাওয়া যায় না। তবু নিতান্ত প্রয়োজনে সকালেই যাদের আসতে হয়, তারা ড্রইংরুমে এসে বসে এবং দু' মিনিটে কাজ সেরে চলে যায়।

ঝামেলা বেশি অর্থী-প্রত্যর্থীদের নিয়ে। তারা সংখ্যায় যেমন বেশি, তাদের শ্রেণীও তেমনি অনেক। যারা প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর, তারা প্রথমে এসে ড্রইংরুমে বসে। বেয়ারা যথারীতি চা-টোস্ট দিয়ে যায়। অংশুমান না-নামা পর্যন্ত তারা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে নিঃশব্দে অত্যন্ত ভারিক্কি চালে চা-টোস্টের সদ্ব্যবহার করে। পরিচিত পেলে মৃদু কণ্ঠে পরস্পর দেশের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে আলোচনা করে। মাঝে মাঝে অবজ্ঞাভরে বাইরে-সমবেত তৃতীয় চতুর্থী পঞ্চম শ্রেণীর অর্থীদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এরা খবরের কাগজের লোক, কিংবা দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা।

অংশুমান এদের খুব খাতির করে। রাজনীতি এবং ইংরেজ সরকার এই দুয়ের মাঝামাঝি সে চলে। রাজনৈতিক নেতাদের কাজের জন্যে সকল সময়ই টাকার প্রয়োজন। অংশুমান তাদের দল-নির্বিশেষে মাঝে মাঝে চাঁদা দেয়। কোনো দলের উপর তার পক্ষপাতিত্ব নেই। তবে তার চাঁদার পরিমাণ নির্ভর করে যে দলের যেমন শক্তি তার উপর। অন্য দিকে সাহেব-সুবো এবং উচ্চতর রাজপুরুষদের সঙ্গেও সে খাতির রেখে চলে।

এবং মুক্তিকামী জাতির যুগসন্ধিক্ষণে দু'নৌকায় পা রেখে যাদের চলতে হয়, তাদের খবরের কাগজের লোকদের তোয়াজ না করে উপায় নেই।

তারা যাতে কাগজে গালাগালি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তাদের দিয়ে ভালো ভালো ভাষণ লিখিয়ে নিতে হয়। আর অংশুমানের মতো ব্যবসা করে যাদের বড় হতে হয় তারা জানে, মুফৎ কিছুই হয় না।

উপর থেকে নেমে বাইরের বারান্দা অতিক্রম করে এই ড্রইংরুমে আসতে হয়। সেই বারান্দায় রয়েছে একটা চতুষ্কোণ লম্বা টেবিল। তার চারিদিকে অনেকগুলো চেয়ার। কিন্তু চেয়ারের চেয়ে আগন্তুকের সংখ্যা প্রতি-দিনই অনেক বেশি থাকে। সুতরাং যারা অনেক ভোরে আসতে পারে তারা চেয়ার পায়, চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ে। বাকি সকলে দাঁড়িয়ে থাকে। বারান্দায় পায়চারি করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এরা চা পায় না। ড্রইংরুমে বসে যারা চা খায়, ঈর্ষাদিগ্ধ নয়নে তাদের দিকে চায়।

অংশুমান এদের পাশ কাটিয়ে ড্রইংরুমে যায়। সহাস্যে সকলকে অভ্যর্থনা জানায়। চা পেয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করে। তারপরে তাদের সকলকে নিয়ে পাশের অফিস-ঘরে যায়।

প্রকাণ্ড বড় ঘর। মধ্যেখানে একখানা প্রশস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিল। ও-পাশে তার ঘূর্ণায়মান চেয়ার। অন্য তিন পাশে দু'তিন সারি হাতলহীন চেয়ার। তাতে সকলের এঁটে যায়।

অভ্যাগতদের মধ্যে অনেকের বিশেষ কোনো কথা থাকে না। তারা হাজিরা দিতে আসে। একটুক্ষণ বসে। মামুলী দু'চারটে কথার পরে কখন এক সময় চলে যায়। ইতিমধ্যে আরম্ভ করে তারা, যাদের কথা আছে কিন্তু গোপনীয় কিছু নয়। তারা তাদের কথা বলে এবং আবশ্যকীয় নির্দেশ নিয়ে উঠে যায়।

এর পরে রইল গোপন-কথার দল। ওই ঘরের এক প্রান্তে অথবা প্রয়োজন হলে তারও ওপাশের ঘরে তাদের সঙ্গে একে একে কথা সেরে অংশুমান তার অফিস-ঘরে নিরিবিলি বসে।

বারান্দার আগন্তুকদের স্লিপ ইতিমধ্যেই জড় হয়েছে। স্লিপে তারা নিজের নাম লিখেছে এবং যার চিঠি নিয়ে আসছে তারও নাম লিখেছে। সেই নামের গুরুত্ব অনুযায়ী একে একে ডাক হয়।

বেশির ভাগই চাকুরির উমেদার। কেউ অংশুমানের অফিসে চাকুরি চায়, কেউ বা অংশুমানের বিশেষ ঘনিষ্ঠ অন্য অফিসে। এদের মধ্যে খুব লোককে অংশুমান নিরাশ করে। কেউ কেউ এক বৎসর ধরে ঘুরছে।

জামা-কাপড় মলিন। জুতো ছিঁড়ে গেছে। তবু যখনই অংশুমানের কাছে আসে তাদের আশাহত মন নতুন আশায় সঞ্জীবিত হয়।

কিন্তু সকলেরই যে এই অবস্থা তা নয়। যারা অনেক দিন ধরে ঘুরছে তাদের কারও কারও কাজ যোগাড়ও করে দেয়। এটা হল তাদের ধৈর্য-যুদ্ধের পুরস্কার।

ওদের বিদায় করতে আটটা বেজে যায়।

তারপর অংশুমান নিজে বার হয়। কলকাতা শহরকে সে কয়েকটা অঞ্চলে বিভক্ত করেছে। এক-একদিন এক-এক অঞ্চলে বার হয়। প্রথমে প্রথম শ্রেণীর নেতাদের বাড়ি। তারপরে তার সমপদস্থ ব্যবসায়ীদের বাড়ি। এরা বেশির ভাগই ইউরোপীয় অথবা মাড়োয়ারী।

সেখান থেকে ঠিক দশটায় অফিস চলে যায়। একটা পর্যন্ত তার নিশ্বাস নেবার সময় থাকে না। কাজের পর কাজ, লোকের পর লোক, ফাইলের পর ফাইলের স্তূপ। প্রত্যেকটি কাজের উপর তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রত্যেকটি দরকারী লোকের সঙ্গে সে নিজে কথা বলবে। প্রত্যেকটি ফাইল সে নিজে দেখবে। এমনি করে তার অফিস বড় হয়েছে।

একটায় লাঞ্চে যাবে।

কোনোদিন সে খাওয়ায়, কোনোদিন তাকেই খাওয়ায়। সেও আর এক প্রস্থ বাণিজ্য। অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অত্যন্ত জটিল বাণিজ্য।

সেখানে থেকে ফিরে এসে আবার অফিস। আবার কাজের ভিড়। কিন্তু গোড়ার দিকের মতো অত বেশি নয়। কোনো-কোনোদিন তার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অফিস-ঘরের আরাম-কেদারায় চোখ বন্ধ করে একটু বিশ্রাম করার সময় পায়।

তারপরে আবার কাজের চাপ বাড়ে চারটের পর। তখন বিভিন্ন বিভাগের কর্তাদের নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়। সন্ধ্যা ছ'টা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত।

তারপর সে মুক্ত। এবং সমস্ত দিনের কাজের পর এই যে মুক্তি, এ যেমন অবারিত তেমনি উদ্দাম। তখন সে অন্য লোক। আদিম, বন্য এবং উচ্ছৃঙ্খল।

কেবল অহল্যার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়।

সন্ধ্যাবেলায় অহল্যা যখন এল তখন যে মানুষটি উপরের বসবার ঘরে তার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল, সে কিন্তু দিনের বেলার ঝানু ব্যবসাদার অংশুমান

নয়, অথবা অন্ত কোনো সন্ধ্যার সেই বন্ত এবং উচ্ছৃঙ্খল অংশুমানও নয়। এ শান্ত এবং স্বাভাবিক একটি মানুষ, মনে হচ্ছে তার কোনো নিকট-আত্মীয়ের জন্তে অপেক্ষা করছে।

অহল্যা আসতেই সাগ্রহে তার হাত ধরে অংশুমান নিজের পাশে বসালে। হাতের ঘড়িটা দেখে বললে, একটা অনুরোধ করব, রাখবে?

—আসামাত্রই অনুরোধ!

—মনে মনে কথাটা কাল সন্ধ্যে থেকেই ঘুরছে, আসামাত্র নয়। বল, রাখবে?

অহল্যা হাসলে: বলই না, কী অনুরোধ?

—চল, সিনেমায় যাই।

অহল্যা বিস্মিত হল: সিনেমায়! অনেক দিন পরে এলাম কি সন্ধ্যেটা সিনেমায় নষ্ট করতে?

অংশুমান জেদের সঙ্গে বললে, নষ্ট কেন? সিনেমায় গেলে কি সময় নষ্ট হয়?

—হয়।

—তোমার কি কাল সন্ধ্যেটা নষ্ট হয়েছিল?

—বারে বারে তুমি কাল সন্ধ্যের কথা বলছ কেন?—অহল্যার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের সঙ্গে বিরক্তিও মেশানো।

—কারণ কাল সন্ধ্যেয় তোমাদের দু'জনকে দেখার পর থেকেই এই লোভটা আমার মনে জেগেছে।

সেই একই কণ্ঠে অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, কাল সন্ধ্যেয় কী দেখেছ তুমি? তোমার সঙ্গে কখনও কি সিনেমায় যাই নি?

—গেছ। কিন্তু অমন করে কখনও বস নি।

এবারে অহল্যা হেসে ফেললে। বললে, কাল কেমন করে বসে ছিলাম?

—শান্তভাবে। সুন্দরভাবে।

—এই যেমন করে এখন বসে আছি, এমন করে নয়?

একান্ত সন্নিকট থেকে ভালো করে দেখা যায় না। কেমন করে অহল্যা বসে আছে, কালকের মতো করে কি না—দেখবার জন্তে অংশুমান উঠে দাঁড়াল। কাছে, তারপরে আর-একটু দূরে। ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে দেখতে লাগল।

কৌতুকে অহল্যার চোখের তারা নাচছে। বাঁ দিকের ঠোঁটের কোণটা কাঁপছে। অত্যন্ত মৃদু কাঁপন। তার ফলে গালে টোল পড়তে গিয়ে পড়ছে না।

অপূর্ব সুন্দর সে দৃশ্য। অন্যদিন হলে অংশুমান উন্মত্তের মতো ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু আজ যেন ওর মন ভরল না।

ঘাড় নেড়ে বললে, না। এ নয়।

হাসতে হাসতে অহল্যা বললে, কী নয়?

—তেমন নয়, যেমন কাল দেখেছি।

কৌতুকে অহল্যার চোখের তারা তখনও নাচছে।

অংশুমান বলে চলল: সে অন্য রূপ। শান্ত, সমাহিত। দেখে পর্যন্ত হিংসেয় আমি জ্বলে যাচ্ছি। কেবল মনে হচ্ছে, সীতানাথবাবু যা পেয়েছেন আমি তা পাই নি।

অহল্যা ধীরে ধীরে গম্ভীর হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলে, এ কথা কি কালকেই তোমার মনে প্রথম উঠল, না আগেও উঠেছিল?

—আগে ওঠে নি। কালই প্রথম উঠল।

—আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে? ইংরিজিতে একেই 'জেলাসি' বলে।

—বোধ হয়।

একটু পরে অংশুমান বললে, এর আগে তোমাকে একলা দেখেছি। ভেবে এসেছি তুমি তাই, তুমি তাই মাত্র, তার বেশি নও। কাল মনে হল, তা ছাড়াও তুমি আরও আছ এবং সেখানে আমি পৌঁছুতে পারি নি।

অহল্যা কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল।

অংশুমানের সমস্ত কথার সে মানে বুঝতে পারছে না। সে জানে না, সে কী! সীতানাথের কাছেই বা কী, অংশুমানের কাছেই বা কী! তারও অতিরিক্ত আরও যদি তার সত্তা থাকে তাই বা কী! নিজের সম্বন্ধে কোনোদিনই মস্তবড় একটা ধারণা ছিল না। সে জানে সে দরিদ্রের কন্যা। রূপমূল্যে অংশুমানের কাছে বিক্রীত। আজ সে যা তাও অংশুমানের দয়ায়। অথচ অংশুমান এ কী কথা বলছে! সে নিজেকে যা বলে জানে তা নয়? অংশুমান যা বলে জানত তাও না? কে জানে সীতানাথ যা বলে জানে তাই তার সম্পূর্ণ পরিচয় কি না!

অংশুমান কী বলছে! সেদিন প্রেক্ষাগৃহের প্রায়ান্ধকারে কী দেখেছে সে তার মধ্যে? সে নিজে তো কিছুই মনে করতে পারে না।

অংশুমান আবার বললে, আমি ঠকে গেছি অহল্যা। ভীষণভাবে ঠকে গেছি।

অহল্যার মন ভরে উঠেছে। নিজের মধ্যেকার বৃহত্তর একটা সত্তার আভাস জাগছে যেন। পরম স্নেহভরে অংশুমানকে সে নিজের পাশে বসালে। তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সান্ত্বনার স্বরে বললে, আমি যা আমি তার বেশি নই। বিশ্বাস কর, তোমাকে আমি ঠকাই নি।

অংশুমান বললে, বেশ। চল তা হলে সিনেমায়।

—না।

—না কেন?

—বেশ লাগছে এখানে। তুমি তো জান বেশি হৈ-চৈ আমি কখনই ভালোবাসি নে।

উসখুস করে অংশুমান বললে, কিন্তু আমি যে সন্ধ্যেবেলাটা হৈ-হৈ না করে থাকতে পারি নে।

অহল্যা হেসে ফললে। বললে, তা জানি। তুমি হৈ-চৈ কর, আমি ততক্ষণ তোমার লাইব্রেরিটা একবার দেখে আসি, নতুন বই কিছু এল কি না।

বলে তাকে হৈ-চৈ করার অবকাশ দিতে অহল্যা লাইব্রেরি-ঘরে চলে গেল।

এই সে বরাবর করে থাকে।

অংশুমান তার সামনে মদ্যপান করে না। অন্য সকলের সামনে করে, শুধু অহল্যার সামনে নয়। সমীহ যে অংশুমান করে তা হয়তো নয়। লজ্জাটা অংশুমানের চেয়ে অহল্যার পক্ষেই যেন বেশি। সে চায় না অংশুমান তার সামনে মদ্যপান করুক। এবং তার সামনে মদ্যপান করার সুযোগ সে, কেন জানি না, দিতে চায় না। সে আসবার আগেই এই কৃত্যটা অংশুমান সেরে নিয়ে থাকলে ল্যাঠা চুকেই গেল। যদি না সেরে থাকে, তা হলে নির্দিষ্ট সময়ে বেয়ারাটাকে উঁকি দিতে দেখলেই সে বুঝতে পারে। এবং কোনো-না-কোনো অছিলায় সরে যায়। তারপর যথাসময়ে আবার ফিরে আসে।

অংশুমানের লাইব্রেরিটা চমৎকার।

প্রশস্ত একটা হল-ঘর আলমারিতে ভর্তি। বই কেনা তার একটা শখ। অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব থেকে আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত বহু বই মাসে মাসে বিলেত থেকে আসে। সেগুলো সে নিজে বড়-একটা পড়ে না। তার অনেকগুলি সেক্রেটারি আছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। বই তারাই পড়ে। আর পড়ে অহল্যা।

আলমারির চাবি একটি বেয়ারার জিম্মায়। তাকে ডেকে নিয়ে অহল্যা লাইব্রেরিতে ঢুকে আলমারি খুলে নতুন-আনা বইগুলো ঘাঁটতে লাগল। তার প্রিয় বই হল সাহিত্য। ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধেও অল্প আগ্রহ আছে।

বইগুলো সামনের টেবিলে রেখে একখানা চেয়ারে বসে সে এক-একখানা বই খুলে পাতা ওলটাতে লাগল। যেখানা ভালো লাগে, মনে হয় পড়া চলবে, সেখানা ডান দিকে সরিয়ে রাখে। যেগুলো ভালো লাগে না, সেগুলো বাঁ দিকে। এমনি করে সব বই দেখা হয়ে গেলে সে অমনোনীত বইগুলো যথাস্থানে তুলে রাখলে। আর মনোনীতগুলো বেয়ারাকে একটা প্যাকেট করে বেঁধে দিতে বললে। যাবার সময় নিয়ে যাবে।

আবার যখন সে বসবার ঘরে ফিরে এল, তখন অংশুমানের সামনের টেবিল পরিষ্কৃত। অংশুমান একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। তার মুখ-চোখ আরক্ত। দুই চোখে হাসির তরঙ্গ।

বললে, আমি ভুল ভেবেছিলাম অহল্যা।

—কী ভুল ?

—যে, তোমাকে আমি পাই নি।

—এখন কী মনে হচ্ছে ?

—তোমাকে পেয়েছি।

—হ্যাঁ, পেয়েছ।

—অথচ কাল থেকে কী যে কষ্ট পাচ্ছিলাম !

—ঈর্ষায় অমন হয়।

—তাই দেখলাম।

অহল্যার একখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে অংশুমান ওর দিকে চাইলে। তার চোখের দৃষ্টি বন্য, ক্ষুধার্ত। এইটেই স্বাভাবিক অংশুমান। এই বন্য মানুষটিকেই অহল্যা, কী জানি কেন, পছন্দ করে।

মদ্যপানের পরে এই বন্যতা আসে। বন্য, কিন্তু উদ্দাম নয়, সংযত। অহল্যার কাছে সে উদ্দাম হতে কিছুতেই পারে না। সংযত বন্যতা। এইটে অহল্যা পছন্দ করে। অংশুমান যদি মদ্যপান না করত, অহল্যা তাকে ঘৃণা করত

অংশুমান বললে, তোমার জন্যে আমি মরতে পারি, জান?

—না।

অংশুমান বিভ্রান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে অহল্যার দিকে চাইলে। তার চোখে কৌতুকের হাসি তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে।

আহত সততার সঙ্গে অংশুমান জিজ্ঞাসা করলে, তুমি বিশ্বাস কর না এ কথা?

—না।

—একদিন মরে এই সত্য প্রমাণ করতে ইচ্ছা করে।

অহল্যা খিল খিল করে হেসে উঠল: দোহাই তোমার! যা সত্যি নয় তাই প্রমাণ করবার জন্যে যেন অঘটন ঘটিয়ে বোস না।

অংশুমান ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললে, কেন, তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি, এটা সত্যি নয়?

—না। শুধু আমার জন্যে কেন, কারও জন্যেই তুমি কিছু করতে পার, এটা সত্যি নয়।

—সত্যিটা তবে কী?

—তুমি নিজের জন্যে সব করতে পার।

অংশুমান গুম হয়ে বসে রইল।

অহল্যা শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, রাগ করলে?

অংশুমান গুম হয়েই বসে রইল।

অহল্যা বললে, রাগ কোর না।

একটা মস্ত বড় নিশ্বাস ফেলে অংশুমান উঠে দাঁড়াল। বললে, আমার ওপর তোমার বিশ্বাস কিছুতেই হল না!

অহল্যাও উঠে দাঁড়াল। ওর একখানা হাত ধরে বললে, কে বললে হল না? তোমার ওপর আমার গভীর বিশ্বাস।

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে অংশুমান হাসলে।

জোরের সঙ্গে অহল্যা ওর হাতে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, সত্যি তাই। বিশ্বাস কর।

অংশুমান বললে, স্বার্থপরকে কে বিশ্বাস করে?

—আমি করি।

—কী আশ্চর্য!

—আশ্চর্য কিছুই নয়। সংসারে যে যত বেশি স্বার্থপর, সে তত বেশি বড় হয়। তুমি যে বড় হয়েছ সেও স্বার্থপর বলেই। নিজের জন্যে তোমার অকার্য কিছুই নেই।

এবারে অংশুমানের আরক্ত ঢুলুঢুলু চোখ কৌতুকে নেচে উঠল।

—এবং তুমি সেইটেই বিশ্বাস কর?

—হ্যাঁ।

—চমৎকার!—অংশুমান হো-হো করে অট্টহাস্য করে উঠল।

—হাসলে যে!—অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে।

—তোমার বিশ্বাসের বহর দেখে।

অংশুমান অহল্যাকে নিয়ে আবার সোফায় এসে বসল।

বললে, সত্যি, ভালোবাসা কাকে বলে আমি জানি না। শৈশবে বাবাকে হারিয়েছি। নিঃস্ব বিধবার কোলে মানুষের অবজ্ঞার মধ্যে মানুষ হয়েছি। ভালোবাসতে শিখি নি। কিন্তু যদি বল—আমি শুধু নিজেকে ভালোবাসি, তাও সত্যি নয়।

—নয়?

এ-প্রসঙ্গ অহল্যা আর টানতে চাইছিল না। অনিচ্ছার সঙ্গেই প্রশ্নটা করলে।

উত্তেজিত কণ্ঠে অংশুমান বললে, না। সত্যি নয়। নিজেকে ভালো-বাসলে আমি নিজেকে এত দুঃখ দিতে পারতাম না। আরাম চাইতাম, বিশ্রাম চাইতাম। নিজেকে দিনরাত্রি চাষের বলদের মতো খাটাতে পারতাম না।

একটু চুপ করে থেকে বললে, অর্থ তো আমি কম রোজগার করি নি। বিশ্রামও অর্জন করেছি। তবু খাটি কেন?

অহল্যা হাসলে: বোধ হয় আরও অর্থের লোভে।

অংশুমান চমকে উঠল: আরও অর্থের লোভে! তোমার তাই মনে হয়?

অহল্যা বিব্রত হয়ে উঠল। বললে, আমি কিছুই ভাবি নি। কিন্তু সব কাজের একটা কারণ তো থাকবে।

অংশুমান বললে, অর্থ তো দু'হাতে ওড়াই অহল্যা। কৃপণ অর্থ সঞ্চয় করে আনন্দ পায়। নিরিবিলি তার সঞ্চিত অর্থের হিসাব করে দেখে, কত জমল! আমি তো কোন্ ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে তাও জানি না। তা হলে?

অহল্যা তাড়াতাড়ি বললে, তা হলে তোমার কথাই ঠিক। তুমি কাউকে, কিছুকেই ভালোবাস না।

এবারে অংশুমানের চোখ আবেগে আমীলিত হয়ে এল। বললে, শুধু তোমাকে।

বলেই তাড়াতাড়ি বললে, আমি ঠিক জানি না। আমি ঠিক জানি না। শুধু মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, তোমাকে বোধ হয় ভালোবাসি।

সঙ্গে সঙ্গে দুই ব্যগ্র বাহু দিয়ে অহল্যাকে জড়িয়ে ধরলে।

॥ পাঁচ ॥

নাপিত দাড়ি কামিয়ে চলে গেছে। অংশুমান বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরিয়ে এল। পরনে অতি সূক্ষ্ম দুগ্ধধবল খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি।

সকালে অংশুমান খদ্দরই পরে। দুপুরে সুট। এবং সন্ধ্যায় শান্তিপুরের ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি।

তার সেক্রেটারি অপূর্ব তখন টেবিল গোছাচ্ছিল।

অপূর্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম এম-এ। সাময়িক পত্রে তার লেখা অর্থনীতি বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ পড়ে অংশুমান তাকে ডেকে পাঠায়। সে তখন কলকাতার একটি কলেজে অধ্যাপক হয়ে ঢুকেছে, পঁচাত্তর টাকা বেতনে। অংশুমান দু'শো টাকা বেতনে তাকে নিজের প্রাইভেট সেক্রেটারি করে নিলে।

সে আজ তিন বৎসরের কথা।

এখানে খাটুনি যে খুব বেশি তা নয়। অংশুমানের বই কেনার শখ আছে। অপূর্ব নিজের খুশিমত বই কেনে আর পড়ে। সেদিক দিয়ে সে বেশ আনন্দেই আছে। কিন্তু এই তিন বৎসরে মাইনে একটা পয়সাও বাড়ে নি।

অধ্যাপনা করলে তার মাইনে আজ এক শো টাকাতেও পৌছত কি না সন্দেহ। তবে ট্যুইশান কিছু পেত নিশ্চয়। তার পুরাতন চাকরির তুলনায় সেদিক দিয়ে যে খারাপ আছে তা নয়। কিন্তু সে যাই মাইনে পাক, বছর-বছর মাইনে বাড়ার একটা প্রথা আছে। অংশুমানের অনেকগুলো কারবার আছে। প্রত্যেক কারবারেই অনেক লোক কাজ করে। অপূর্বর সঙ্গে তাদের অনেকের পরিচয় আছে। তাদের বছর বছর মাইনে বাড়তে সে দেখে। অথচ তার মাইনে বাড়ে না, যেহেতু সে অংশুমানের কোনো কারবারের কর্মী নয়, তার খাস ও ব্যক্তিগত কর্মী—এটা তার বিশ্রী লাগে। অনেকবার বেতনবৃদ্ধির জন্যে সে কুণ্ঠিতভাবে অনুরোধ জানিয়েছে। কিন্তু 'আচ্ছা দেখা যাবে' ছাড়া আর কোনো ভরসার কথা অংশুমানের মুখ থেকে বার করতে পারে নি।

সেদিন অংশুমান অফিস-ঘরে ঢুকেই ওর দিকে চেয়ে সহাস্যে বললে, তোমার মাইনে এ মাস থেকে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল। খুব মন দিয়ে কাজ-কর্ম কর।

কালো-মতন একটি ছোকরা আজ ছ'মাস ধরে চাকরির জন্যে ঘুরছে। অংশুমান তাকে 'না'ও বলে না, কিছু করেও দেয় না। বেচারা ছ'মাস ধরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঘুরছে। পায়ের স্যাণ্ডাল ছেঁড়া, জামা-কাপড় মলিন, মাথার চুল উস্কো-খুস্কো, গালের হনু দুটো উঁচু হয়ে রয়েছে অন্নাভাবে।

নিচে নেমেই তার সঙ্গে প্রথমেই দেখা।

বললে, ওহে, তাড়াতাড়ি চলে যেও না। একটু অপেক্ষা কোরো।

অপেক্ষা করবার ঘরে 'নবলক্ষ্মী' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক বীরেশ্বর ধূমায়মান চায়ের পেয়ালার সামনে কী একটা দুরূহ আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিল।

—বীরেশ্বরবাবু, আপনি আসুন।

বলে অংশুমান তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল।

বীরেশ্বর মাঝে মাঝে এখানে আসে। কখনও অংশুমান ডেকে পাঠায়, কখনও বা এমনিই আসে।

নেতা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে 'নবলক্ষ্মী' একটা প্রকাণ্ড ভয়ের কারণস্বরূপ। যখন যাকে নিয়ে পড়ে, তাকে একেবারে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রথমত বীরেশ্বরের ভাষা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, একেবারে মর্মস্থলে গিয়ে বেঁধে। দ্বিতীয়ত তার সংগ্রহশক্তি অপরিসীম। যে কথা কেউ জানে না, হয়তো আক্রান্ত ব্যক্তি নিজে কি সংশ্লিষ্ট দু'একজন অন্তরঙ্গ ব্যক্তি জানে, তেমন গোপন কথাও যথাসময়ে বীরেশ্বরের কানে গিয়ে ঠিক পৌঁছবে।

অমনি পরের সংখ্যায় বক্স করে বেশ বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হবে কোনো নামহীন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কয়েকটি ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্ন এবং পরবর্তী সংখ্যায় সমস্ত প্রকাশ করে দেবার হুমকি।

দশটার মধ্যে আটটা ক্ষেত্রে এতেই কাজ হয়।

অর্থাৎ সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতিনিধি এসে তার সঙ্গে দেখা করে। বীরেশ্বরের কাছে ধারে কারবার নেই। চেকও নয়, সমস্তই নগদা-নগদি। বস্তুত, তার কাগজের সব চেয়ে বড় রাজস্ব বিজ্ঞাপন থেকে নয়, গ্রাহকের চাঁদা থেকেও নয়, খোদ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা তাদের

প্রতিনিধিদের কাছ থেকেই। ইঙ্গিত হেনেই যদি 'নবলক্ষ্মী' চুপ করে যায়, ও-সম্বন্ধে আর উচ্চ-বাচ্য না করে তা হলে বুঝতে হবে চোরে-কামারে দেখা হয়ে গেছে।

কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এতে কাজ হয় না।

এই রকম ক্ষেত্রের কতকগুলির পিছনে থাকে স্বয়ং অংশুমান। সেখানে সন্ধ্যার অন্ধকার কোনো কাজেই আসে না। বীরেশ্বরের হাত-পা সেখানে বাঁধা। বাকি ক্ষেত্রগুলিতে আক্রান্ত অথবা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি খুবই শক্ত। তাদের ভয় দেখানো যায় না। বরং বীরেশ্বরকেই সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে চলতে হয়। আচমকা লাঞ্ছনার ভয় আছে। মাঝে মাঝে লাঞ্ছিত হয়েছেও। কিন্তু বীরেশ্বরও কম শক্ত ব্যক্তি নয়। বিশেষ, যেটা জীবিকা—সেখানে শক্ত হওয়া ছাড়াও তো উপায় নেই। সে তখন কিছুদিন বাইরে ঘোরাফেরা বন্ধ রাখে। কিংবা খুব সতর্কভাবে ঘোরাফেরা করে। এবং ভয় যে পায় নি সেটা দেখাবার জন্যে আরো ভয়ংকর অগ্নিবমন করে।

তবে এ-রকম ক্ষেত্র নিতান্তই কম। কালে-ভদ্রে ঘটে।

অংশুমান তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলে, নিমাইবাবুর ওটা কি সামনের সংখ্যায় বেরুচ্ছে ?

বিব্রতভাবে বীরেশ্বর বললে, আপনি যে বললেন ওর আরো কিছু উপকরণ আছে ?

—হ্যাঁ, সামনের সংখ্যায় ছাপবেন না। সমস্ত উপকরণ পাওয়ার পরে ছাপা হবে। এখনই ছেপে ফেললে লোকটা সতর্ক হয়ে যাবে। বাকি উপকরণ পাওয়া মুশকিল হবে। লোকটা খুবই ঘোড়েল। তা ছাড়া—অংশুমান ইঙ্গিতপূর্ণ হাসলে,—ভদ্রলোকের সঙ্গে অন্য লোক মারফত কথা চলছে।

—কী কথা ?

—একটা গাড়ির অভাবে তোমার খুব অসুবিধা হচ্ছে।

—তাই নাকি ?—উল্লাসে বীরেশ্বরের মুখ আকর্ণবিস্তৃত হল।

—হ্যাঁ। দেখা যাক, কী হয় ! একখানা মোটরগাড়ি পাওয়া গেলে ও নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করার দরকার নেই।

—সে তো বটেই।

গাড়ি একখানা পাওয়া যাবে কি যাবে না ভেবে মনটা তার উসখুস করতে লাগল।

অংশুমান আবার জিজ্ঞাসা করলে, সামনের সংখ্যার কাগজের ব্যবস্থা হয়েছে?

কাঁচুমাচু করে বীরেশ্বর জানালে, না, এখনও সুবিধা করতে পারি নি। বিজ্ঞাপনের বহু টাকা বাকি পড়ে গেছে। আদায় করতে পারছি না। কাগজের দোকানেও বেশ কিছু টাকা বাকি পড়েছে। অন্তত কিছু না দিলে তাদের কাছে কাগজ পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

অংশুমান ড্রয়ার থেকে তৎক্ষণাৎ দুখানা একশো-টাকার নোট বীরেশ্বরকে দিয়ে দিলে।

বীরেশ্বর খুশি হয়ে চলে যাচ্ছে এমন সময় অপূর্ব তাকে অন্য একটা ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

—আর-একটু চা খেয়ে যান।

চায়ের ফরমাশ করে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করলে, বেশ খুশি-খুশি মনে হচ্ছে যেন!

লজ্জিতভাবে বীরেশ্বর উত্তর দিলে, হ্যাঁ।

—আমাকেও খুশি-খুশি দেখাচ্ছে না?

ওর মুখের দিকে চেয়ে বীরেশ্বর বললে, হ্যাঁ।

—কেন বলুন তো?

—কেন?

—আপনারই মতো। আমারও কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে।

বীরেশ্বরের লজ্জিত ভাবটা কেটে গেল। খুশি হয়ে বললে, তাই নাকি! আচ্ছা!

অপূর্ব বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ সবারই কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটবে। ওই যে কালো ছেলেটিকে দেখছেন?

—হ্যাঁ।

—ওকে কর্তা এখনই ডাকবেন। একটু অপেক্ষা করুন, দেখবেন ও-ও খুশি হয়ে বেরুবে।

—তাই নাকি? কী ব্যাপার বলুন তো? গ্রহ-সন্নিবেশ কিছু?

—গ্রহই বটে!—বীরেশ্বরের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নিম্নকণ্ঠে অপূর্ব বললে, যেদিন অহল্যা দেবীর এ-বাড়িতে পায়ের ধুলো পড়ে, আমি দেখেছি, পরের দিন সকালে কর্তার মন দরাজ হয়।

অহল্যার নাম বীরেশ্বর কেন, যারা অংশুমানের নাম শুনেছে এমন সাধারণ নাগরিকও জানে।

চোখে একটা রেফের মতো টান দিয়ে বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলে, কাল তিনি এসেছিলেন বুঝি ?

—হ্যাঁ। অনেক দিন পরে।

উভয়েই টিপে টিপে হাসতে লাগল। এবং রসিক-সমাজে এইটি অনর্গল বাক্যস্রোতের চেয়ে অনেক বেশি অর্থপূর্ণ। চা এসে গিয়েছিল। হিল্লোলিত খুশিতে বীরেশ্বর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল।

ওদের মধ্যে সব কথাই হয়, বীরেশ্বর আর অপূর্বর মধ্যে।

বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলে, অহল্যা দেবী এলে কর্তার মন ভালো হয়, এ কী করে টের পেলেন ?

—পরিসংখ্যান নিয়েই আমার কারবার।—অপূর্ব গর্বভরে বলতে লাগল, অভিজ্ঞতায় এই তত্ত্বে পৌঁছেছি। আপনি একে 'কাকতালীয়' বলতে পারেন। কিন্তু একটা কাক যখনই তালের ওপর বসে তখনই যদি তাল পড়ে, তা হলে তাকে কী বলবেন ?

—'কাকতালীয়' বলব না।

—তা হলে এও তাই।

বীরেশ্বর একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, আরও অনেকেই তো আসেন !

—অনেকে। অনেক রকমের।

—তার মানে ?

—তার মানে, কুমারী-সধবা-বিধবা, রঙ-করা মুখ, রঙ-না-করা মুখ, ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্র। কর্তা আমাদের সর্বভুক, কিছুতেই আপত্তি নেই।

অপূর্ব হাসতে লাগল।

—এরা নিয়মিত আসে ?

—না। নিয়মিত কেউ না। এদের অনেককে দ্বিতীয়বার আসতে দেখি নি। অনেকে কয়েকবার এসে আর আসে নি। বাকি মাঝে মাঝে আসে।

—খরচও হয় প্রচুর।

—আপনি যত ভাবছেন তত নয়। আমি দেখেছি, খরচ কখনও বাজেট ছাড়িয়ে যায় না। সেদিকে অত্যন্ত সতর্ক।

অপূর্ব মিটি মিটি হাসতে লাগল।

বিস্মিতভাবে বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলে, তা হলে আসে কেন?

—জানি না। হয়তো নাম শুনে প্রত্যাশা নিয়ে আসে, আবার হতাশ হয়ে ফিরে যায়। কাউকে কাউকে চাকরিও জুটিয়ে দিয়েছেন। আবার অনেকে যে কেন আসে আজও বুঝতে পারলাম না।

—তার মানে?

—যেমন ধরুন, লটি দত্ত।

অপূর্ব একটা সিগারেট ধরালে। ধীরে-সুস্থে ধোঁয়া ছেড়ে বীরেশ্বরের দিকে চাইলে। বীরেশ্বর গভীর আগ্রহে ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

অপূর্ব বললে, এই লটি দত্ত এখানে কেন আসে জানি না।

—জানেন না?

—না। ধনীর মেয়ে, শিক্ষিতা, অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর বউ। ভদ্রমহিলা কেন যে আসেন জানি না। আবার দেখুন, মিসেস হিগিন্স।

—তিনি কে?

—স্বামী ব্যারিস্টার। ভালো প্র্যাকটিস। ভদ্রমহিলার জুয়াখেলার বাতিক আছে। যখন অনেক টাকা দেনা হয়ে পড়ে তখন মাঝে মাঝে হামলা করে।

—টাকার জন্যে?

—আবার কী?

অপূর্ব হাসতে লাগল। বললে, তবে আমাদের কর্তাও সহজ পাত্র নন। সেখানে দাঁত বসানো কঠিন।

বীরেশ্বর বললে, তবে অহল্যা দেবী এলে কর্তার মন ভালো হয় কেন?

—হয়।—আর একটু চিন্তা করে অপূর্ব বললে, দেখেছি, হয়। কেন হয় জানি না।

বীরেশ্বর বললে, লোকে বলে তাঁর সংসার ইনিই চালান।

—লোকে ভুল বলে।

—চালান না?

অপূর্ব হেসে উঠল: তা আমি কী করে বলব? তবে মনে হয়, চালান না। এ ভদ্রমহিলা একেবারে অন্য ধরনের। সংযত, গম্ভীর, অল্প কথা বলেন। বেশ-ভূষায়ও বাহুল্য নেই। অন্যদের মতো প্রজাপতি-মার্কা মোটেই নন।

—খুব সুন্দরী বোধ হয়?

—সুন্দরী, কিন্তু যাকে অপরূপ সুন্দরী বলে তা না। ওঁর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী মেয়ের পায়ের ধুলো এখানে পড়ে। অথচ—

—অথচ ?

অপূর্ব ঈষৎ হেসে বললে, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। নিজেই বুঝি না তো অন্যকে বোঝাব কী করে ? কি জানেন, যেদিন অহল্যা দেবী আসবেন সেদিন আমি বুঝতে পারি।

—কী করে ?

—কর্তার ব্যস্ততায়। কিন্তু নিরাড়ম্বর ব্যস্ততা। সেদিন হাতে কোনো কাজ রাখবেন না। আমার ছুটি হয়ে যাবে। বেশ বোঝা যাবে কার জন্যে যেন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন। আর কারও জন্যে তিনি প্রতীক্ষা করেন না। খুব আড়ম্বরের সঙ্গে বসবার ঘর সাজান হয় লটি দত্তের জন্যে। কিন্তু কোনো কোনো দিন দেখা যায়, লটি দত্ত বসবার ঘরে অনেকক্ষণ একা বসেই রয়েছেন, মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখছেন, কর্তা কিন্তু নিঃশব্দে হাতের জরুরী কাজ সেরে চলেছেন। সেটা শেষ হলে তবে ওঠেন।

বীরেশ্বর অবাক হয়ে অপূর্বর দিকে চেয়ে রয়েছে।

অপূর্ব বললে, সব চেয়ে আশ্চর্য কী জানেন, কর্তা তাঁকে রীতিমত সমীহ করে চলেন। প্রায় ভয়ের কাছাকাছি।

বীরেশ্বর লাফিয়ে উঠল : বলেন কী !

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—দেখেছেন তাঁকে ?

—দু'একবার সামনে পড়ে গেছি।

—কেমন দেখতে ?

হাত উলটে নিতান্ত উপেক্ষাভরে অপূর্ব বললে, নিতান্ত সাধারণ। গেরস্ত ঘরের বউ। ছেলেপুলের মা। কোনো রকম জাঁকজমক নেই। নিতান্ত শান্ত। অন্যেরা আসে কী তেজের সঙ্গে ! যেন বাড়ি দখল করতে আসছে। এ ভদ্রমহিলা আসেন অত্যন্ত সহজভাবে। যেমন আত্মীয়ের বাড়ি অতি-নিকট আত্মীয়া আসে তেমনি ভাবে। চলার মধ্যে কত গাম্ভীর্য, অথচ কত প্রত্যয় !

—আশ্চর্য !

—সত্যিই আশ্চর্য ! জানেন, এ-বাড়ির চাকর-বেয়ারারা তাঁকে কত ভক্তি করে ! কাউকে একটা পয়সা বকশিশও দেন নি। অথচ উনি আসা মাত্র

সবাই তটস্থ। কাউকে যদি কচিৎ কখনও কোনো ফরমাশ করেন সে যেন একেবারে কৃতার্থ হয়ে যায়।

বীরেশ্বরের ফেরবার তাড়া আছে, অপূর্বর গল্প শুনতে শুনতে সে-কথা ভুলেই গিয়েছিল এতক্ষণ। এখন উঠতে উঠতে বললে, ও-রকম রাশভারী মেয়ে এক-একটা থাকে। সবাই তাদের কাছে তটস্থ হয়ে থাকে।

দরজা পর্যন্ত তার প্রত্যুদ্‌গমন করতে করতে অপূর্ব বললে, যা বলেছেন! এরা রানী হয়ে জন্মায়।

কথাটা স্বীকার করে বীরেশ্বর চলে গেল। কাগজের অভাবে সত্যই তার কষ্ট হচ্ছিল। ছাপা আটকে রয়েছে। আজই কাগজ এনে ছাপতে দিতে হবে। তা হলে ঠিক সময়ে 'নবলক্ষ্মী' বেরিয়ে যাবে।

সন্ধ্যার পরে লটি দত্ত এল।

রঙ-করা মুখ। ভ্রূ আঁকা। চোখে কাজল। ঠোঁট লিপস্টিক দিয়ে ঘষা। নখে পালিশ। দীর্ঘ তনুদেহে হাল্‌কা স্বচ্ছ সিল্কের শাড়ি জড়ানো। পায়ে লাল মখমলের স্যাণ্ডাল। কানে হীরার দুল বিজলী আলোয় ঝকমক করছে। বাঁ হাতে কালো ফিতেয় বাঁধা ছোট্ট সোনার ঘড়ি। ডান হাতে দু'-গাছি সরু চুড়ি। কাঁধে লম্বমান ব্যাগ।

উপরের অফিস-ঘরে বসে অংশুমান কাজ করছিল।

লটি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বললে, গুড ঈভনিং সার্। আসতে পারি?

হেসে অংশুমান জবাব দিলে, এসে তো গেছ। এখন আর অনুমতি কেন? বোসো।

সামনের চেয়ারে বসতে বসতে লটি বললে, টেলিফোন করে এলাম না, পাছে তোমার সেক্রেটারি 'নেই' বলে বসে।

লজ্জিত হাস্যে অংশুমান বললে, আমি থাকলে, নেই বলবে কেন?

মাথায় ঝাঁকি দিয়ে লটি বললে, কেন তা জানি না, কিন্তু বলে। তার প্রমাণ আমার কাছে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে হীরার দুলটা ঝকমক করে উঠল। সেই লাল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে হীরার কুচির মতো দন্তশ্রেণীও।

প্রত্যুত্তরে অংশুমান একটা কী বলতে যাবে, বাধা দিয়ে লটি বললে, যাকগে সে-কথা। শোন, তোমার কাছে একটা কাজে এসেছি।

—কী সর্বনাশ!—অংশুমান হেসে উঠল, তুমি এসেছ কাজে! এইবার ভাবিয়ে তুললে।

লটি হেসে ব্যাগের ভিতর থেকে একখানা রসিদ-বই বের করলে। ওদের একটা সংঘ আছে : নারীকর্মীসংঘ। তারই চাঁদার রসিদ-বই।

সেইটে নেড়ে বললে, কেন মশাই, কাজে কি আমি আসি না? এ বইখানা মশায়ের অপরিচিত মনে হচ্ছে?

—না, মাসে মাসে দেখেছি বোধ হচ্ছে।

—হ্যাঁ।—খাতা খুলে লিখতে লিখতে লটি বলল, বের কর দেখি একখানা একশো টাকার নোট।

অংশুমানের চোখ কপালে উঠল। হাত জোড় করে বললে, দোহাই তোমার! আমার এখন বড্ড টানাটানি যাচ্ছে লটি। একশো টাকা দিতে পারব না।

—দাও তো। আমি খরচ পুষিয়ে দেব

মিনিট পনেরো ধস্তাধস্তির পর চল্লিশ টাকায় রফা হল।

—বাবাঃ! এত দর করতে পার তুমি!

রসিদটা নিয়ে চারখানা দশ টাকার নোট বার-দুই গুনে ওর হাতে দিয়ে অংশুমান জবাব দিলে, খেটে তো খেতে হল না। আঁচল উড়িয়েই দিন কাটে। আমার মতন হাটে হাটে ঘুরতে হলে বুঝতে পারতে কত কষ্টের পয়সা।

—আহা! কত কষ্টই করতে হয়! তোমার অফিসের লোকেরা এ-কথা বলতে পারে। তুমি নয়।

অংশুমান হেসে রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বললে, তারাও বলে, আমিও বলি। তারপর? দয়া করে এসে যখন গেলে, কোথায় যাওয়া যায় বল?

ভ্রূতে টান দিয়ে লটি বললে, কোথাও যাওয়া যায় না। বললাম না, কাজে এসেছি।

বিস্মিত কণ্ঠে অংশুমান বললে, অর্থাৎ কাজ হয়ে গেল, এবার চলে যাবে?

—না। কাজ হয় নি এখনও।

—আরও আছে?

—আছে একটু। শোন, একটি মেয়ের কোথাও একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পার?

এ-রকম প্রস্তাব অংশুমানের কাছে এই প্রথম এল না। সম্ভবত লটি এর আগে এ-রকম প্রস্তাব আর করে নি। কিন্তু অন্যে করেছে। তার সেইসব বন্ধুর কাছ থেকে এসেছে, যারা মেয়েদের সম্বন্ধে তার দুর্বলতা প্রত্যক্ষ-ভাবে জানে। আর এসেছে তার বিগতযৌবনা বান্ধবীদের কাছ থেকে।

লটি সেই পর্যায়ে পড়ে না। পড়তে এখনও কিছু দেরি আছে। সে জন্যে অংশুমান মুহূর্তকাল বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইলে।

জিজ্ঞাসা করলে, চাকরি?

লটি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

—কী রকম চাকরি

—মেয়েটি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছে। সেই রকম কোনো চাকরি সঙ্গে এনেছি। ডাকব?

—ডাক।

লটি পাশের ঘর থেকে ডেকে নিয়ে এল। সতেরো-আঠারো বছরের একটি রোগা মেয়ে। দারিদ্র্যের ছাপ তার চোখে, মুখে, সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত। সভয়ে ঢুকে নমস্কার করে দাঁড়াল।

অংশুমান তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার সর্বাঙ্গে বুলিয়ে বসতে বললে। মেয়েটি সংকুচিত ভাবে সব চেয়ে কাছের চেয়ারটির এক কোণে জড়সড় হয়ে বসল।

—কী নাম?

—স্বপ্না। স্বপ্না হালদার।

—কদ্দিন পাস করেছ?

—বছর-দুই হল।

একটুক্ষণ কি ভেবে অংশুমান জিজ্ঞাসা করলে, চাকরি করবে, না পড়তে চাও?

স্বপ্না একটু হেসে চোখ নামিয়ে বললে, পড়তে তো চাই। কিন্তু—

লটি বললে, ওর পড়ার ইচ্ছেই বেশি। পড়াশোনাতেও ভালো। প্রথম বিভাগে পাস করেছে। কিন্তু চাকরি না করলে তো সংসার অচল।

অংশুমান একদৃষ্টে স্বপ্নার দিকে চেয়ে ছিল। হাসিটা মিষ্টি। চমৎকার ভ্রূ-যুগল এবং তার নিচে ছায়াঘন পল্লব।

জিজ্ঞাসা করলে, বাড়িতে কে আছেন?

—বাবা, মা আর দুটি ছোট ভাই বোন।

—বাবা কিছু করেন না ?

—না। বাতে শয্যাগত। চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে।

বলতে বলতে মেয়েটির চোখে জল এল বুঝি।

—বড় ভাই নেই ?

—আছেন। কিন্তু বিয়ে করে তিনি অন্ত জায়গায় উঠে গেছেন।

অংশুমান আবার একটু কী যেন ভাবলে। তার নিজের অফিসে কালকেই একটা জায়গায় বসিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু যে-মেয়ের উপর তার দুর্বলতা জাগে তাকে নিজের অফিসে কাজ দেয় না। কাজের ক্ষতি হয়। ব্যাপারটা প্রচারিতও হয় তাড়াতাড়ি।

জিজ্ঞাসা করলে, চাকরিতে ঢুকলে কি পড়া হবে ?

স্বপ্না সাগ্রহে বললে, হবে। আমি একটু সুস্থ হতে পারলে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে পারব।

অংশুমান হাসলে : চাকরি আছে। তার পরে এদের নারী-সংঘের কাজ আছে। পড়বে কখন ?

—রাত্রে। অনেক রাত্রি জেগে। তেমনি করেই ম্যাট্রিক পাস করেছি।

অসম্ভব নয়। অংশুমান নিজে ভালো ছেলে ছিল না। কিন্তু যে ছেলেটি তাদের ক্লাসের শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিল, সে মোটেই পড়ত না। দিনরাত্রি আড্ডা দিত আর অন্ত ছেলেদের পড়া নষ্ট করত। অথচ পরীক্ষার সময় ঠিক ফার্স্ট হত।

বললে, চেষ্টা করে একটি চাকরি তোমার আমি যোগাড় করে দিতে পারি। কিন্তু একটা কথা দিতে হবে।

আগ্রহে স্বপ্না দাঁড়িয়ে পড়ল : কী কথা দেব বলুন।

ওর অবস্থা দেখে অংশুমান হেসে ফেললে : এই কথা দিতে হবে যে, দু বছরের মধ্যে পরীক্ষা দিয়ে তুমি পাস করবে।

স্বপ্না তৎক্ষণাৎ বললে, কথা দিলাম সার্।

অংশুমান ওর আত্মপ্রত্যয় দেখে চমৎকৃত হল।

বললে, ঠিক আছে।

তারপর ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে একটু হিসাব করে বললে, তুমি সামনের সোমবার আমার সঙ্গে দেখা করবে।

—কখন ? এই সময় ?

লটির দিকে চেয়ে হেসে বললে, এই সময় নয় সকালে, আটটার মধ্যে। কেমন ?

—আচ্ছা।

মেয়েটি যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে লটির দিকে চাইলে।

লটি হেসে বললে, অশেষ ধন্যবাদ। আমি চললাম তা হলে। সোমবার সকালে আমাকে কি ওর সঙ্গে আসতে হবে ?

অংশুমান হেসে বললে, এলে খুশি হব। না আসতে পারলেও ওর ক্ষতি হবে না। তুমি বরং সেদিন সন্ধ্যাবেলা এসে ওর খবরটা নিয়ে যেয়ো।

এর অর্থ স্বপ্না বুঝলে কি না কে জানে, কিন্তু লটি দত্তের চোখ কৌতুকে চকমক করে উঠল।

কিন্তু তখনই ভ্রূ কুঁচকে ব্যাগ থেকে ডায়েরিটা বের করে পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললে, সোমবার। টোয়েন্টিসেভেন্থ।…না, টোয়েন্টিসেভেন্থ অন্য কোনো এনগেজমেণ্ট নেই। আসব, নিশ্চয়ই আসব। আমি অকৃতজ্ঞ নই।

—সেটা প্রমাণ-সাপেক্ষ।

—সেই দিন প্রমাণ নিশ্চয়ই দেব।

বলে প্রজাপতির মতো হালকা হাওয়ায় যেন নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল। অংশুমান কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে কী যেন ভাবলে। তারপর কলমটা তুলে নিয়ে কাজ করতে বসল এবং দেখতে দেখতে কাজের মধ্যে ডুবে গেল।

॥ ছয় ॥

সীতানাথের একটি বন্ধু-উকিলের ছেলে বি এ পাস করেছে। একটি বিখ্যাত বিলাতী কোম্পানিতে ভালো একটি চাকরি খালি হয়েছে। কোনো বিশিষ্ট লোকের সুপারিশ পাওয়া গেলে ছেলেটির চাকরিটা হতে পারে। একজন সেই বন্ধুটিকে বলেছে, সার্ অংশুমানের সুপারিশ পাওয়া গেলে নির্ঘাত চাকরি পাওয়া যাবে। কোম্পানির বড় সাহেবের সঙ্গে সার্ অংশুমানের খুব খাতিরের সম্পর্ক।

বন্ধুটি বললেন, কী সর্বনাশ! অত বড় লোকের সুপারিশ পাই কী করে?

লোকটি বললে, তুমি চেষ্টা করলে খুব কঠিন হবে না।

—কী করে?

—সীতানাথকে ধর।

এর বেশি বলবার দরকার ছিল না। বিখ্যাত লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার একটা অসুবিধা হচ্ছে, ঘনিষ্ঠতাটাও বিখ্যাত হয়ে যায়। অহল্যার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। যারা সার্ অংশুমানের নাম জানে, তারা অহল্যার নাম, এমন কি সেই সূত্রে সীতানাথের নামও জানে।

সীতানাথকে ধরার প্রসঙ্গে বন্ধুটি জিভ কেটে বললে, পাগল!

—কেন, পাগল কেন?

—সীতানাথকে ধরা যায়?

—না যাবার কী আছে?

—কী আছে তুমি জান না—জানে বন্ধুটি জানে। জানে, বলেই ধরতে বলেছে। তবে আর কী করবে!

করার সত্যিই কিছু নেই। ছেলের চাকরি হোক আর না-হোক, এ কথা সীতানাথকে বলা যায় না। বলার অর্থ তো স্বপ্রকাশ: স্ত্রীর সঙ্গে অংশুমানের সম্পর্কের কথা আমরাও জানি।

ছেলের চাকরি যত বড় দরকারীই হোক, এত বড় অপমানকর অনুরোধ সীতানাথের মতো বন্ধুকে করা যায় না।

করা যায় না বটে, কিন্তু কয়েকদিন নানা চিন্তা এবং গবেষণায় অবশেষে সেই অপমানকর অনুরোধই পুত্রদায়গ্রস্ত বন্ধুকে করতে হল।

কথাটা তুললে সীতানাথই একদিন :

—কী হে, তোমার ছেলের চাকরি কতদূর ?

—সে এখনও বিশ-বাঁও জলে।

—কী-রকম ?

—সুপারিশ তো চাই। ভালো রকম সুপারিশ।

—পাচ্ছ না ?

—কোথায় পাব ?

সীতানাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করলে, কী রকম সুপারিশ চাই বল তো ? আমার যদি কেউ জানা থাকে, চেষ্টা করে দেখতে পারি।

এত বড় প্রলোভন সংবরণ করা বন্ধুর পক্ষে অসম্ভব হল। এ যে স্বয়ং লক্ষ্মী দরজায় এসে ভিক্ষে চাইছেন! তাঁকে কি বিমুখ করা যায় ? করা কি সঙ্গত ? এ-কথা যখন তার স্ত্রী কি ছেলে শুনবে তারা কি তাকে ধিক্কার দেবে না ? তার নিজের মনেই বা কী হবে ?

বন্ধু আর থাকতে পারলে না। বললে, কোম্পানির বড় সাহেবের কাছে শুনেছি সার্ অংশুমানের খুব খাতির। কিন্তু অত বড় লোকের সুপারিশ সংগ্রহ করা চাট্টিখানি কথা নয়।

বন্ধুটি হতাশভাবে হাসলে।

পলকের মধ্যে সীতানাথের মুখ ফ্যাকাশে হয় গেল : সার্ অংশুমান!

—হ্যাঁ। ওসব হবে না হে। দরখাস্ত করে দেওয়া রয়েছে। যা হবার হবে। আমি আর ভাবতে পারি না।

অনেকক্ষণ পরে সীতানাথ আবার জিজ্ঞাসা করলে, সার্ অংশুমানের সুপারিশ পেলে হয় ?

—নির্ঘাত।

সীতানাথ নিঃশব্দে চিন্তা করতে লাগল। বন্ধুটি ওর মুখের প্রত্যেকটি রেখা আড়চোখে লক্ষ্য করছে, সেদিকে সীতানাথের খেয়ালই নেই।

সে আর-একবার বললে, সার্ অংশুমান!

তারপর বললে, আমার একটি সূত্র আছে। একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি, যদি হয়। তোমার ছেলের নামটা লিখে দাও তো।

বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ একটা কাগজে ছেলের নাম-ঠিকানা-বিদ্যাবুদ্ধি লিখে দিলে।

অন্তমনস্কভাবে সেটা নিয়ে পকেটে পুরে সীতানাথ অন্ত দিকে চলে গেল।

বন্ধুপ্রীতির বশে, বেকার বন্ধুপুত্রের প্রতি সহানুভূতিতে সীতানাথ কাজটা করে ফেললে। কিন্তু কাজটা ভালো হল কি না সে বিষয়ে তার নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কী করবে সে?

অংশুমানের সঙ্গে তার পরিচয় অতি সামান্য। তার গৃহে অংশুমান কখনও আসে নি। সেও কোনোদিন অংশুমানের গৃহে যায় নি। দু-একবার শ্বশুর-বাড়িতে দেখা হয়েছে মাত্র। দৈবাৎ। সে এমন কিছুই নয়, যার জোরে স্যর্ অংশুমানের মতো লোককে বন্ধুপুত্রের সুপারিশের জন্যে বলা যায়। শেষ দেখা, সেও বোধ হয় বছর দশেক হবে। তখন অংশুমান স্যর্ হয় নি। আজ অর্থ নৈতিক সামাজিক জীবনে তার স্থান অনেক উঁচুতে। দশ বছর আগের দেখা লোককে আজ যদি সে চিনতে না পারে, তাতেও তাকে দোষ দেওয়া যাবে না।

কোর্ট থেকে ফেরার সময় সমস্ত পথ সে ভাবতে ভাবতে এল। বাড়ি ফিরেও এই কথাটা তার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল।

কী করা যায়? কী করা যায়?

ভেবে কোনো দিশা পায় না সীতানাথ।

চায়ের টেবিলে অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, কী অত ভাবছ? মামলায় হার হয়েছে?

হেসে সীতানাথ বললে, মামলার হার হলে উকিলে অত ভাবে না। বলে, হাসতে হাসতে ফাঁসিতে ঝুলে পড়। আপীলে দেখা যাবে।

—তবে অত ভাবনাটা কিসের?

—একটা বন্ধুর ছেলের জন্যে।

—কী হয়েছে তার? কঠিন অসুখবিসুখ কিছু?

সীতানাথ হেসে ফেললে: তারও চেয়ে বেশি। চাকরি চাই।

—তুমি কোথায় চাকরি দেবে?

—আমি আর কোথায় দোব? চাকরির জন্যে একটা সুপারিশ যোগাড় করে দিতে হবে।

—কার সুপারিশ?

সীতানাথের বন্ধু এত বড় প্রলোভন ছাড়তে পারে না। কিন্তু সে তার ছেলের স্বার্থে। সীতানাথের স্বার্থ তত বড় নয়। পুত্রের স্বার্থ আর বন্ধুপুত্রের স্বার্থ এক নয়।

কিন্তু নিজের পুত্রের স্বার্থ হলেও কি সীতানাথ পারত!

না বোধ হয়।

এ প্রলোভন সীতানাথ ছেড়ে দিলে।

বললে, একজন ভালো লোকের আর·কি? তা সে হবে এখন। এমন কিছু তাড়া নেই।

অহল্যা হেসে বললে, তাড়া নেই তো ভাবছ কেন? তার চেয়ে বরং

চেয়ার থেকে উঠে সীতানাথ বাধা দিয়ে বললে, হ্যাঁ, তার চেয়ে বরং মক্কেল ঠ্যাঙানো ভাল।

হেসে অহল্যা বললে, মক্কেল পাবে কোথায় আজ? কাল কোর্ট বন্ধ না?

তাই বটে। বন্ধুপুত্রের চিন্তায় সে-কথাটা সীতানাথ ভুলে গিয়েছিল। বললে, তার চেয়ে বরং কী করা যায় তা হলে?

—থিয়েটার।

সীতানাথ আকাশ থেকে পড়ল: থিয়েটার!

মিষ্টি হেসে অহল্যা বললে, 'রক্ত গোলাপ' বইটা শুনলাম ভালো হয়েছে। তোমারও কাল ছুটি।

চিন্তিত ভাবে সীতানাথ বললে, এখন কি টিকিট পাওয়া যাবে?

—টিকিট কেনা হয়ে গেছে।

—বল কী!

—হ্যাঁ।

—একে থিয়েটার যা আমি ক্বচিৎ যাই। তার ওপর টিকিট কেনা হয়ে গেছে! তোমার হল কী!

মুখ নীচু করে অহল্যা বললে, কী জানি কী হয়েছে!

সীতানাথ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অহল্যা বললে, তুমিই তো লোভ ধরিয়ে দিয়েছ।

—কিসের লোভ?

—তোমার সঙ্গে সিনেমা-থিয়েটার দেখার।

সীতানাথ বললে, বুঝলাম। দোষ আমারই। 'না' বলার উপায় নেই চল তা হলে।

মনটা তার অপার্থিব খুশিতে ভরে উঠল। সেই সঙ্গে আর-একটি বিষয়ে স্থির-সংকল্প করলে, বন্ধুপুত্রের চাকরির অদৃষ্টে যাই ঘটুক, অংশুমানের সুপারিশ আনবার জন্যে অহল্যাকে সে কখনই অনুরোধ করবে না।

সংকল্প করলে বটে, রাখা কঠিন।

ছুটির পরদিন কোর্টে যেতেই বন্ধুটি ঘন ঘন কারণে-অকারণে তার কাছে আসে। তার মুখের দিকে চেয়ে কিসের যেন প্রতীক্ষা করে। কিন্তু কিছু বলে না।

পরের দিনও সেই অবস্থা। তফাতের মধ্যে আগের দিন বন্ধুর চোখে যে ভরসা ছিল, পরের দিন ভরসাটা তার চেয়ে কম। তার পরের দিন আরও কম। তার পরের দৃষ্টি রীতিমত করুণ।

সীতানাথ বন্ধুবৎসল এবং পরদুঃখকাতর। তার পক্ষে দিনের পর দিন এই সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন।

অথচ করবে কী? বার কয়েক ভুলেও সে তার সংকল্পে অটল। না, অহল্যাকে বলা যায় না। অন্তত তার পক্ষে বলা শোভন নয়। অবশেষে সে নিজেই সার্ অংশুমানের কাছে যাওয়া স্থির করল। হলে ভালো না যদি হয় আর কী করতে পারে সে! তার পক্ষে যা-করা সম্ভব, বন্ধুপুত্রের জন্যে তা তো করবে সে। বন্ধু যাই ভাবুক, তার নিজের বিবেক তো পরিষ্কার। এ সংসারে সেইটেই কি যথেষ্ট নয়?

রবিবার সকালে সার্ অংশুমানকে টেলিফোন করলে সে।

অংশুমান সামান্য লোক নয়। তাকে টেলিফোনে পাওয়াও সহজ নয়। প্রথমে টেলিফোন ধরলে তার সেক্রেটারি।

—হ্যালো, কাকে চান?

—সার্ অংশুমান আছেন?—ভয়ে এবং বিনয়ে সীতানাথের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ।

—কে কথা বলছেন?

—বলুন সীতানাথ চৌধুরী।

এই নামের কেউ এর আগে সার্ অংশুমানকে ফোন করে নি। তাই সেক্রেটারি জিজ্ঞাসা করলে, এই বললেই বুঝতে পারবেন তিনি?

একটু একটু করে সীতানাথ ভয় অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছে ততক্ষণে। বললে, তা তো জানি নে। তবে পারা তো উচিত।

—ধরুন একটু।

সেক্রেটারি জানালে সার্ অংশুমানকে। সীতানাথ চৌধুরী! ভ্রূ কুঁচকে অংশুমান স্মরণ করবার চেষ্টা করলে, কে হতে পারে লোকটা। সীতানাথ চৌধুরী! অহল্যার স্বামীর ওই রকম একটা নাম না? কিন্তু।

অংশুমান ভেবেই পেলে না অহল্যার স্বামী কোন্ কারণে তাকে ফোন করতে পারে।

তবু বললে, দাও টেলিফোনটা।

অংশুমান 'হ্যালো' বলতেই সীতানাথ নিজের নাম, সেই সঙ্গে রাস্তায় নামও বললে। অংশুমানের আর সন্দেহ রইল না যে, সীতানাথ অহল্যার স্বামী।

বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন। কী ব্যাপার?

—আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। কখন আপনার সুবিধা হবে?

অহল্যার স্বামী আসছে দেখা করতে! কী ব্যাপার হতে পারে চিন্তা করতে করতে অংশুমান এন্‌গেজমেণ্ট প্যাডটা দেখতে লাগল।

তারপর বললে, আজ তো রবিবার। সকালটা ফ্রী আছি। ধরুন নটা থেকে দশটার মধ্যে। আপনার সুবিধা হবে?

—হ্যাঁ, হবে। তা হলে ওই সময়ই যাব।

—আসবেন। খবর সব ভালো তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। খবর মোটামুটি মন্দ নয়।

উভয়েই টেলিফোন নামিয়ে রেখে দিলে।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সীতানাথ মনে মনে বললে, এই ভালো হল। অহল্যাকে দিয়ে বলানোর চেয়ে নিজে বলাই ভালো।

নটার দেরি ছিল না। সীতানাথ বেরিয়ে পড়ল।

অংশুমান পরম সমাদরে সীতানাথকে অভ্যর্থনা করলে।

অভিযোগ করলে, অহল্যা আমার সহোদর বোনের মতো। সে সূত্রে আপনি আমার পরমাত্মীয়। কখনও তো আসেন না।

সীতানাথ হাসলে: হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া আপনার কত কাজ সমস্ত সময় কত ব্যস্ত থাকেন!

চা এল, খাবার এল।

সীতানাথ ব্যস্তভাবে বললে, এসব আবার কী!

—বিলক্ষণ। আপনি কুটুম্ব লোক। মহাকুটুম্ব। এটুকু না করলে আপনি অহল্যার কাছে গিয়ে নিন্দে করবেন—তোমার দাদার ওখানে গেলাম, এক পেয়ালা চা দিয়েও আপ্যায়িত করলেন না! বলবেন তো?

সীতানাথ হেসে বললে, না, বলব না। পুরনো জামাইকে খাওয়াতে হয় না।

কিছুক্ষণ হৃদ্য আলোচনার পর অংশুমান জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর বলুন, আর-সব খবর কী?

—একটা প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।

—বলুন।

—আমার একটি বন্ধুর ছেলে একটি চাকরি খুঁজছে। তার একটা সুপারিশ দরকার।

—কোথায় চেষ্টা করছে?

সীতানাথ কোম্পানির নামটা বললে। আরও বললে, ওখানকার বড় সাহেব নাকি আপনাকে খুবই খাতির করেন।

অংশুমান একটুক্ষণ নিঃশব্দে কী যেন চিন্তা করলে।

তারপর জিজ্ঞাসা করলে, ছেলেটির নাম কী?

সীতানাথ নাম বললে।

সেক্রেটারিকে ডেকে অংশুমান বলে দিলে, প্রশংসাপত্রে কী লিখতে হবে। সেক্রেটারি সেটা টাইপ করে এনে দিলে। তাতে নাম সই করে অংশুমান সেটা সীতানাথকে দিলে।

বললে, দেখুন এতে হবে কি না!

সীতানাথ পড়ে দেখলে, চমৎকার একটা প্রশংসাপত্র।

বললে, নিশ্চয়ই হবে।

অংশুমান বললে, অত সহজ অবশ্য নয়। দরকার বুঝলে জানাবেন, আমি টেলিফোনেও গ্রিফিথস সাহেবকে বলে দিতে পারি।

—তা হলে তো খুবই ভালো হয়।

অংশুমানের সহৃদয়তা এবং উদারতায় মুগ্ধ হয়ে সীতানাথ ফিরে এল। অনুরোধে পড়ে প্রশংসাপত্র দেওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু টেলিফোন করতে কে রাজী হয়?

সীতানাথ বিগলিত হয়ে গেল। অংশুমান বার বার করে তাকে মাঝে মাঝে আসতে বলেছে। আসতে হবে মাঝে মাঝে। অনেকের অনেক উপকার হতে পারে।

বাড়ি ফিরে অহল্যার কাছেও সে অংশুমানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল, চমৎকার মানুষ! এমন মানুষ হয় না।

অহল্যা বিস্মিতবিস্ফারিত নেত্রে নিঃশব্দে ওর দিকে চেয়ে রইল। ভালো-মন্দ কিছুই বললে না।

॥ সাত ॥

এই সাক্ষাৎকারের ফল হল, বন্ধুর ছেলেটির চাকরি তৎক্ষণাৎ হয়ে গেল কিন্তু তারও চেয়ে বড় ফল একটা হল।

স্ত্রীর অপবাদ স্বামীর কানে সহজে আসে না। অহল্যা সম্বন্ধেও কোনো অপবাদ সীতানাথের কানে আসে নি। কিন্তু নানা কারণে তার নিজের মনে সন্দেহ জেগেছিল। সন্দেহকে প্রশ্রয় দেওয়া তার স্বভাব নয়। তার উপর জমাট পসারের জন্যে সন্দেহকে লালন করার অবসরও তার কম।

কিন্তু সন্দেহ জেগেছিল।

অংশুমানের একটা কথায় সেই সন্দেহ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। "অহল্যা আমার সহোদর বোনের মতো। সেই সূত্রে আপনি আমার পরমাত্মীয়। কখনও তো আসেন না।" ওর কণ্ঠের অভিযোগের মিষ্টি সুর থেকে থেকেই সীতানাথের কানে বাজছে।

অহল্যাদের পরিবারের সঙ্গে অংশুমানের প্রথম জীবনের ঘনিষ্ঠতার কথা সীতানাথ শুনেছে। শুনেছে, অহল্যার পড়াশোনার এবং তার বিবাহের সমস্ত খরচও অংশুমানই বহন করেছে। সহোদর বোনের মতো মনে না করলে পরের মেয়ের পড়ার খরচ এবং শেষ পর্যন্ত তার বিবাহের খরচ কেউ বহন করে না।

সীতানাথের মনে ভুল সন্দেহ জেগেছিল। হয়তো স্বাভাবিক ভাবেই জেগেছিল। পিছনের ইতিহাসটা না জানলে এ-রকম সন্দেহ অনেকের মনেই জাগতে পারে। যদিচ সন্দেহটা আসলে মিথ্যা।

ভাগ্যে অংশুমানের সঙ্গে এই সুযোগে দেখা হয়ে গেল! নইলে হয়তো এই মিথ্যা সন্দেহটাই তার মনের এক কোণে মাকড়সার মতো জাল বুনত।

অংশুমান সম্বন্ধে সীতানাথ খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গল্প তো করেই, অহল্যার কাছেও। বন্ধুরা চুপ করে শোনে। সীতানাথ লক্ষ্য করে না ওদের ঠোঁটের কোণে প্রাণপণ চেষ্টায় দমিত বাঁকা হাসি। অহল্যাও চুপ করে শোনে। সীতানাথ লক্ষ্য করে না তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। আপন মনের আনন্দেই সে গল্প করে চলে।

ছুটির দিনে মাঝে মাঝে অহল্যাকে তাগাদা করে: চল। আজ অংশুদার বাড়ি ঘুরে আসি। আমাদের দেখলে খুব খুশি হবেন ভদ্রলোক।

সার্ অংশুমানকে সীতানাথ এখন অংশুদা বলে। না বলবে কেন, অহল্যা যখন তার সহোদর বোনের মত এবং সীতানাথকে যখন সে মহাকুটুম্ব বলে মনে করে।

কিন্তু অহল্যা পাশ কাটিয়ে যায়।

কোনোদিন তার শরীরটা ভালো থাকে না; বাইরে বেরুতে ইচ্ছা করে না। কোনোদিন বা তারও চেয়ে লোভনীয় কোনো প্রস্তাব তোলে।

কিন্তু বারে বারে এ-রকম প্রস্তাব আসতে একদিন সে অংশুমানের সঙ্গে কলহই করলে: প্রশংসাপত্র নিতে এসেছিল, দিয়ে দিলে। তার মধ্যে মহাকুটুম্ব, সহোদর বোনের মতো, এসব না বললে চলত না?

নিরীহ ভাবে অংশুমান বলে, কেন? কী হয়েছে?

—হয়েছে ভালো।—অহল্যা হেসে ফেললে,—এখন মাঝে মাঝেই বলেন, চল, দুজনে অংশুদার ওখান থেকে ঘুরে আসি।

—বেশ তো, গেলেই না হয় ঘুরে। সে তো ভালোই।

অহল্যা গম্ভীরভাবে বললে, না। আমি সেটা পছন্দ করি না।

—কেন, দোষ কী?

—দেখ, তোমার ঐশ্বর্য আর প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে সকলেরই তোমার আত্মীয় হবার জন্যে লোভ হয়। সেই লোভ ওঁর হোক, এ আমি চাই নে।

—কেন?

—তুমি জান না, উনি অন্য ধরনের মানুষ।

অংশুমান বললে, অন্য ধরনের মানুষ যদি, তা হলে বড়লোকের আত্মীয় হবার লোভ কেন?

—লোভ তো ছিল না। তুমিই জাগিয়েছ। না না, এ আমি মোটেই পছন্দ করি না।

পরিহাস নয়, অহল্যা যে সত্য সত্যই পছন্দ করে না, তা ওর মুখের ভাবে, ওর কণ্ঠস্বরেই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অংশুমান বললে, তা আমি কী করতে পারি বল?

—তুমি দেখা কোর না।

—ভদ্রলোক দেখা করতে চাইলে 'না' বলি কেমন করে ?

অহল্যা বিরক্তভাবে বললে, তাও তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে ? যেমন করে প্রত্যহ আরও হাজার হাজার লোককে 'না' বলে থাক, তেমনি করে।

টিপে টিপে হাসতে হাসতে অংশুমান বললে, যাদের বলি তারা তো পরমাত্মীয় নয়। এ যে—বলেই আবার বললে, কী তোমাকে বলি, মানুষটিকে আমার ভালো লেগেছে। তুমি ঠিকই বলেছ, অন্য ধরনের মানুষ।

একটু থেমে বললে, আমাদের ধরনের নয়।

প্রতিবাদ করে অহল্যা বললে, কেন, আমরা কি ভালো মানুষ নই ?

সংশোধন করে অংশুমান বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমরাও ভালো মানুষ, কিন্তু অন্য ধরনের। অর্থাৎ আমাদের কতকগুলো জিনিস আছে যা ওদের নেই। আবার ওদের কতকগুলো জিনিস আছে যা আমাদের নেই।

অহল্যা বললে, তোমাকেও ওঁর ভালো লেগেছে, কদিন তো দিনরাত তোমার কথাই বলছেন।

—তোমার হিংসা হত না ?

—না। মনে হত, ওগুলো আমার সম্বন্ধেও খাটে।

—কেন, তুমি-আমি কি একই ধরনের ?

—অন্তত খানিকটা। দুজনের কাজেই হৃদয় বস্তুটা গৌণ।

একটু হেসে অংশুমান বললে, মন্তব্যটা আমার পক্ষে সত্যি। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়।

—কেন ?

অংশুমান তার আর কারণ বললে না। শুধু বললে, হয়।

সীতানাথ অংশুমানের সঙ্গে মাখামাখি করে এটা অহল্যা পছন্দ করে না। কেন করে না, তা বলে নি। হয়তো সে নিজেও জানে না। তার মনে অস্পষ্ট-ভাবে এই কথাটা উঠেছে যে, সে অন্য ধরনের লোক।

অংশুমানও তা স্বীকার করে। মানুষ সম্বন্ধে তার প্রচুর অভিজ্ঞতা। এবং সে অভিজ্ঞতার মূল্যও বড় সামান্য নয়। সেও উপলব্ধি করেছে, সীতানাথের মধ্যে অনেক বস্তু আছে যা তার নেই। কিন্তু সেইটেই তার মেলামেশায় অপছন্দ হবার কারণ হতে পারে না।

তা হলে কারণটা কী ?

অংশুমান বুঝতে পারে না। নানারকম অনুমান করে। কিন্তু কোনোটাতেই সন্তুষ্ট হয় না। এর মধ্যে যে অনুমানটা তাকে ঈর্ষান্বিত করে, পীড়িত করে, সে হচ্ছে এই যে, অহল্যা সীতানাথকে ভালোবাসে না তো ?

অনেক মেয়ের সঙ্গে অংশুমানের ঘনিষ্ঠতা আছে। এখানে আসে। অনেকের স্বামী বর্তমান। অংশুমান দেখেছে, স্বামী সম্বন্ধে তাদের নিদারুণ অবজ্ঞা। তারা নিতান্ত পরিহাসের বস্তু। উপেক্ষাভরে তাদের উল্লেখ করে। অনেকে গ্রাহ্য করে না। প্রকাশ্যভাবে অংশুমানকে নিজেদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে। অংশুমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যে তারা লজ্জিত তো নয়ই, বরং গৌরব অনুভব করে।

এই তো সেদিনের কথা।

অংশুমান মদনমোহন হাসপাতালের একজন কর্তা-ব্যক্তি। সুলতা ঘোষের বাড়ির চাকরকে বেড না দেওয়ার জন্যে সুলতা সংশ্লিষ্ট ডাক্তারকে অংশুমানের নাম করে ভীষণ ধমকে দেয়। এমন কি, অংশুমানের মতো মস্ত বড় লোকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা পাছে ডাক্তার বিশ্বাস না করে, সেজন্যে সেখান থেকে সে অংশুমানকে টেলিফোন করে এবং এমনভাবে তার সঙ্গে আলাপ করে যে, অদৃশ্য প্রান্ত থেকেও অংশুমান লজ্জা বোধ করছিল।

অহল্যা কিন্তু অন্য ধরনের।

স্বামীর সম্বন্ধে অংশুমানের সঙ্গে আলোচনা বড়-একটা সে করেই না। যদি কখনও বিশেষ প্রয়োজনে করতে হয়, খুব সংযতভাবেই করে।

অথচ অংশুমান জানে, অহল্যার হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ খুব সামান্য। কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত সে হয় না, অসংযত হয় না। স্বভাবত সে গম্ভীর। তার আনন্দের প্রকাশও সীমিত।

এই জন্যেই অহল্যাকে অংশুমান সমীহ করে। মাঝে মাঝে তার সঙ্গের জন্যে ক্ষুধা অনুভব করে। আর-সকলের সঙ্গে যেন তার খেলার সম্বন্ধ, অহল্যার সঙ্গে তেমন নয়। অহল্যা হাসলে অংশুমান খুশি হয়, রাগলে বিচলিত হয়।

অহল্যার কথাটা সেই জন্যেই সে ভাবে এবং স্বামীকে সে হয়তো ভালো বাসে এই সন্দেহ করে ঈর্ষা বোধ করে।

অথচ অহল্যার ব্যাপারটা অন্য রকম।

সীতানাথের বন্ধুর ছেলের প্রশংসাপত্র দিয়ে তার মন নানা কদর্য কল্পনায়

ভরে উঠেছে। সে কল্পনা করে, তার স্থানীয় বন্ধুমহলে এই নিয়ে অপ্রকাশ্যে কি হাসাহাসিই না চলছে!

তা হলে যা রটে তার কতক ঘটে। ব্যাপারটা যে মিথ্যা নয়, এই ক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল। তুমি কে হে, যে সার্ অংশুমানের মতো লোকের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র নিয়ে আস? এত কিসের খাতির তোমার সঙ্গে? সহোদর বোন! কী রকম সহোদর বোন হে বাপু!

সঙ্গে সঙ্গে একটা কদর্য রকমের হাসির ঐকতান।

ভাবতেও অহল্যার গাটা রি-রি করে ওঠে।

বলেছিল একদিন সীতানাথকে: ও-রকম করে প্রশংসাপত্র চাইতে যেয়ো না। উনি পছন্দ করেন না ওসব।

—তাই নাকি!—সীতানাথের মুখ পাংশু হয়ে উঠেছিল, কই, সে রকম তো মনে হল না। বরং বেশ যেন খুশি হয়েই ছিলেন।

—তুমি প্রথমবার গেছ। কী আর বলবেন!

—অমন করে যেতে বললেন মাঝে মাঝে—

—ওটা ভদ্রতা।

—তা তো ভাবতে পারি নি। আচ্ছা।

সীতানাথের মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার কিন্তু ও-রকম মনেই হয় নি। বরং মনে হয়েছে ওর কথাগুলো অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ। কিন্তু অহল্যা তাকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। তার চেয়ে তো সার্ অংশুমানকে কেউ বেশি চেনে না। সে যখন বলছে তখন তাই হবে। সাধারণ ভদ্রতা মাত্র। তা ছাড়া আর-কিছু নয়। বড়লোকের মনের কথা অনেক গভীরে থাকে। তল পাওয়া কঠিন।

অহল্যা যখন বলছে, তখন তাই হবে।

সেইজন্যেই বোধ হয় দুজনে মিলে অংশুমানের বাড়ি যাওয়ার প্রস্তাব যখনই সীতানাথ উৎসাহের সঙ্গে করেছে, অহল্যা কেমন এড়িয়ে গেছে, পাশ কাটিয়ে গেছে: আজ তার শরীর খারাপ, কাল মাথা ধরেছে, আর-একদিন ভালো লাগছে না।

তাই বটে। অংশুমানকে অহল্যা জানে বলেই এমন করেছে।

সীতানাথের মনটা খারাপ হয়ে গেল। যে-লোক কোর্টে গিয়েই হয়

নিজের উৎসাহে, নয় অন্যের প্ররোচনায় অনর্গল অংশুমানের সম্বন্ধে আলোচনা করত। এর পর থেকে সে চুপ করে গেল।

—সার্ অংশুমান! হ্যাঁ, সার্ অংশুমান। না, অনেক দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। কী জান, বড়লোকদের সঙ্গে অকারণে বেশি মেলামেশা করা আমি কখনও পছন্দ করি না। দরকার পড়লে—

—দরকার যে পড়ে হে! আমাদের মতো লোকের বড়লোকের সব সময়েই দরকার পড়ে। আত্মীয়দের সঙ্গে মেলামেশাটা—

—না, না। ও-সব আমার পোষায় না।

তারপরেও যদি কেউ কিছু বলতে গেছে, সীতানাথ তাকে থামিয়ে দিয়েছে। কিংবা নিরুত্তরে পাশ কাটিয়ে গেছে। কোর্টে তার কাজ কম নয়। ভালো পসার। মক্কেলদের সংখ্যাও অনেক। বাজে গল্প করার সময় নেই।

না। অহল্যার একটা কথায় অংশুমান সম্বন্ধে সীতানাথের সমস্ত উৎসাহ স্তব্ধ হয়ে গেল। এর পর থেকে তার মুখে অংশুমানের প্রসঙ্গ আর কেউ শোনে নি।

এর কিছুদিন পরে সীতানাথের কাছে একটা নিমন্ত্রণপত্র এল। কী উপলক্ষে সার্ অংশুমান একটা পার্টি দিচ্ছে, তাতে যোগদানের নিমন্ত্রণ। সীতানাথ উপরে আসবার সময় চিঠিখানা এনে অহল্যার হাতে দিলে।

—কী এটা?—অহল্যা প্রশ্ন করলে।

—তোমার দাদা একটা পার্টি দিচ্ছেন, তাতে নিমন্ত্রণ।

অহল্যা পড়ে দেখলে।

—আজ দুপুরেই?

—হ্যাঁ।

—যাবে?

—কী করব?

অহল্যা ভাবলে। সেদিনের কথাবার্তার পরও অংশুমান নিমন্ত্রণ করেছে। যদিও বাড়িতে নয়, হোটেলে। অংশুমানকে সে চেনে। মানুষকে কলুষিত করায় তার আশ্চর্য পটুতা। তার সেই কথাটা মনে পড়ল: সীতানাথ অন্য ধরনের মানুষ। ওকে অংশুমানের ভালো লেগেছে।

অংশুমানের ভালো-লাগাকে অহল্যা ভয় পায়।

দেখেছে, যখনই অংশুমানের কাউকে ভালো লেগেছে, মনে হয়েছে লোকটি

অন্য ধরনের তখন তাকে কলুষিত করবার জন্যে একটা নিঃস্বার্থ উদ্যোগ এবং উদ্যম তার মধ্যে দেখা যায়।

পৃথিবীতে অন্য ধরনের মানুষ থাকবে না। এক ধরনের মানুষ থাকবে, এবং সে তার নিজের ধরনের—এ একটা তার জেদ।

সেইটেকে অহল্যা ভয় পায়।

সে একটু ভাবলে। আবার জিজ্ঞাসা করল, যাবে?

সীতানাথও সেই একই জবাব দিলে: তুমি কী বল?

অহল্যা চুপ করে রইল। কিছুই বলতে পারলে না।

—না গেলে কি ভালো দেখাবে?

ভালো দেখাবে না তা অহল্যাও বোঝে। নিমন্ত্রণ যখন করেছে, তখন তার একটা উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই (যদিচ উদ্দেশ্যটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না)। বিনা উদ্দেশ্যে অংশুমান কোনো কাজ করে না।

ভোজসভায় বহু লোকের মধ্যেও সে খোঁজ নেবে, সীতানাথ এসেছে কি না। না এলে অহল্যাকেই সে দোষ দেবে। বলবে, সে-ই সীতানাথকে আসতে দেয় নি। নানা রকম প্রশ্ন করবে। রাগ-অভিমানও করবে। সে বড় সহজ ঝামেলা নয়। অহল্যাকে হিমসিম খাইয়ে ছাড়বে।

বললে, যাও।

তার পরেই হেসে বললে, আর তো কিছু নয়। বড়লোকের পার্টিতে যাওয়া শেষে বাতিকে না দাঁড়ায়!

সীতানাথও হাসলে: দেখা যাক, কিসে দাঁড়ায়!

কোর্টে প্রথম দিকেই তার একটা মামলা ছিল। মামলাটা বড় নয়, ছোট। সাক্ষী-সাবুদের সমারোহ ছিল না। তাদের জেরা শেষ করেই ওর ছুটি।

নিমন্ত্রণপত্র ওর পকেটে। কয়েক দিন আগে হলে সতীর্থদের সগৌরবে চিঠিখানা দেখাত। মুখে যে যাই বলুক, মনে মনে সবাই একটু ঈর্ষা করত। স্যর্ অংশুমানের পার্টিতে বাংলার বিশিষ্ট লোকেরাই মাত্র নিমন্ত্রিত হয়। সীতানাথ চৌধুরীও এখন থেকে সেই সমস্ত বিশিষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হল। অনেকের সঙ্গে পরিচয়ও হয়ে যেতে পারে।

এ তো সামান্য সৌভাগ্য নয়। ছোট আদালতের সাধারণ উকিলদের ঈর্ষা তো হতেই পারে।

কিন্তু আশ্চর্য, সীতানাথ কাউকে নিমন্ত্রণপত্র দেখাল না। তা নিয়ে

কারও সঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনা পর্যন্ত করলে না। করলে না মানে, নিজেকে সে সংযত করলে, বহু কষ্টে প্রলোভন সম্বরণ করলে তা নয়, আলোচনা করার ইচ্ছাই হল না।

বড়লোকের পার্টিতে যাওয়া তার বাতিক নয়। অংশুমান বড়লোক বটে, কিন্তু সে জন্যে তার পার্টিতে যাচ্ছে না সে। যাচ্ছে, আত্মীয় বলে, কুটুম্ব বলে, না গেলে ভালো দেখাবে না বলে।

মামলাটা শেষ হতে বারোটা বাজল। তার পরে কিছুক্ষণ বার-লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করল। তারপর সকলের অলক্ষিতে বেরিয়ে গেল।

॥ আট ॥

অহল্যার মাথায় সমস্ত সময় যেন আগুন জ্বলছে।

অংশুমান এ কী খেলা খেলছে সীতানাথকে নিয়ে? এতকাল পরে কেন এমন করছে? অহল্যাকে অপমান করবার জন্যে?

কিন্তু অহল্যা তার কাছে কী অপরাধ করেছে যার জন্যে তাকে অপমান করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল? অংশুমানের তো স্ত্রীলোকের অভাব নেই। কে জানে তাদের সঠিক সংখ্যা কত! কিন্তু সেই অসংখ্য স্ত্রীলোকের মধ্যে অহল্যা একজন মাত্র। অহল্যাকে অংশুমান ভুলে যাক। কিন্তু অপমান করে কেন?

অহল্যার মাথায় আগুন জ্বলছে।

কিন্তু অংশুমানের তুলনায় কতটুকু তার শক্তি! নিজের স্বামীকে তার অক্টোপাস থেকে বাঁচাবার ক্ষমতাও তার নেই।

মানুষের মনের মধ্যেকার লোভ হল অংশুমানদের মূলধন। তাই নিয়ে তারা ফাটকা খেলে। অর্থের এবং প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে নিজের সর্বস্ব এদের কাছে সমর্পণ করে মানুষ ফকির হয়ে মরে। অংশুমান নিজেও তাই করছে।

এমনি করে পৃথিবীময় এদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে। চারিদিকে সংক্রমিত হচ্ছে বিষবাষ্প—বাসুকীর বংশ। সবাই জানে, এরাই পৃথিবীকে ধারণ করে আছে সহস্র ফণায়। হয়তো আছে। কিন্তু এদের নিশ্বাসের বিষে পৃথিবী যে জ্বলে গেল, সে খবর বিষের নেশায় আচ্ছন্ন পৃথিবী রাখে কই?

সীতানাথের মনে লোভ জেগেছে। বিষের নেশা ধীরে ধীরে তাকে আবিষ্ট করছে। কে তাকে বাঁচাবে?

অথচ এমন সে ছিল না।

শান্ত, স্থির, স্থিতধী মানুষ। পরদুঃখকাতর, উদারহৃদয়। জীবনে উন্নতি করার আগ্রহ ছিল, কিন্তু লোভ ছিল না। আজ আইন-ব্যবসায়ে যেটুকু সাফল্য সে লাভ করছে তার প্রত্যেকটি ধাপ তার স্বোপার্জিত। কঠোর পরিশ্রম করেছে আইন বুঝতে, আইন জানতে, মক্কেলের অর্থব্যয় সার্থক

করতে। প্রথম জীবনে সিনিয়ারের কাছে এবং এখন নিজে-নিজে কী নিদারুণ পরিশ্রম সে করেছে এবং করছে।

ভোর পাঁচটায় উঠে স্নান করে নীচে নামে। একটু চা খেয়ে আরম্ভ হয় কাজ। আইনের বই ঘাঁটা, দলিল সাজানো, জেরা তৈরি—দম নেবার সময় পায় না। ভোর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত মক্কেল আর আইন আর সাক্ষ্য-প্রমাণ। জীবনে এ ছাড়া আর কোনো কাজ যেন তার নেই। যেন মামলা জেতাই তার জীবনের চরম চরিতার্থতা।

একটা দিনের কথা অহল্যার মনে পড়ে। এই তো মাস কয়েক আগের ঘটনা :

খাওয়াদাওয়া করে কোর্টে যাবার জন্য সীতানাথ নামছে, কয়েক ধাপ নামতেই তার ডান পা'টা কী করে যেন মচকে গেল। 'উঃ' বলে একটু-খানি থেমে মচকানো জায়গাটায় হাত বুলোল। কিন্তু কোর্টে একটা জটিল মামলা রয়েছে। শুধু কোর্টে নয়, জটিলতা জাল বুনে চলেছে তার মস্তিষ্কের মধ্যেও। সে চলতে লাগল।

অহল্যা উপর থেকে দেখছিল। জিজ্ঞাসা করলে, কী হল? পায়ে লাগল নাকি?

কিন্তু জবাব দেবে কে? সীতানাথ তখন মোটরে গিয়ে বসেছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একেবারে মক্কেল নিয়েই কোর্ট থেকে ফিরল। মামলাটা বোধ হয় সেদিন শেষ হয় নি। পরের দিনও জের চলবে। সে-পর্ব সেরে রাত বারোটায় যখন সে শুতে গেল, অহল্যা তখন গাঢ় ঘুমে অচেতন।

পরের দিন ভোরে যখন সীতানাথের ঘুম ভাঙল, অহল্যা তখনও সুখসুপ্ত। কিন্তু খাট থেকে নামতে গিয়ে সীতানাথ অবাক হয়ে দেখলে, তার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা!

তার বুঝতে বাকি রইল না রাত্রের মধ্যে ব্যাণ্ডেজটা কে বাঁধলে। গভীর পরিতৃপ্তিতে তার বুক ভরে উঠল। কিন্তু এই নিয়ে অহল্যার সঙ্গে দুটো যে পরিহাস করে সে ফুরসুতও পায় নি।

অহল্যাও পায় নি। চোরে-কামারে দেখাটাই কম হয়। যখন সীতানাথ জেগে তখন অহল্যা হয় ঘুমিয়ে, নয় বাড়িতে। আর যখন অহল্যা জেগে তখন সীতানাথ হয় ঘুমিয়ে, নয় নীচের ঘরে মক্কেল-পরিবৃত, নয়তো বা কোর্টে। দিনে খাবার সময় কিছুক্ষণের জন্যে দুজনে দেখা হয় তখন

সীতানাথ এমন ব্যস্ত, অন্যমনস্ক এবং উভয়েই এত স্বল্পভাষী যে কথাটাই কম হয়।

সেই সীতানাথের মনে আজ লোভ জেগেছে!

বড় হবার, অর্থোপার্জন করবার, প্রতিষ্ঠা পাবার আগ্রহ কোনো মানুষের পক্ষেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যেটাকে অহল্যা লোভ বলছে, সে হচ্ছে অংশুমানের গায়ে ঠেস দিয়ে বড় হবার চেষ্টা।

অংশুমানের সঙ্গে অহল্যার প্রকৃত সম্পর্ক, ধরে নেওয়া যাক, সীতানাথ জানে না। জেনেও চুপ করে যাওয়াটা ভদ্র স্বামীর পক্ষে অস্বাভাবিক নয় হয়তো। কিন্তু জানার পরও কোনো কিছুর লোভে সীতানাথ অংশুমানের ছায়া মাড়াতে পারে, এত ছোট সীতানাথকে অহল্যা কখনই ভাবতে পারে না।

তার ধারণা অংশুমানকে সীতানাথ অহল্যার রক্তসম্পর্কহীন পরমাত্মীয় বলে গ্রহণ করেছে। এবং এই ধারণা, যে-কোনো উদ্দেশ্যেই হোক, অংশুমানই সীতানাথের মনে সৃষ্টি করেছে।

অহল্যার মাথায় আগুন জ্বলছে সেই রহস্যাবৃত উদ্দেশ্যের হেতু অনুমান করতে গিয়ে। নানা সম্ভব-অসম্ভব অনুমান উঁকি দিচ্ছে তার মনের কোণে। আর দেহ-মন অজ্ঞাত আশঙ্কায় হিম-শীতল হয়ে যাচ্ছে।

অংশুমান সীতানাথকে কোন অতলস্পর্শী অন্ধকার গুহায় টেনে নিয়ে যাবে কে জানে! সে তো অংশুমানকে চেনে।

অথচ তার হাত থেকে স্বামীকে বাঁচাবার কতটুকু শক্তিই বা তার আছে!

এর কদিন পরেই অংশুমানের টেলিফোন এল। কদিন থেকে অহল্যা নিজেই তাকে টেলিফোন করার কথা ভাবছিল। অংশুমানের কাছে, কী জানি কেন, যেতেই আর তার ইচ্ছা করে না। ভেবেছিল, টেলিফোনেই ঝগড়াটা সারবে। কিন্তু কিছুদিন থেকে তার মনের মধ্যে যেন একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তন নামছে। বই পড়া থেকে আরম্ভ করে সংসারে কাজকর্ম কিছুই ভালো লাগছে না। কিছুতেই মন বসছে না, যেন কেমন একটা ঔদাসীন্যের ভাব। চরম অসহায়তার মধ্যে যে ঔদাসীন্য জাগে। কিছুই নয়। স্রোতের সঙ্গে নিশ্চেষ্টভাবে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া তার করবার কিছু নেই, এমন একটা ভাব। না ভালো লাগে ঝগড়া করতে, না ভাব করতে। কথা কইতেই যেন সে পরিশ্রম বোধ করে।

এই অবস্থায় অংশুমানের কাছ থেকেই টেলিফোন এল :

—অহল্যা ?

—বল।

—কী করছ ?

—চাকরি।

অংশুমান হো-হো করে হেসে উঠল : চাকরি! কার চাকরি ?

অহল্যা বললে, মনিব কি মানুষের একটা ভেবেছ ?

—আমি তো একটার কথাই জানি। সীতানাথের কথা।

—আর জান না ?

—না।

—তা হলে শোন : আমার ঝি বিনুর মা। তার স্বামী নিঃসন্তান, কবে মারা গেছে। কিন্তু তার বোনঝির একটি ছেলে হয়েছে। ফরমাস হয়েছে তার একটা সোয়েটার বুনে দেবার। তাই করছি। সুতরাং বলতে পার, এই মুহূর্তে আমার মনিব বিনুর মা।

বিনুর মায়ের সম্বন্ধে সার্ অংশুমানের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। বললে, শোনো, বলছিলাম কী, এখন তুমি ফ্রী আছ ?

—বললাম তো, কোনো সময়েই আমি ফ্রী নই।

অংশুমান হেসে বললে, তা তো বললে। কিন্তু ঝিয়ের মেয়ের সোয়েটার বোনা ছাড়া আর-কিছু কাজ হাতে আছে ?

—আছে বই কি। কেন বল তো ?

—নিউ এম্পায়ারে একটা ভালো নাচ আছে। যাবে ?

—না।

তারপর বললে, তোমার কাছে অনেক নাচ দেখেছি। আর কত দেখব ?

—সে আবার কী ?

অহল্যার ঠোঁটের কোণে একটা ক্রূর হাসি জাগল : তোমার পাল্লায় যে পড়ে সেই নাচে। এমনি কত নাচ তো দেখলাম। আর দেখতে পারি না। তাই বলছিলাম।

—ও !

অংশুমান চুপ করে রইল। কী যেন ভাবলে। তারপর বললে, তা হলে যাবে না ?

—কী করে যাই ?

আবারও একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অংশুমান জিজ্ঞাসা করলে, বেশ, তা হলে কবে তোমার সময় হবে বল ? আমি প্রতীক্ষা করব।

—সময় ?

—হ্যাঁ।

অহল্যা বললে, বলা মুশকিল। কারণ কী—

সে চুপ করলে।

অংশুমান উজিয়ে দিলে, কারণ কী বল।

অহল্যা বললে, কারণ আছে, আমাদের কাজ তো এন্‌গেজ্‌মেণ্ট প্যাডে নির্দিষ্ট থাকে না। আগে থাকতে বলা মুশকিল। তবে খুব শিগগির যাব একদিন।

অংশুমান সাগ্রহে বললে, আসবে ?

—যাব। তবে নাচ দেখতে নয়। নিজের কাজেই যাব।

বিস্মিতভাবে অংশুমান জিজ্ঞাসা করলে, কাজে! তুমি কী আরম্ভ করলে অহল্যা

—কেন ?

—কাজে, বিশেষ করে নিজের কাজে কোনোদিন তুমি আমার কাছে এসেছ বলে তো মনে পড়ে না। যখন কলেজে পড়তে তখনও কোনো প্রয়োজনে আমার কাছে আস নি। আমিই গিয়ে তোমার কলেজের মাইনে, বই কেনবার টাকা দিয়ে এসেছি। মনে পড়ে ?

—পড়ে। তখন দরকার হয় নি।

—এখন হয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—বেশ। তা হলে এখন থেকে প্রত্যেকটি সন্ধ্যা আমি অপেক্ষা করে থাকব। তোমার যেদিন খুশি এস।

অহল্যা হেসে উঠল : সার্‌ অংশুমান কি এখন ব্যবসা ছেড়ে কবিতা লিখছেন ?

—এর মধ্যে কবিতা পেলে কোথায় ?

অহল্যা বললে, সমস্তটাই কবিতা। যাই হোক, আমি নিজের কাজেই এর মধ্যে একদিন যাব। ভিক্ষের। ফেরাবে না তো ?

একা, কারাও বা দলে দলে বিদায় নিতে লাগল। শেষ অতিথি বিদায় নিতেই অংশুমান সিদ্ধিনাথের বাহু জড়িয়ে ধরল।

সিদ্ধিনাথ বললে, এবারে আমি যাই।

অংশুমান হেসে বললে, এত শিগগির ছাড়া পেতে চান? চলুন আমার ওখানে।

—আবার ওখানে? খুব আনন্দ তো হল।

—কিছুই হয় নি। নিতান্ত নিরিমিষ আনন্দ। আপনার জন্যে কিছু ভালো জিনিস সংগ্রহ করেছি। চলুন।

বাল্যকাল থেকেই সিদ্ধিনাথ যে অত্যন্ত মদ্যবিলাসী সে তত্ত্ব অংশুমান আগেই সংগ্রহ করেছে। এবং তাকে খুশি করবার জন্যে অনেক দামে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য মদ্য বহু কষ্টে যোগাড় করেছে।

উভয়ে অংশুমানের বাড়ি এসে দেখে মিসেস হিগিন্স আগে থেকেই তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। স্মিত হাস্যে সে ওদের অভ্যর্থনা জানালে যেন সেই গৃহস্বামিনী। অংশুমান সিদ্ধিনাথের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলে।

সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল।

ওরা বসতেই চাকর এসে টিপয় পেতে দিলে। সোডা এবং অন্যান্য জিনিস তার উপরে রেখে চলে গেল। মিসেস হিগিন্স পরিবেষণ করলে। এবং মদ্যের কল্যাণে দেখতে দেখতে ওদের তিনজনের আড্ডা রমণীয় হয়ে উঠল। হাস্য-পরিহাস এবং আড্ডা জমানোয় মিসেস হিগিন্সের তুলনা নেই।

আড্ডা যখন বেশ জমে উঠেছে তখন অকস্মাৎ পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। এ ব্যবস্থাও আগে থেকেই ছিল কি না কে জানে! কিন্তু ব্যস্তভাবে অংশুমান ও-ঘর থেকে ফিরে এল।

হাত জোড় করে বললে, কুমার বাহাদুর, মিনিট পোনরোর জন্যে আমাকে বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যেতে হচ্ছে। আমি যত শিগগির পারি ফিরব। আপনি কিন্তু উঠতে পাবেন না। মিসেস হিগিন্স, কুমার বাহাদুরকে আমি তোমার জিম্মায় রেখে গেলাম। অতিথেয়তার কোনো ত্রুটি হবে না আশা করি।

সিদ্ধিনাথ এবং মিসেস হিগিন্স উভয়ে একসঙ্গে কলকণ্ঠে কী যে বললে বোঝা গেল না। বোঝবার প্রয়োজনও অংশুমান বোধ করলে না। উভয়ের কাছে আর-এক প্রস্থ ক্ষমা চেয়ে সে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল।

পোনরো মিনিট নয়, আধ ঘণ্টাও নয়, অংশুমান যখন ফিরল তখন এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। কিন্তু সিদ্ধিনাথ এবং মিসেস হিগিন্স তখন সময়ের জগতের বাইরে। অংশুমানের প্রকাণ্ড বড় গাড়িখানা একটা হর্ন দিয়ে যে ফটকের মধ্যে ঢুকল, তাও ওরা টের পেল না।

অংশুমান যখন দরজার গোড়ায় দাঁড়াল তখন ওরা একটি সোফায় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে বসে। মিসেস হিগিন্সের একখানি হাত সিদ্ধিনাথের কোলের উপর সিদ্ধিনাথের ডান হাতের মুঠোর মধ্যে। আর সিদ্ধিনাথের বাঁ হাতখানি মিসেস হিগিন্সের কণ্ঠ বেষ্টন করে।

অংশুমানকে দেখে ওর বাঁ হাতখানি শিথিল হয়ে গেল। মেষশাবকের মতো মূঢ় দৃষ্টিতে সিদ্ধিনাথ অংশুমানের দিকে পিট পিট করে চাইতে লাগল। কিন্তু মিসেস হিগিন্সের চোখের শয়তানী দৃষ্টি বিজয়গর্বে ছোরার মতো ঝকমক করছে।

সীতানাথ পার্টিটা যত বড় ভেবেছিল, তত বড় কিন্তু নয়। কুড়ি-পঁচিশজনের একটা পার্টি। কয়েকজন সাহেব এবং কয়েকজন ব্যবসায়ী। সকলের সঙ্গে অংশুমানের ব্যবসায়গত সম্পর্ক এবং এর উদ্দেশ্যও সম্ভবত ব্যবসায়গত।

সার্ অংশুমান হোটেলের দ্বারসন্নিকটে দাঁড়িয়ে ছিল নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনার জন্যে। সীতানাথকে অত্যন্ত সমাদরে অভ্যর্থনা জানালে।

—ভেবেছিলাম, আপনি হয়তো আসতে পারবেন না।

—না, না। আপনার নিমন্ত্রণ কি উপেক্ষা করা যায়?

—না, উপেক্ষার কথা ভাবি নি। জমাট পসার, হয়তো সময় পাবেন না।

সীতানাথও স্বীকার করলে, মামলা থাকলে অসুবিধা হত নিশ্চয়ই। সৌভাগ্যক্রমে তেমন কিছু ছিল না।

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে অংশুমান সীতানাথের পরিচয় করিয়ে দিলে। তার মধ্যে সেই বড় সাহেবটি একজন, যাঁর অফিসে সীতানাথের বন্ধুর ছেলেটির চাকরি হয়েছে।

দু-চারটে মামুলী কথার পর সাহেব কাজের কথা পাড়লেন।

তাঁর ফার্মের জন্যে একজন বাঁধা উকিল দরকার। সার্ অংশুমানকে সে-

কথা বলতে তিনি সীতানাথের নাম সুপারিশ করেছেন। ভালোই হল, এখানে দেখা হয়ে গেল।

বড় সাহেব ওর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইলেন।

সীতানাথ এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। পার্টি না পার্টি, লাঞ্চের নিমন্ত্রণ না নিমন্ত্রণ। সেখানে এ-রকম একটা অর্থকরী প্রস্তাব আসতে পারে, এ সে কল্পনা ও করে নি। জবাব দিতে তার দেরি হতে লাগল।

এ বিষয়েও সাহেব তাকে সাহায্য করলেন।

বললেন, আমি এখনই জবাব চাইছি না। দু-এক দিনের মধ্যে আমাকে জানাবেন। তখন অবশিষ্ট কথা হতে পারবে।

সীতানাথ বেঁচে গেল। বললে, সেই ভালো। এখনই কথা দেওয়া আমার আমার পক্ষে মুশকিল। তা ছাড়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করবারও অনেক কিছু আছে তো।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমাকে টেলিফোনে জানালেই তার জন্যে একটা সময় ঠিক করা যাবে।

—সেই ভালো। ধন্যবাদ।

—কথা হল?

—হল। কিন্তু আমি তো হঠাৎ—

—না, হঠাৎ রাজী হতে যাবেন কেন? ভেবে দেখুন। অহল্যার সঙ্গে একটা পরামর্শেরও দরকার হতে পারে—

বাধা দিয়ে সীতানাথ বললে, না। তার সঙ্গে পরামর্শের কিছু নেই। তবে ওঁদের শর্তাবলী জানা দরকার হবে।

অংশুমান তাড়াতাড়ি বললে, খুব সুবিধাজনক শর্ত। ওসব ছোট কোম্পানি তো নয়। সব বিষয়েই ওদের শর্ত খুব লোভনীয়ই হয়। ওদের সঙ্গে অনেক দিন ধরে তো কারবার করছি। তার পদ্ধতিই আলাদা।

শুনে সীতানাথের লোভ হল।

জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কী বলেন?

অংশুমান হেসে বললে, আমার সম্মতি না থাকলে আমি আপনার নাম সুপারিশ করতে যাবই বা কেন? তবে কী জানেন—

একটু ভেবে বললে, আপনার সুবিধা-অসুবিধার কথা আপনি যেমন

বুঝবেন, তেমন তো আর-কেউ বুঝবে না। সুতরাং সমস্ত দিক ভেবে, ভালো-মন্দ বিচার করে আপনাকেই সিদ্ধান্ত করতে হবে। তবে যদি—

আবার একটু ভেবে বললে, কোথাও কোনো বিশেষ শর্তে যদি আপনার অসুবিধা থাকে, আমাকে না জিজ্ঞেস করে 'না' বলে বসবেন না। আমি আপনার নাম সুপারিশ করেছি। সুতরাং আমারও কিছু দায়িত্ব আছে তো।

সীতানাথের করমর্দন করে হাসতে হাসতে অংশুমান চলে গেল। আর ফেরবার পথে গাড়িতেই সীতানাথ স্থির করে ফেললে, এটা সে গ্রহণ করবে।

হাসতে হাসতে অহল্যাকে বললে, একটা সুখবর আছে।

—কী আবার সুখবর? পার্টিতে যাও নি?

—গিয়েছিলাম। সেখানে একটা মস্তবড় ইংরেজ কোম্পানির বড় সাহেবের সঙ্গে আলাপ হল। কোন্ কোম্পানি জান, যেখানে তোমার দাদার সুপারিশে আমার বন্ধুর ছেলেটির চাকরি হয়েছে।

এর পরেও অহল্যাকে খুব উৎসাহিত বোধ হল না।

সে শুধু বললে, তার পরে?

—তাঁর পাশেই আমি বসে ছিলাম।

অহল্যা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বললে, কোথায় কার পাশে বসে ছিলে তা জানবার জন্যে আমার কোনো আগ্রহ নেই। ওসব পরে বলবে। আগে বল, তোমার সুসংবাদটা কী?

—তাই তো বলছি গো। একথা-সেকথার পর সাহেব আমাকে বললেন, তাঁর কোম্পানির জন্যে আমাদের কোর্টে তাঁদের একজন বাঁধা উকিল চাই।

সীতানাথ কোটটা খুলে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখল।

আর অহল্যা সমস্ত আগ্রহ-উৎকণ্ঠা দুই চোখে টেনে এনে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

টাই-টা খুলতে খুলতে সীতানাথ বললে, সাহেব বললেন, সার্ অংশুমান সেজন্যে আমার নাম সুপারিশ করেছেন। আমি রাজী থাকলে, তাঁর সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট দিনে অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারবে।

সার্ অংশুমান সুপারিশ করেছেন!

অহল্যার জিভ দিয়ে দুটি শব্দ যেন কোনো রকমে গড়িয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে এল: তুমি নেবে?

—নেব না? মাস গেলে একটা নির্দিষ্ট টাকা আসবে, মামলা থাক্ আর না-থাক্। কী যে বল!

সীতানাথ বাথরুমে চলে গেল।

আর অহল্যা কাঠের মতো শক্ত হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। তার দুই চোখ জ্বালা করতে লাগল। মাস গেলে একটা নির্দিষ্ট অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনাতেও তা শীতল হল না। তার মনের মধ্যে একটি মাত্র প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হতে লাগল: অংশুমান কী চায়? কী চায় অংশুমান?

॥ নয় ॥

বড় সাহেবের প্রস্তাবটা সীতানাথ গ্রহণ করলে। ওঁরা ভালো শর্তই দিলেন। অংশুমানের কাছে জানাবার কিছু রইল না। শুধু একদিন টেলিফোনে জানিয়ে দিলে তার সম্মত হওয়ার কথাটা।

অংশুমান খুব খুশি হল।

বললে, আপনি জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন?

—কেন বলুন তো?

—কোষ্ঠী থাকলে একবার দেখাবেন। মনে হচ্ছে, একটা খুব ভালো সময় আসছে।

—কী রকম?

—আমাদের একটা মামলাও আপনার কাছে যাচ্ছে। মামলাটা খুব জটিল। একজন বড় ব্যারিস্টারও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তদ্বিরের সমস্ত ভারই আপনার ওপর থাকবে। রাজী তো?

আনন্দে গদগদ হয়ে সীতানাথ বললে, এই তো আমার পেশা। রাজী না হবার কী আছে?

—ঠিক আছে। অফিসের চিঠি দু-একদিনের মধ্যেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তারপর আমাদের ল' অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করে যা করা দরকার করবেন। কেমন?

সীতানাথ এ-কথাটাও অহল্যাকে জানালে।

অহল্যা শুনলে মাত্র।

সীতানাথ জিজ্ঞাসা করলে, তুমি খুব খুশি হয়েছ বলে মনে হচ্ছে না তো?

অহল্যা বললে, এতে আমার খুশি-অখুশির কী রয়েছে বল। আমি এসবের কী বুঝি?

—এটা তো বোঝ যে, অর্থাগমের একটা মোটা পথ খুলে গেল?

—তা বুঝি। হয়তো তারও চেয়ে একটু বেশি বুঝি।

—বেশিটা কী?

—অর্থমনর্থম্।—অহল্যা হাসলে।

—এর মধ্যে অনর্থের কী আছে? মোটা ফীয়ে কেস পাচ্ছি, করব।

—অনর্থ তার মধ্যে তো নয়।

—তবে?

—অনর্থ অর্থের মধ্যে।

সীতানাথ বসল। বললে, ভয় দেখাচ্ছ কেন? তুমি কি চাও না আমি এ মামলা নিই?

অহল্যা হেসে ফেললে: ভয় আবার কখন দেখালাম!

—ওই যে অনর্থের কথা বলছ?

—সেটা তোমাকে ভয় দেখাবার জন্যে নয়। আমি নিজেই ভয় পেয়ে গেছি তাই।

—কেন ভয় পাচ্ছ?

—আমার বাবার একজন সন্ন্যাসী গুরুদেব ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, ভৃত্য হিসাবে টাকা খুব উপকারী, কিন্তু মনিব হিসাবে খুবই ভয়ঙ্কর। কদিন থেকে সেই কথাটা প্রায়ই মনে পড়ছে, আর ভয় পাচ্ছি।

—আমার জন্যে ভয় পাচ্ছ?

অহল্যা একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলে: তুমি আর আমি কি ভিন্ন?

সীতানাথ একেবারে বিগলিত হয়ে গেল। অহল্যা বরাবর কেমন একটা দূরত্ব রক্ষা করে চলে। এই দূরত্বটা যেন ওর প্রকৃতির মধ্যে নিহিত। কাছেই সর্বসময় থাকে। অথচ যেন অনেক দূরে। সেই দূরত্ব ওর আশ্চর্য হাসির সঙ্গে মিশে এই একটি কথায় যেন মুছে গেল।

পরম আদরের সঙ্গে ওর একটি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে সীতানাথ বললে, তুমি যদি বল এ প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করব।

—আমি তা তো বলি নি।

—বল নি, কিন্তু ভয় পাচ্ছ। আমি তোমাকে বলব, আমার জন্যে পেয়ো না।

অহল্যা চুপ করে রইল।

সীতানাথ আবারও বলতে লাগল: দেখ, যেদিন থেকে আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেছি, সেদিন থেকে এই একটি বস্তুরই সাধনা করেছি—সে অর্থের। নাম বল, প্রতিষ্ঠা বল, সকলের সঙ্গেই জড়ানো রয়েছে, এই একটি জিনিস, অর্থ। সংসারে থেকে তুমি তাকে উপেক্ষা করতে পার না।

অহল্যা চুপ করেই রইল।

সীতানাথ আবারও বলতে লাগল: কী দুঃখ যে প্রথম জীবনে পেতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। তুমি তখনও আস নি। নাকে-মুখে দুটো গুঁজে কোর্টে ছুটেছি। কতদিন পয়সার অভাবে হেঁটেই যেতে হয়েছে। টিফিনের পয়সা জোটে নি। দু আঁজলা জল খেয়ে পেটের জ্বালা মিটিয়েছি। সে সব দিনের কথা ভাবতে গেলেও শিউরে উঠি।

—তার পরে বাড়ি করেছ, গাড়ি করেছ।

—তার অনেক পরে।

—হ্যাঁ। কিন্তু তৃষ্ণা তবু মিটল না।

অহল্যা হাসলে।

সীতানাথ বললে, তৃষ্ণা! কিসের তৃষ্ণা?

অহল্যা উঠে দাঁড়াল। বললে, আপাতত চায়ের তৃষ্ণা। দাঁড়াও ঠাকুরকে বলে আসি।

অহল্যা চলে গেল।

কিন্তু অহল্যা একদিন অংশুমানকে ধরলে:

—হঠাৎ ওঁর পেছনে লাগলে কেন?

অংশুমান যেন আকাশ থেকে পড়ল: ওঁর! কার? সীতানাথবাবুর?

—হ্যাঁ।

—পেছনে লাগলাম?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—অবাক করলে তুমি! পেছনে লাগলাম? নানা সূত্রে ওঁকে কত টাকা পাইয়ে দিচ্ছি জান না?

—জানি। সেইটেকেই আমি পেছনে-লাগা বলছি। বেশ তো আছেন ভদ্রলোক। ছোট একখানা বাড়ি আছে, একখানা গাড়িও আছে। সংসার চলে যাচ্ছে মোটের উপর ভালোই। হঠাৎ তাঁকে বড়লোক বানাবার শখ হল কেন?

অহল্যার প্রত্যেকটি বাক্যের পিছনে যে হুল আছে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অংশুমান বললে, ভদ্রলোককে সত্যিই আমার ভালো লেগেছে। ওঁর জন্যে কিছু করে আমি ধন্য হতে চাই।

—রক্ষে কর।—অহল্যা উচ্চহাস্যে বলে উঠল,—তোমার ভালো লেগেও কাজ নেই, ধন্য হয়েও কাজ নেই। বেচারাকে রেহাই দাও। ও নিতান্ত হরিণশিশু, তোমার তীরের যোগ্য নয়।

একখানা বজ্রভরা কালো মেঘ অংশুমানের মুখের উপর চকিতের জন্যে খেলে গেল। তারপরেই আকাশ পরিষ্কার।

নির্মল হাস্যে অংশুমান বললে, তোমার বিদ্রূপও অত্যন্ত ক্ষুরধার। আমিই কি তার যোগ্য?

অহল্যা খিল খিল করে হেসে উঠল: এটা কী হল সার্ অংশুমান?

—প্রশংসাপত্র। তোমার রূপে আমি মুগ্ধ, কিন্তু তোমার বুদ্ধি আমাকে অভিভূত করে। তোমার ওপর মাঝে মাঝে আমার হিংসা হয়। ওই তীক্ষ্ণতা যদি আমি পেতাম!

কুটিল মৃদু হাস্যে অহল্যা বললে, ইংরিজীতে একে কী বলে জান? লেগ পুলিং।

সজোরে মাথা নেড়ে অংশুমান বললে, না। এটা তা নয়। বিশ্বাস কর। তোমাকে আমি হিংসা করি। কিন্তু তখনই মনকে প্রবোধ দিই, ক্ষুরের ধার দিয়ে তো আমার দৈনন্দিন মোটা কাজ চলবে না। আমার দরকার তলোয়ারের ধার। সেটা বোধ হয় আমি পেয়েছি।

অহল্যা বলতে গেল, ঠাট্টা নয়। শোন—

বাধা দিয়ে অংশুমান বললে, ঠাট্টা নয়। শোন, কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমি তোমার কথা ভেবেছি।

—আশ্চর্য!

—আশ্চর্য কিছুই নয়। তোমার কথা আমি প্রায়ই ভাবি। কাল অনেক রাত্রি অবধি ভেবেছি।

—কী ভেবেছ?

—বহুদিন তোমাকে কিছুই দেওয়া হয় নি। সম্ভবত তোমাকে কিছু দেওয়া যেতে পারে এটাই আমার মনে হয় নি।

—কেন মনে হয় নি?

—তাও জানি না। বোধ হয় তোমারই জন্যে।

—আমার জন্যে!

—হ্যাঁ। আমার জীবনে কিছু লোক পেয়েছি, যাদের দেওয়া যায় না। দিতে গেলে হাত কাঁপে।

—তোমারও হাত কাঁপে?

—আমারও হাত কাঁপে। তুমি একজন, যাকে অদেয় আমার কিছুই নেই অথচ দিতে বাধে। কিন্তু জীবন-মরণের কথা তো বলা যায় না। আমি এখনই কিছু দিয়ে যেতে চাই। ধর, আলমোড়ার বাড়িটা।

অহল্যা খিল খিল করে হেসে উঠল: আলমোড়ার বাড়ি নিয়ে আমি কী করব?

—তা হলে অন্য কিছু বল।

—তোমার কাছে আমার কোনো প্রার্থনা নেই।

—প্রার্থনা! আমি কি তাই বললাম?

—না বললেও অর্থ তাইই বোঝায়।

এবার অংশুমান রেগে গেল সত্য সত্যই। বললে, না, তা বোঝায় না। তোমার কী হয়েছে অহল্যা যে, সমস্ত কথার তুমি উল্‌টো অর্থ করছ? আমার কাছ থেকে কিছু নাও—আমার কাছ থেকে কিছু নাও। আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি।

ওর ক্রুদ্ধ মুখ এবং কাতর দৃষ্টির দিকে অপলক কিছুক্ষণ চেয়ে রইল অহল্যা।

দুর্বলতা।

অহল্যার হঠাৎ সন্দেহ হল, সে দুর্বল হয়ে আসছে বুঝি। কিন্তু সামলে নিতে দেরি হল না।

শান্ত কোমল কণ্ঠে বললে, আর একদিন নোব।

—ঠিক! ভুলে যাবে না?

—না।

সেদিন অহল্যা বাড়ি ফিরল বেশ একটু রাত্রে।

কোর্টে সীতানাথের মর্যাদা গেছে বেড়ে। একটা বিখ্যাত বিলিতী কোম্পানির বাঁধা উকিল। মামলা তাদের একটা না একটা রয়েছেই। তার উপর অংশুমানের কোম্পানির যে জটিল মামলা, সে তো একটা সমারোহের ব্যাপার। খবরের কাগজের কলাও করে তার বিবরণ বেরচ্ছে।

আর সেই বিবরণের শেষের দিকে বড় বড় উকিল-ব্যারিস্টারের সঙ্গে তারও নাম।

এতদিন যারা ছিল তার বন্ধু, অন্তরে তারা আর বন্ধু রইল না। ঈর্ষায় জ্বলে যেতে লাগল। বিশেষ করে আরও জ্বলে যেত এইজন্যে যে, সীতানাথের এ সমস্ত দিকে লক্ষ্য করবারই সময় নেই। সকল সময়েই সে ব্যস্ত। তার নিশ্বাস নেবার ফুরসুত নেই।

সিঁড়িতে উঠতে নামতে হয়তো কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে, কী হে! ছুটছ যে!

—এই যে!

সীতানাথ এর বেশী আর কথা বলবার সময় পেলে না: অমুকে কেস ধরেছে, ছুটছি তাই।

বার-লাইব্রেরিতে যে সময়টা বসে থাকে, সেও প্রায় একই অবস্থা। নথি পড়ছে আর নোট করছে। লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে কচিৎ কখনও দু-একটা রসিকতায় যোগও দিচ্ছে হয়তো। কিন্তু সে নিতান্তই কচিৎ কখনও।

বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে পরিহাস করে:

—ভাগ্য বলতে হবে, বুঝেছ!

—লাল হয়ে গেল একেবারে। নিঃশেষ নেওয়ার ফুরসুত নেই

—একেই বলে 'স্ত্রীভাগ্যে ধন'।

—আজকাল বাড়ি থেকে খেয়ে আসে না, জান?

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। গ্রেট ঈস্টার্নে লাঞ্চ খায়। লক্ষ্য কর নি?

—না না, সেটা অন্য কারণে।

—খায় না বলছ?

—খায়। কিন্তু অন্য কারণে।

—কী কারণে শুনি?

—মুরুব্বীর সঙ্গে ওইখানে দেখা হয়। মামলা সম্বন্ধে কী হচ্ছে না হচ্ছে খবর দেয়।

—তাই বুঝি? তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে না কি?

—হ্যাঁ।

—তা যে যাই বল, লোকটা ভাগ্যবান বটে তো সেদিন

ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরত। তারপরে বাড়ি করলে, গাড়ি করলে। আর এখন তো কথাই নেই।

—গোঁসাই, অমনি একটা বউ আমাকে যোগাড় করে দিতে পার?

—পেলে, তোমার জন্যে যোগাড় করব কেন ভাই? নিজেই লুফে নোব।

—যা বলেছ। দোষটাই বা কী? শাস্ত্রেই বলেছে, 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'।

—দেখেছ কোনোদিন ওর বউকে?

কেউ দেখে নি অহল্যাকে। বার-লাইব্রেরিতেই পরস্পর দেখা যাদের হয়, তাদের বাড়ি গিয়ে দেখা করার প্রয়োজন হয় না। সীতানাথের বাড়ি কেউ কোনোদিন যায় নি। যাবার কোনো উপলক্ষ্যও ঘটে নি। সুতরাং কেউ বলতে পারলে না, অহল্যা দেখতে কেমন।

একজন বুদ্ধি খরচ করে বললে, শুনেছি নাকি দেখতে অপূর্ব সুন্দরী!

সকলেই সেটা মেনে নিলে। কেননা অপূর্ব সুন্দরী না হলে স্যার অংশুমানের মতো লোককে বাঁধতে পারে? অংশুমান তো একটা সাধারণ লোক নয়। ধনকুবের।

এই রকম রসালো গল্প বার-লাইব্রেরিতে প্রায় প্রত্যহই হয়। কিন্তু যাকে নিয়ে হয় সে এ সবের অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। এ সমস্ত কথা তার কানেই যায় না।

সীতানাথ এখন উঠছে—ধাপে ধাপে নয়, লাফ দিয়ে দিয়ে। এখন সে ওঠার নেশায় মশগুল। বন্ধুবান্ধব তো তুচ্ছ, অহল্যার সঙ্গেই ভাল করে দেখা হয় না। ব্যারিস্টারের বাড়ি পরামর্শ সেরে যখন সে বাড়ি ফেরে, অহল্যা তখন নিদ্রামগ্ন। যখন সে প্রত্যূষে ওঠে, তখন অহল্যার ঘুম ভাঙে না। আগে কোর্টে যাবার সময় খাবার-টেবিলে কিছুক্ষণ দেখা হত। এখন তাও হয় না। নীচে থেকেই সীতানাথ কোর্ট চলে যায়।

॥ দশ ॥

রবিবার সকালেই অংশুমান টেলিফোন করলে সীতানাথকে : সন্ধ্যের পর কাজ আছে কিছু ? আসুন না একবার।

সীতানাথ ব্যস্ত হয়ে উঠল : কী ব্যাপার ! মামলাটা সম্বন্ধে কিছু ?

অর্থাৎ মামলা সম্বন্ধে হলে কাগজপত্রগুলো সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

অংশুমান হেসেই অস্থির : মামলা সম্বন্ধে আমি কী বুঝি ? সে ভার তো আপনার ওপর। এমনি একটু চায়ের টেবিলে বসে গল্প করবার জন্যে ডাকছিলাম। অবশ্য যদি ব্যস্ত থাকেন—

ব্যস্ততা আবার কী ! সীতানাথের ব্যস্ততা তো অংশুমানদের মামলা নিয়ে। সেই অংশুমানই যদি ডাকে, তা হলে আর ব্যস্ততা কী ?

সীতানাথ শশব্যস্তে বললে, না। ব্যস্ত আর কী ! নিশ্চয় যাব। কখন বলুন ?

—যখন আপনার সুবিধা। ধরুন সাতটা-সাড়ে সাতটা।

—ঠিক আছে।

নির্দিষ্ট সময়ে সীতানাথ উপস্থিত হল। বাইরের দিকের চওড়া বারান্দায় সার্ অংশুমান বসে। আরও কে একটি মেয়ে যেন রয়েছে। সীতানাথ দ্বিধা করছিল।

—আসুন, আসুন সীতানাথবাবু। বসুন। আপনারই অপেক্ষা করছিলাম।

বলেই অংশুমান বললে, আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই : মিঃ সীতানাথ চৌধুরী—অ্যাডভোকেট, আর ইনি মিস স্বপ্না হালদার—আমাদের মিলের ক্যান্টিন-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

সীতানাথ জিজ্ঞাসা করলে, আপনাদের মিলে ক্যান্টিন আছে বুঝি ?

—আছে।—সগর্বে অংশুমান বললে,—কোনো মিলে পাবেন না। যেখানে আছে, সেও এত নোংরা যে দাঁড়াতে ঘেন্না করবে। আর আমাদের ক্যান্টিনে যদি কোনোদিন যান, দেখবেন ঘরের মেঝে থেকে টেবিল-চেয়ার,

যায় কাপ ডিশ পর্যন্ত সমস্ত ঝকঝক করছে। নোংরা কোথাও পাবেন না। ভালো খাবার এবং তেমনি সস্তা।

স্বপ্না বললে, একদিন আসুন না বেড়াতে।

—যাব একদিন। নিশ্চয়ই যাব।

গল্প করতে অংশুমানের জুড়ি নেই, স্বপ্নাও চমৎকার বলে। অল্পক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, সীতানাথও বেশ গল্প করতে পারে। চা-পানের পর আসর যখন ভাঙল তখন সাড়ে নটা।

সীতানাথ উঠল। বললে, খুব আনন্দ পেলাম। এইবার উঠি।

—উঠবেন?—অংশুমান জিজ্ঞাসা করলে,—তা হলে একটা কাজ করুন না। পথেই পড়বে। মিস হালদারকেও নামিয়ে দিয়ে যান না।

ব্যস্তভাবে সীতানাথ বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়। খুব আনন্দের সঙ্গে।

স্বপ্নার ফ্ল্যাটের দোরগোড়ায় তাকে নামিয়ে দিলে।

স্বপ্না বললে, একবার নামবেন না? একটু চা খেয়ে যেতেন।

হাতজোড় করে সীতানাথ বললে, এত রাত্রে? এই তো চা খেয়ে এলাম। আর-একদিন এসে খাব বরং।

—সে কি মনে থাকবে?

—নিশ্চয় মনে থাকবে। বাড়ি চেনা রইল। অসুবিধা কিছু রইল না তো।

—ঠিক? কথা দিয়ে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। কথা দিয়ে যাচ্ছি।

স্বপ্না হেসে বললে, ওসব কথার কোনো মূল্য নেই। একটা কাজ করুন বরং।

—বলুন। আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আমি সমস্ত-কিছু করতে প্রস্তুত।

—বেশ। তা হলে সামনের রবিবার বিকেলে আমার এখানে চায়ের নিমন্ত্রণ রইল। আসবেন?

—নিশ্চয় আসব।

—তা হলে আমার সামনে ডায়েরিতে লিখে নিন। নইলে ভুলে যাবেন।

পকেট থেকে ডায়েরি বের করে তাতে টুকে নিয়ে তবে সীতানাথ ছাড় পেল। মেয়েটি ভারি মিশুকে। এমন মিষ্টি কথা বলে!

তারপরের রবিবারে সীতানাথকে আসতে হল। কে যেন তাকে ঘাড়ে ধরে নিয়ে এল।

জীবনে মহিলা বন্ধুর সাহচর্য কখনও সীতানাথ পায় নি। এর আশ্চর্য মোহ তাকে অভিভূত করে ফেলল। বস্তুত এই সপ্তাহটা যেন সে একটি একটি দিন গুনে রবিবারে এসে পৌছল।

সেই স্বপ্না!

কয়েক বৎসর আগে লটি দত্ত তাকে নিয়ে এসেছিল অংশুমানের কাছে। রোগা ছিপছিপে এক ফোঁটা ভীরু মেয়ে। অপরের সংসারে মানুষ হয়েছে। এসেছিল জীবিকার্জনের চেষ্টায়। বড় হবার অদম্য ইচ্ছা ছাড়া আর কোনো সম্বলই ছিল না।

কিন্তু অংশুমানের কাছে যে কথা সে দিয়েছিল তা রেখেছে। একে একে আই-এ এবং বি-এ পাস করেছে। অংশুমান তার বুদ্ধিমত্তা এবং কর্মিষ্ঠতা দেখে বন্ধুর অফিস থেকে তাকে নিজের মিলে নিয়ে এসেছে। এখন মোটা মাইনেয় সেখানকার ক্যান্টিন-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। এখন তার মুখে-চোখে কথা। চাল-চলনই অন্য রকম।

সিদ্ধিনাথকে অংশুমান এর জিম্মাতেও ছেড়ে দিতে পারত। কিন্তু নানা দিক ভেবে শেষ পর্যন্ত সাহস করে নি। প্রথমত, নিজের মিলের তরুণী কর্মচারিণীর সঙ্গে অন্তত অফিসের সময় যে দূরত্ব রেখে চলা দরকার, সিদ্ধিনাথের মতো আনাড়ী লোকের পক্ষে সেই দূরত্ব রক্ষা করে চলা সম্ভব নাও হতে পারে ভেবে মিসেস হিগিন্সের মতো সুদক্ষ নাবিকের হাতে তার নৌকা চালানোর ভার দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, স্বপ্নার নিজেরও বয়স অল্প। হৃদয়বৃত্তি এখনও প্রবল। কোনো নৌকা তার হাতে পড়লে বানচাল হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক। কিন্তু মিলটার কল্যাণের জন্যে সিদ্ধিনাথকে এখন ভাসিয়ে রাখা দরকার। সুতরাং স্বপ্নার উপর পড়েছে সীতানাথের ফুটো নৌকার ভার। বানচাল হয় তো হোক।

হাস্য-পরিহাস এবং গল্পগুজবে কখন যে নটা বেজে গেল সীতানাথের খেয়ালই রইল না। স্বপ্নাই খেয়াল করিয়ে দিলে।

অনিচ্ছার সঙ্গে উঠতে উঠতে সীতানাথ বললে, এইবার আমার পালা।

—কিসের?

—এইবার আমি ডিনারের নিমন্ত্রণ করব, 'না' বলতে পারবেন না।

হেসে স্বপ্না বললে, 'না' বলব কেন? কবে, কোথায় বলুন?

—যে কোনো একটা হোটেলে।

—বেশ। কবে বলুন?

—যেদিন আপনার সুবিধা। ধরুন, শনিবারে।

—শনিবারে কেন, রবিবারই ভালো।

—রবিবারে আমার একটু ঝামেলা আছে।

পরিহাস করে স্বপ্না বললে, স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমা যেতে হবে?

—না না। স্ত্রীও নয়, সিনেমাও নয়। ব্যারিস্টারের বাড়ি কন্‌সাল-টেশন আছে।

স্বপ্না ভুরু কুচকে একটু চিন্তা করে বললে, শনিবারে হলে আমাকে যে অনেক অসুবিধা পোয়াতে হবে। আচ্ছা, থাক্। সে আমি কোনো রকমে ম্যানেজ করে নোব।

—কী দরকার কোনো রকমে ম্যানেজ করে? বলুন না অসুবিধাটা কী?

একটু ইতস্তত করে স্বপ্না বললে, মিল থেকে আসার সমস্যাটার কথা ভাবছি।

—কী সমস্যা? ছুটি নেই?

—ছুটি তিনটেয়। আমার বেরুতে চারটে হয়। তারপর অতদূর থেকে আসা। এক যদি—

সীতানাথ চট করে বললে, যদি আমি গাড়ি নিয়ে গিয়ে নিয়ে আসি?

চোখের একটা বিলোল ভঙ্গি করে স্বপ্না বললে, সেই কষ্টটা আপনাকে দেওয়া ঠিক হবে কি না ভাবছিলাম।

—খুব ঠিক হবে। সেজন্য আপনি কুণ্ঠিত হবেন না।

—আপনার অনুগ্রহ।

কিন্তু সীতানাথ তা কানেই তুললে না। বললে, কতটুকুই বা রাস্তা? আমার কোর্ট থেকে ফিরতে বড় জোর তিনটে। তারপর স্নান করে বেরুতে ধরুন চারটে। সাড়ে চারটে নাগাদ আপনাদের মিলে পৌঁছে যাব। আপনাকে আধ ঘণ্টাটাক অপেক্ষা করতে হবে।

মুচকি হেসে স্বপ্না বললে, সেইটেই সবচেয়ে চমৎকার লাগবে।

—চমৎকার লাগবে, না, বিশ্রী লাগবে?

—চমৎকার লাগবে। কারও জন্যে প্রতীক্ষা করতে এত অদ্ভুত লাগে

আমার! তিনটে বেজে যাবে। ক্যান্টিন ধীরে ধীরে খালি হবে। জিনিস-পত্র ধোয়া-মোছা গোছ-গাছ করিয়ে তুলে রাখতে হবে। চেয়ার টেবিল ঘরের মেঝে পরিষ্কার করানো হবে। আমি ঘড়ি দেখব, চারটে বাজতে দশ। আপনার আসতে এখনও চল্লিশ মিনিট। আজে-বাজে কাজে আরও খানিকটা দেরি করব। এখনও পঁচিশ মিনিট। আমার কেরানী এসে দাঁড়াবে কাঁধে ছাতা ঝুলিয়ে। ভদ্রলোক এইবার যাবেন। অন্য দিন তখনই বলি, আসুন। সেদিন কিন্তু আর-একটু দেরি করাব।

জিজ্ঞেস করব, ক্যাশ মিলেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এটা-ওটা আরও পাঁচটা কথা জিজ্ঞেস করব। দশ মিনিট। আপনার আসতে এখনও পনেরো মিনিট দেরি। তখন দারোয়ানকে ডাকব।

—বাগানের গাছগুলোয় মালী জল-টল দেয় ঠিক?

—হ্যাঁ মেমসাব।

—গোলাপগাছগুলো কী রকম শুকিয়ে যাচ্ছে যেন। ডালিয়াটা দেখ, জোর নেই তেমন। বলে দেবে ওকে।

দারোয়ান অবাক হয়ে গোলাপগাছগুলোর দিকে তাকাবে। কোন্‌টা শুকিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারবে না। বুঝতে পারবে না কোন্ ডালিয়ার কথা বলছি।

তবু ঘাড় নেড়ে বলবে, বোল দেগা মালীকো।

এখনও সাত মিনিট।

Is n't that romantic? আমার অপেক্ষা করতে খুব অদ্ভুত লাগে।

ওর স্বপ্নভরা চোখ রহস্যে ঝলমল করে উঠল।

সে শনিবার স্বপ্না কিন্তু দারোয়ানের সঙ্গে বাগান সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় পেল না। কেরানীটি চলে গেল, এমন সময় সীতানাথ এসে উপস্থিত হল:

—আপনার রোমান্টিক প্রতীক্ষার একটু অঙ্গহানি হল। অপরাধ মার্জনা করবেন। আমি একটু সকালেই এসে পড়েছি।

হেসে স্বপ্না বললে, বেশ করেছেন। চলুন।

গাড়িতে উঠে স্বপ্না বললে, কিন্তু এত শীগ্‌গির কলকাতা যাবেন?

—আর কী করা যায় ?

—চলুন, গান্ধীঘাটে গিয়ে একটু বসা যাক।

—খুব ভালো।

গান্ধীঘাটে দুজনে পাশাপাশি বসল গঙ্গার দিকে চেয়ে।

—একটা সুখবর দিই আগেই।

—বলুন।

—আপনাকে সার্ অংশুমান কিছু বলেন নি ?

—কী সম্বন্ধে ?

—আমার সম্বন্ধে ?

—না তো। তার মানে, এর মধ্যে ওঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয়-নি।

হাসতে হাসতে স্বপ্না বললে, কোম্পানি থেকে আমাকে বিলেত পাঠাচ্ছে।

—তাই নাকি ? কবে যাচ্ছেন ?

—সময় এখনও স্থির হয় নি। বোধ হয় চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই।

—আমার অভিনন্দন নিন। যদিও চার-পাঁচ মাস পরে আপনার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হব, ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।

—কষ্ট করে কাজ কী ? আপনিও চলুন না।

সীতানাথ চমকে উঠল : কোথায় ?

—বিলেতে।

—আমি কী করে যাব ?

—যেমন করে আমি যাচ্ছি।

—তার মানে ?

—দেখুন, আমি যাচ্ছি ওখান থেকে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের একটা ডিপ্লোমা আনতে আর সেই সঙ্গে ও-দেশের ক্যান্টিন-পরিচালনা-ব্যবস্থা দেখতে।

সীতানাথ হেসে বললে, আমি গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা নিয়ে কী করব ?

—আহা! ওটা উপলক্ষ্য মাত্র। একবার কোনো সূত্রে বিলেত ঘুরে আসা নিয়ে কথা। সার্ অংশুমানকে ধরুন না।

সীতানাথ হাসতে লাগল : আমি তাঁর কর্মচারীও নই, কিছুই নই। আমি কী সূত্রে যাওয়ার কথা ধরব ?

—আহা! ধরুন না। দেখবেন সূত্র একটা বেরিয়ে যাবে।

সীতানাথ হাত জোড় করলে : আমি পারব না। আপনি যান, এবারে আমি আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করব। অবশ্য মিনিটের হিসেব নয়, সপ্তাহের হিসাবে।

মুখ ফিরিয়ে স্বপ্না বললে, আহা!

সীতানাথ লক্ষ্য করলে লজ্জায় স্বপ্নার গাল আরক্ত হয়েছে। তার উপর পড়েছে শেষ অপরাহ্ণের সূর্যাভা।

স্বপ্না আবার বললে, সার্ অংশুমান আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। একবার বলে দেখুন না, ঠিক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—না মিস হালদার। ওটা পারব না।

—আমার সঙ্গে এক জাহাজে যাবার জন্যেও না? লণ্ডনে আমার সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকবার জন্যেও না? বসন্তে যখন ফুলের সমারোহ হবে তখন সন্ধ্যায় হাইড পার্কের একটি বেঞ্চে দুজনে বসে থাকবার জন্যেও না?

—লোভ সামলানো কঠিন। কিন্তু সূত্র খুঁজে পাচ্ছি না।

স্বপ্না অসহিষ্ণুভাবে বললে, ওই তো বললাম। সূত্র আপনাকে খুঁজতে হবে না। শুধু ইচ্ছেটা সার্ অংশুমানকে জানান। সূত্র তিনি খুঁজে বার করবেন। তারপরে তাঁর কোনো একটা কোম্পানি থেকে খরচের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি তো তাই করলাম।

একটু থেমে বললে, অবশ্য ঠিক সুযোগমতো বলতে হবে। যখন মনটা তাঁর বেশ দরাজ থাকে সেই সময়।

—দেখি ভেবে।

সীতানাথের মন দুলতে লেগেছে। অথচ, স্বপ্না জানে না, অংশুমানের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি নয়।

ওখান থেকে তারা একটা হোটেলে গেল। ডিনারের বন্দোবস্ত আগে থেকেই সীতানাথ করে রেখেছিল। কিন্তু ওখানকার আবহাওয়া খুব ভালো লাগল না। যেন বড্ড ভিড়, বড্ড বেশি শব্দ।

স্বপ্না বললে, চলুন আমার ফ্ল্যাটে। কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে।

সেখানেই গেল। যে ঘরটিতে সেদিন বসে ছিল সেখানে নয়। একেবারে ওর শোবার ঘরে।

ছোট ঘর। এক পাশে খাটে চমৎকার বিছানা পাতা। কোণে একটি টিপয়। তার উপর কয়েকখানা বই সাজানো। মেঝে-জোড়া কার্পেট।

স্বপ্না গোটা দুই তাকিয়া কার্পেটের উপর ফেললে।

বললে, চেয়ার ভালো লাগছে না। এইখানে একটু আরাম করে বসা যাক বরং।

আরাম করে বসল।

ফিরতে সীতানাথের এগারোটা বেজে গেল। অহল্যা তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সীতানাথ তৈরি হয়েই এসেছিল। অহল্যা জেগে থাকলে বলত, ব্যারিস্টারের বাড়ি কন্‌সালটেশনে দেরি হয়ে গেল।

অহল্যা ঘুমুচ্ছে। সীতানাথ নিঃশব্দে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। যাক, মিথ্যে কথাটা আর বলতে হল না।

॥ এগারো ॥

অহল্যার কী হয়েছে সেই জানে, কিছুতেই যেন তার উৎসাহ নেই। বরাবরই সে স্বল্পভাষিণী। এখন কথা একেবারেই কমে গেছে। ঠাকুর-চাকর আসে সংসার সম্বন্ধে নির্দেশ নেবার জন্যে। কখনও নির্দেশ দেয়, কখনও বলে, যা হয় করগে। ছেলে-মেয়েরা অনেকবার না ডাকলে সাড়া পায় না। এমন কি কাব্য-উপন্যাস, যার চেয়ে বড় নেশা তার জীবনে কিছুই নেই, তারও উপর যেন স্পৃহা নেই। অভ্যাসমতো একবার খুলে বসে। কয়েক পৃষ্ঠা পড়বার চেষ্টা করে। তারপরে বন্ধ করে সরিয়ে রেখে দেয়।

ছেলে-মেয়ে, দাসী-চাকর, কাব্য-উপন্যাস—এরাই তার দৈনন্দিন জীবনের নিত্যসঙ্গী। এদের সঙ্গে এই অবস্থা।

অন্য দিকে সীতানাথ। সকালে সে কখন নেমে যায়, টের পায় না। রাত্রে কখন ফেরে তাও জানতে পারে না। ছুটির দিনেও সীতানাথের কাজের অন্ত নেই। সকালে কারা আসে কে জানে! কিন্তু বারোটার আগে সে উপরে উঠতে পারে না। মধ্যাহ্ন-ভোজন ছেলেমেয়ে নিয়ে একসঙ্গে এক টেবিলেই হয়। আড়ে আড়ে অহল্যা লক্ষ্য করে, সীতানাথের কথাবার্তা বেশির ভাগই ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে। অহল্যার দিকে স্বাভাবিক ভাবে সে যেন চাইতেই পারে না। অহল্যা কোনো প্রশ্ন করলে, তাড়াতাড়ি তার জবাব দিয়েই আবার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে গল্প জোড়ে।

অহল্যা বুঝতে পারে, সীতানাথ তাকে এড়িয়ে চলতে চায়।

কিন্তু কেন?

সে তো কলহ করে না। সীতানাথের কোনো ব্যাপার নিয়ে সে তার সঙ্গে আলোচনা পর্যন্ত করে না। অংশুমানের ব্যাপারটা তার ভাল লাগে নি। তার প্রকৃতি জানে বলেই সন্দেহ হয়েছে। সে সাধারণ গৃহস্থই থাকতে চায়। সুতরাং এ বিষয়ে সীতানাথকে সে সতর্ক করে দিয়েছিল, এই মাত্র। তার কাজে বাধা দেয় নি। কোনোদিন জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করে নি, সে কী করছে, কেমন লাগছে!

প্রকৃতির দিক দিয়ে তার সঙ্গে শামুকের তুলনা চলতে পারে। শামুক মনের আনন্দে বেশ চলে। কিন্তু বিন্দুমাত্র প্রতিকূলতা দেখলেই খোলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বাইরের জগতের সঙ্গে তার আর সম্পর্ক থাকে না।

সীতানাথের উপর অংশুমানের আগ্রহ তার ভালো লাগে নি। সীতানাথকে সে সতর্ক করে দিয়েছে। অংশুমানকেও সীতানাথ সম্বন্ধে উৎসাহিত না হবার জন্যে অনুরোধ করেছে।

সীতানাথ তার সতর্কতা গ্রাহ্য করে নি। তাকে লোভে টানছে। অংশুমান তার অনুরোধ রক্ষা করে নি। তাকে কোন শয়তান ঠেলা দিচ্ছে সেই জানে। অহল্যার কর্তব্য শেষ। শামুক খোলের মধ্যে ঢুকে গেল। বাইরের জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক রইল না বললেই চলে। ছেলেমেয়েরা ডেকে সাড়া পায় না। ঠাকুর চাকর নিজেরাই যা পারে করে। বই পড়ে না। সীতানাথের সঙ্গে কচিৎ দেখা হয়। অংশুমানের সঙ্গে একেবারেই দেখা হয় না। এ অবস্থাকে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন অবস্থা ছাড়া আর কী বলা যায়!

এমনি অবস্থায় একদিন অংশুমানের ফোন এল :

—কেমন আছ?

—ভালো।

—তা বোঝা যায়।

—কী করে?

—মন্দ থাকলে মানুষ আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ করে। ভালো থাকলে কি আর করে?

—কী দুঃখে করবে বল? তুমি তো ভালো নেই বোধ হচ্ছে, যখন অনেক কাল পরে খবর নিচ্ছ।

—সে কি আমার দোষ?

—দোষের কথা কি বলেছি? আত্মীয়-স্বজনের খবর যখন নিচ্ছ, তখন তুমি ভালো নেই নিশ্চয়। সেই কথাটা বলছি।

—তাই। কিন্তু আমি সত্যি ভালো নেই অহল্যা।

—কী হয়েছে?

—এসে না দেখলে কী করে বলি কী হয়েছে।

—গিয়ে আর আমি কী দেখব বল? আমি ডাক্তারও নই, কবরেজও নই।

—বুঝলাম।

—কী বুঝলে বল তো?

—বুঝলাম, তুমি আর এখানে পায়ের ধুলো দিচ্ছ না।

—সাব্ অংশুমান অত্যন্ত বিনয়ী।

—না, বিনয় নয়।

—তা হলে বলব, সাব্ অংশুমান পাকা ব্যবসাদার। তার ভাষায় সব সময়েই ব্যবসাদারী বিনয়।

টেলিফোনের মধ্যে দিয়েও অংশুমানের দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল।

—তোমার শ্রদ্ধা এ জীবনে আর পেলাম না।

অহল্যা হেসে উঠল : শ্রদ্ধা কি কখনও চেয়েছ? যা চেয়েছ তা পেয়েছ। পাও নি বলতে পার?

—কী জানি কী চেয়েছি আর কী পাই নি! কিন্তু এইটি জেনেছি, তোমাকে পাই নি।

—আমাকে চাও নিও কখনো।

—চাইলে পেতাম?

—আজ, এত বিলম্বে, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন।

অংশুমান অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করলে :

—তার পর আর কী খবর বল?

—আমার নিজের কোনো খবরই নেই।

—ভালো মন্দ কিছুই না?

—না।

—এ পৃথিবীতে তুমিই সুখী।

—কেন?

—কারণ তুমি ভালোমন্দের অতীতলোকে বাস করছ।

—তা করছি, যদিও সুখী কি না জানি না।

সেদিন টেলিফোন এইখানেই শেষ হল। কেন অংশুমান অকস্মাৎ ফোন করলে, কী জানতে চাইছিল, কী জানতে পারল, শুয়ে শুয়ে অহল্যা ভাবতে লাগল অনেকক্ষণ।

অনেক দিন পরে সীতানাথ কোর্ট থেকে সটান বাড়ি ফিরে এল। অনেক দিন

পরে কোটটা খুলে আগের মতো হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলে। তারপরে টাইটা। আগের মতো পোশাক ছেড়ে বাথরুমে গেল। স্নানান্তে ফিরে আসতে অহল্যা তার সামনে টিপয়ের উপর চা-জলখাবার রাখলে।

অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, বরাবর বাড়ি ফিরে এলে যে! কন্‌সাল্‌টেশন নেই?

স্বভাবত অন্যমনস্ক-প্রকৃতির হলেও সীতানাথ খোঁচাটা বুঝলে, বললে, ন্‌না।

—এখনই আবার বেরুবে না কি?

—ন্‌না।—বলে অহল্যার দিকে চেয়ে হেসে বললে,—আজ তোমার সঙ্গেই একটা কন্‌সাল্‌টেশন আছে।

—আমার সঙ্গে? কী সর্বনাশ!

—সর্বনাশ নয়। শোন, সস্তায় খানিকটা জমি পাওয়া যাচ্ছে। নোব?

—নেবে কি না আমি বলব? কতটা জমি?

—দশ কাঠা। বালিগঞ্জে। (একটা বড় রাস্তার নাম করে বললে) সেইখানে।

—সে তো অনেক দাম!

—পঞ্চাশ হাজার। দাম তার লাখ টাকার কম নয়।

অহল্যা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—তারপরে তো বাড়ি তৈরি করা আছে!

—তা তো আছেই।

অহল্যা আবারও অবাক হয়ে চাইল: অত টাকা তোমার আছে?

—তা হয়ে যাবে কোনো রকমে।

এখন অহল্যা বুঝতে পারলে, দুপুরে অংশুমান টেলিফোন করেছিল কেন। জানতে যে, অহল্যা এটা জানে কি না!

অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, হঠাৎ এত সস্তায় জমিটা পাচ্ছ কী করে?

—সে একটা ইতিহাস।

সীতানাথ বলতে লাগল: ওইটে এবং ওর পাশের আরও দশ কাঠা জায়গা সার্ অংশুমানের ব্যাঙ্কে বাঁধা রেখে জমির মালিক কিছু টাকা নিয়েছিলেন। সুদে-আসলে সেটা এক লাখ পঞ্চাশ হাজারে দাঁড়ায়। ব্যাঙ্ক নালিশ করে জমিটা নিলামে তুলেছে।

—কিন্তু অত সস্তায় জমিটা কেনবার লোকের কি অভাব হবে?

—অভাব হওয়ার কথা নয়।—সীতানাথ হাসতে হাসতে বললে,—কিন্তু তোমার দাদার পদ্ধতি বিচিত্র। মোট কথা, দেড় লাখ টাকায় ওই এক বিঘে জমি আমি পাব। দশ কাঠা নিজের জন্য রাখব আর দশ কাঠা লাখ টাকায় বেচে দোব। তারও খদ্দের তোমার দাদা ঠিক করে রেখেছেন।

তোমার দাদা!

দাদা সবই ঠিক করে রেখে দুপুরে টেলিফোন করেছিলেন।

অহল্যা ধীরে ধীরে বললে, আমাদের পরিবার তো বড় নয়। এ বাড়িতেই তো চমৎকার কুলিয়ে যাচ্ছে।

বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করে সীতানাথ বললে, তুমি কী বলছ? এই বাড়িতে কুলিয়ে যাচ্ছে বলে এর চেয়ে বড় বাড়ি করব না? তোমার কি বড় হওয়ার বাসনা নেই?

—না।

অহল্যার কণ্ঠস্বর কঠিন এবং দৃঢ়।

সীতানাথ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইল।

অহল্যা বললে, আমার বড় হওয়ার বাসনা নেই। কেন জান?

সীতানাথ জবাব দিলে না। তেমনি অপলক নেত্রে চেয়ে রইল।

অহল্যা বলে চলল: কারণ আমি জানি তার জন্যে যে মূল্য দিতে হয়, তাতে পোশায় না। সার্ অংশুমান হতে চাও তুমি? তাঁকেও বড় হওয়ার জন্যে মূল্য দিতে হয়েছে। কী মূল্য সে তুমি কল্পনাও করতে পার না। মূল্য দিয়ে দিয়ে ভদ্রালাক আজ ফতুর হয়ে গেছেন।

সীতানাথ হো-হো করে হেসে উঠল: সার্ অংশুমান ফতুর হয়ে গেছেন! মাথা খারাপ! বাংলা দেশে অত বড় ধনী কজন আছে নাম বল তো?

এবারে অহল্যার কণ্ঠস্বর কাতরতায় ভেঙে পড়ল: ফতুর, ফতুর। তুমি জান না গো, ওর চেয়ে নিঃস্ব লোক বাংলা দেশে বেশি নেই। ওর কথা ভাবতে গেলে আমার কষ্ট হয়। ওর সম্বন্ধে তুমি কিচ্ছু জান না—তুমি কিছু জান না। ওর মতো হতভাগ্য আর নেই।

সীতানাথ স্তব্ধভাবে অনেকক্ষণ বসে রইল। তার পর বললে, কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি।

—তাও জানি।

সীতানাথ বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, তাও জান?

—জানি। কথা দিয়ে তুমি আমার অনুমতি নিতে এসেছ কেন তা হলে?

ব্যস্তভাবে সীতানাথ বললে, তোমার নামেই কেনা হচ্ছে জমিটা।

—আমার নামে? আমার নামে আবার কেন?

—এ বাড়িও তো তোমার নামে কেনা। তুমি আমি কি ভিন্ন?

সেই কথা! যে কথা একদিন অন্য প্রসঙ্গে অহল্যা বলেছিল সীতানাথকে।

অহল্যা কিছু বললে না। একটু হাসলে শুধু।

অহল্যা বুঝতে পারলে, সীতানাথ গত কিছুকালের মধ্যে বেশ কিছু টাকা করেছে। সমস্তই অংশুমানের অনুগ্রহে।

অংশুমানের দস্তর হচ্ছে, সে কখনও কাউকে হাত তুলে কিছু দেয় না। যারা তার অনুগৃহীত, তাদের নানা ভাবে পাইয়ে দেয়। এ কথা স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সীতানাথকেও সে নগদ কোনো সাহায্য করে নি, করবেও না। সীতানাথ যে জায়গা কিনছে, সে নিজের টাকায়। বাড়ি যদি করে এবং যখন করবে, সেও নিজের টাকাতেই করতে হবে। তাতে যদি কিছু কম পড়ে, সে-টাকা অংশুমান নিজে দেবে না, অন্য ভাবে পাইয়ে দেবে। কখনও সাধুভাবে, কখনও অসাধুভাবে। যখন তার করুণায় অসাধুভাবে কেউ কিছু নেয়, সে দূর থেকে দেখবে। কিছু বলবে না। শুধু মুচকে হাসবে।

তখন তার ব্যবহার হবে এই রকম:

—সীতানাথবাবু, উঠছেন?

—হ্যাঁ। এইবার উঠি।

—এখন বাড়ি যাবেন তো, না অন্য কোনো দিকে?

সীতানাথ যদি বুদ্ধিমান হয় তা হলে বুঝবে, অংশুমান ওর বাড়ি যাওটাই চাইছে।

বলবে, আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়িই যাব।

—তা হলে একটু কষ্ট করবেন আমার জন্যে?

অংশুমানের কণ্ঠস্বর হবে যথাসাধ্য মোলায়েম।

—নিশ্চয়। কী করতে হবে বলুন?

—আমার চাকরটাকে আপনার গাড়িতে একটা লিফ্‌ট দেবেন?

—নিশ্চয়। কোথায় নামিয়ে দিতে হবে বলুন?

—মিউনিসিপাল মার্কেটে। ব্যাটা যেমন চোর, তেমনি বিশ্রী বাজার করে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হবার উপক্রম। ওকে একটু সাহায্য করবেন?

—এ আর এমন কী ব্যাপার! খুব আনন্দের সঙ্গে করব।

সীতানাথ অথবা রাম অথবা শ্যাম এর পর থেকে অংশুমানের মুঠোর মধ্যে চলে গেল।

অহল্যা অনেক দিন থেকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দেখে আসছে অংশুমানকে। সীতানাথের জন্যে তাই সে ভয় পায়। তাই সে সীতানাথকে জিজ্ঞাসা করেছিল, অত টাকা তোমার আছে? সীতানাথ বলেছিল, যোগাড় হয়ে যাবে কোনো রকমে। ওর বলার ভঙ্গি থেকে বোঝা গিয়েছিল, টাকাটা ওর আছে।

অহল্যা বুঝলে, সীতানাথ টাকা কিছু করেছে।

সন্ধ্যার পরে সে অংশুমানকে টেলিফোন করলে।

ও-প্রান্ত থেকে গম্ভীর গলায় উত্তর এল: হ্যালো! কে?

—নাম বললেই কি চিনতে পারবে?

—নাম না বললেও চিনতে পারব। বল কী হুকুম?

—হুকুম? প্রার্থনা বল।

—তুমি তো কোনোদিন প্রার্থনা কর নি অহল্যা। তুমি নিজে হয়তো টের পাও নি, কিন্তু তুমি চিরদিন হুকুম করেছ আর আমি তামিল করেছি।

—তাই নাকি?

—তাই। বললাম তো, তুমি টের পাও নি। তারপরে, বল কী খবর?

—তুমি যাদের কর্ণধার, তাদের খবর কখনও খারাপ হয়?

—আমি কর্ণধার? বলছ কী তুমি?

—ঠিকই বলছি। শোন, জায়গাটা আমার নামে কেনা হচ্ছে কেন?

—সীতানাথবাবুর তাই ইচ্ছা দেখলাম। বোধ করি, তোমার ওপর তাঁর প্রেমের চিহ্ন রেখে যেতে চান। কেন, তোমার আপত্তি আছে?

—ওঁর কাছে বলতে পারি নি, তোমার কাছে বলছি, আপত্তি আছে।

—যা ওঁর কাছে বলতে পার নি, তা আমার কাছে বলে লাভ কী?

—লাভের কথা তো জানি নে। কিন্তু আমার প্রার্থনা তুমি কখনও অপূর্ণ রাখ নি। সেই ভরসায় বলছি।

—আচ্ছা, শুনি তোমার আপত্তির কারণটা।

—দেখ, কদিন থেকে বাবাকে মনে পড়ছে খুব বেশি। তুমি তো জান, তিনি যেখানে চাকরি করতেন সেটা ঘুষের উষ্ণ শয্যা।

—জানি। খুব ভালো করেই জানি।

—কিন্তু তিনি কখনও ঘুষ নিতেন না। সে জন্যে চিরজীবন দরিদ্রই ছিলেন।

—তাও জানি।

—তাঁর সাধুতার জন্যে মা গৌরব বোধ করতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন খুব দুঃখের মধ্যে পড়তেন তখন রেগেও যেতেন। তখন এই সাধুতার জন্যেই যা মুখে আসত তাই বাবাকে শোনাতেন। শুনছ?

—হ্যাঁ, শুনছি। বল।

—বাবা হাসতেন। বলতেন, বড় বউ, ঘুষ নিতে যে আমার লোভ হয় না তা নয়। বড়লোক হবার বাসনাও আছে। কিন্তু একটা কারণে নিতে পারি না। মা বলতেন, কী কারণে? বাবা উত্তর দিতেন, বাড়ি-গাড়ি, জমি-জমিদারি যা কিছুই করি না কেন, কিছুই তো সঙ্গে নিয়ে যাবার উপায় নেই। সব ফেলে রেখে যেতে হবে। মা বলতেন, আহা! ও-সব সঙ্গে আবার কেউ নিয়ে যায় না কি? বাবা বলতেন, তবে? ছেলেদের অধঃপাতে যাবার পথ পরিষ্কারের জন্যে ঘুষ নিতে বল তুমি? মা আর কিছু বলতে পারতেন না।

অংশুমান অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি এখন থেকে পরকালের কথা ভাবতে আরম্ভ করলে না কি? এ সব আগে তো বলতে না?

—বলতাম। তুমি শুনতে পেতে না। যাই হোক, আমার আর্জি মঞ্জুর হল?

—তুমি ভুল জায়গায় আর্জি পেশ করলে অহল্যা। যথাস্থানে পেশ করে দেখ কী হয়।

অংশুমান এ নিয়ে আর আলোচনা করতে রাজি হল না।

॥ বারো ॥

ভোরে ঘুম ভাঙার পর থেকে অংশুমানের মাথায় অহল্যার প্রস্তাবটা ঘুরপাক খেতে লাগল। এটা কী ঢঙ!

সস্তায় অত্যন্ত অভিজাত-পল্লীর মধ্যে প্রকাণ্ড একখণ্ড জায়গা সীতানাথকে কিনে দেওয়া হচ্ছে। কেনা হচ্ছে অহল্যার নামে। এত বড় অনুগ্রহ পেলে লটি দত্তের মতো মেয়েও তার চিরদিনের কেনা হয়ে থাকত। টেলিফোন নয়, সে নিজেই ছুটে এসে অজস্র ধন্যবাদ জানাত। কিন্তু অহল্যা প্রার্থনা করছে, জায়গাটা যেন তার নামে কেনা না হয়!

এটা কী ঢঙ!

জীবনে মেয়েদের দেখতে সে বাকি রাখে নি। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ধনী, কোন মেয়ে সে দেখে নি? অর্থ, অলঙ্কার, সম্পত্তি পেলে খুশি না হয়েছে কে? পরিতৃপ্তি, যাকে বলে তৃষ্ণার নিবৃত্তি, তা কারও হয় না, কিছুতেও হয় না। একটা অলঙ্কার পেলে আরও অলঙ্কার প্রত্যাশা করেছে। পাওয়ার কথা ভুলতেও সময় লাগে নি হয়তো। কিন্তু তখনকার মতো খুশি না হয়েছে কে? কুকুরের মতো লেজ নেড়ে ঘুরেছে তার চারদিকে।

কিন্তু অহল্যার এ কী ঢঙ!

সীতানাথ দিন কয়েক ঘোরাঘুরি করে এখন চারে বসেছে। নিজের অজ্ঞাতসারে টোপও গিলেছে। সে জানে না অংশুমান তাকে খেলাচ্ছে। সীতানাথ নিতান্ত ছোট মাছ নয়। হলে অনেক দিন আগেই চারে বসত। ওদের বিয়ে তো আজ হয় নি। অহল্যা প্রাণপণে গোপন করবার চেষ্টা করলেও অংশুমানের বুঝতে বাকি থাকে নি যে খুব দুঃখেই ওদের সংসার চলছে। নানা অছিলায় অংশুমান তখন অহল্যাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিবাহের পূর্বে যে-মেয়ে প্রায় নিঃসঙ্কোচেই তার সাহায্য গ্রহণ করেছে, বিবাহের পরে সেই মেয়েই নানা অছিলায় তার সাহায্যের প্রয়াস ব্যর্থ করেছে।

কেন?

এ 'কেন'র উত্তর অংশুমান পায় নি। তার আশঙ্কা হচ্ছে কোনোদিনই পাবে না।

আর তারও চেয়ে আশ্চর্য, অংশুমানের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেও তাকে কোনোদিন প্রত্যাখ্যান করে নি। কেন? এ প্রশ্ন আজও তার কাছে একটা প্রকাণ্ড হেঁয়ালির মতো জট পাকিয়ে রয়েছে।

সীতানাথের পুরুষকার এবং আত্মশ্রদ্ধা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। হলে আজ সে উকিল-সভার দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম সারিতে স্থান করে নিতে পারত না। এর জন্য যথেষ্ট অধ্যবসায় এবং প্রতিভার প্রয়োজন হয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে সে এসে চারে বসল আর অহল্যা দূর থেকে লম্বা লম্বা ঘাই মারে কেন? কত বড় মাছ সে?

মানুষও একটা পণ্য।

কোনো মানুষকে কেনা যায় না এ-কথা সে বিশ্বাস করে না। তার বিস্তৃত অভিজ্ঞতা সে সাক্ষ্য দেয় না। তাকেও কত লোক কিনেছে। নিজের স্বার্থে কতবার সে বিক্রীত হয়েছে। স্বার্থ ফুরিয়ে গেলেই আবার নিজের ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে। প্রয়োজন হলে এখনও সে বিক্রীত হতে প্রস্তুত। অবশ্য প্রয়োজন হলে।

এবং কে জানে, প্রয়োজন হতেও পারে। তার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। আকাশের কত উঁচুতে উঠতে পেরেছে? তার পরেও অনন্ত স্থান রয়েছে। যতক্ষণ মানুষের মনে লোভ রয়েছে, ততক্ষণ উর্ধ্বাকাশে অনন্ত স্থান থেকে যাবেই। এই পথে সে নিজে উঠেছে। তার পিছনে আরও কত যাত্রী। তাদের মধ্যে রয়েছে সীতানাথ।

কিন্তু অহল্যা নেই যাত্রীদলের মধ্যে। লোভের মানস-সরোবরের দিকে লক্ষ্য রেখে উর্ধ্বাকাশে ধাবমান এই হংস-বলাকার মতো।

সকলেই আছে। তার সান্নিধ্যে যাদেরই আসবার সুযোগ এবং উপলক্ষ্য ঘটেছে তারা সবাই আছে, শুধু অহল্যা নেই কেন?— এই প্রশ্নেরও উত্তর আজও সে খুঁজে চলেছে।

কখনও তার মনে হয়, আছে ওই হংস-বলাকার মধ্যে অহল্যাও আছে। সেও আত্মবিক্রয় করেছে। কিন্তু, মূল্য এবং কার কাছে—সেটা সে এখনও খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু খুঁজে একদিন পাবেই।

কখনও মনে হয়, অহল্যা আত্মবিক্রয় করে নি। কোনো মূল্যেই না, এবং

কারও কাছেই না। করলে অংশুমানের শ্যেনদৃষ্টি কিছুতেই এড়াতে পারত না। এর মধ্যে ধরা পড়তই। না, অহল্যা তার কাছে অন্তত আত্মবিক্রয় করে নি। যা করেছে তাকে বড় জোর আত্মসমর্পণ বলা যেতে পারে। এর মধ্যে মূল্যের আদান-প্রদান নেই।

কিন্তু মানুষ মাত্রেই পণ্য। এই তত্ত্বে তার বিশ্বাস গভীর এবং বদ্ধমূল। অহল্যাকেও একদিন কেনা যাবে যদি মূল্যটা সে খুঁজে পায়।

সকলের মূল্য তো এক নয়। কেউ অর্থ চায়, কেউ নাম চায়, কেউ ক্ষমতা চায়, আবার কেউ বা সন্তানের কল্যাণ চায়। অহল্যা কী চায় এখনও অংশুমান জানতে পারে নি। যেদিন জানতে পারবে সেদিনই অহল্যকে কেনা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে সীতানাথ টোপ গিলেছে। দেখা যাক কত সুতো সে টানে, আর অহল্যাই বা কী করে!

পাকা মৎস্যশিকারীর ভঙ্গিতে অংশুমান হাসলে।

অহল্যা অংশুমানের মন-মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে। সেই খারাপ মন নিয়েই সকালে তার ঘুম ভাঙল। অপূর্বকে ডেকে বলে দিলে, নীচে যারা অপেক্ষা করছে তাদের বলে দিতে আজ দেখা হবে না, ওর শরীর ভালো নেই।

অপূর্ব বললে, কুমার বাহাদুর এসেছেন।

—এসেছেন ?

অংশুমান কুমার বাহাদুরেরই প্রতীক্ষা করছিল। খবর পেয়েছে, সিদ্ধিনাথ মিসেস হিগিন্সকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছে। সিদ্ধিনাথের সম্পর্কে এই রকম একটা অংশুমানের মনে বরাবরই ছিল। সিদ্ধিনাথ হচ্ছে সেই ধরনের লোক. এই সব ক্ষেত্রে যারা মাত্রা রাখতে জানে না। আর মিসেস হিগিন্স অত্যন্ত ধূর্ত, ঘাগী মেয়েমানুষ। যেটুকু মাত্রজ্ঞান সিদ্ধিনাথের ছিল, মিসেস হিগিন্স তাও রাখতে দেবার পাত্রী নয়। তার রাশ টেনে রাখতে পারে অংশুমান। সিদ্ধিনাথ তো তার কাছে নিতান্তই শিশু।

তবু এই ব্যাপারে অংশুমান যেন খুশিই হয়েছে মনে হল। মিলের স্বার্থের জন্যে সিদ্ধিনাথের এমনি একটা বিপদে পড়া দরকার হয়েছিল।

মিলটা একটা প্রকাণ্ড সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিল। যতগুলো কারবার অংশুমান চালায় তার সবগুলোই সফল হয়েছে। ব্যবসা-জগতে এই নিয়ে তার এমন সুনাম হয়েছে যে, অনেক ডুবু-ডুবু কারবার তাকে ডিরেক্টার করে সামলে

গেছে। কিন্তু 'বঙ্গজননী' মিলের অবস্থা এমনই খারাপ হয়ে আছে যে, সিদ্ধিনাথকে ম্যানেজিং ডিরেক্টার করে তাকে সরে আসতে হয়। ব্যবসা-জগতে নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

অবশ্য পরিচালন-ব্যবস্থা যথাযথই রইল। সিদ্ধিনাথ মানেই অংশুমান। তাকে জিজ্ঞাসা না করে সিদ্ধিনাথ এক পাও চলত না। কিন্তু শুধু যে সিদ্ধিনাথের উপর বিশ্বাস করেই অংশুমান সরে এসেছিল তা নয়। বিশ্বাস সে কাউকে করে না, অন্তত কোনো একজন লোককে নয়। তার প্রত্যেকটি কারবারের পরিচালন-চক্র এমন বিভিন্ন ধরনের লোক নিয়ে এমনভাবে সাজানো যে, কোনো একটা ঘাঁটি বিশ্বাসঘাতকতা করবার চেষ্টা করলে অন্য ঘাঁটিগুলো বাধা দেবে। বেজে উঠবে 'পাগলা ঘন্টি'। অংশুমান সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে যাবে।

এবং তার টের পেয়ে যাওয়ার অর্থ কী তা কর্মচারী-মহলে অবিদিত নয়। সুতরাং মাঝে মাঝে কারও কারও বিশ্বাসঘাতকতা করার লোভ জাগলেও সাহসের অভাবে চুপ করে থাকবে।

'বঙ্গজননী' বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধেও তাই। ম্যানেজিং ডিরেক্টার যেই হোক, পরিচালন-চক্র অংশুমানের মুঠোর মধ্যে। হয়তো সিদ্ধিনাথ এই গোপন কথা জানে না। কিন্তু মিলের অত্যন্ত তুচ্ছ কাজও অংশুমানের অনুমতি ছাড়া হয় না। নিয়মিত ভাবে মিলের প্রত্যেকটি বিভাগের কর্তা সিদ্ধিনাথকে ডিঙিয়ে. সিদ্ধিনাথের আগোচরে অংশুমানের সঙ্গে আলোচনা করে তার মত নিয়ে যায়।

অংশুমান দেখে খুশি হয়েছে, সিদ্ধিনাথও কিছুই তাকে গোপন করবার চেষ্টা করে না। যদিও সিদ্ধিনাথ জানে না. যে ব্যাপার নিয়ে সে পরামর্শ করতে এসেছে তা অংশুমানের অবিদিত নয় এবং ইতিপূর্বেই সে যথাবিহিত নির্দেশ সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু সে কথা সে সিদ্ধিনাথকে জানতে দেয় না। যেন ব্যাপারটা সে এই প্রথম শুনছে এমনিভাবে আলোচনা করে, এবং বন্ধুভাবে যথাসাধ্য সিদ্ধিনাথকে আবশ্যক পরামর্শও দেয়।

সুতরাং যদিও সিদ্ধিনাথের জন্যে নয়, কিন্তু তার অর্থসাহায্যে এবং অংশুমানের ব্যবস্থাপনায় 'বঙ্গজননী' বস্ত্রশিল্প এখন সংকট প্রায় কাটিয়ে উঠেছে। অংশুমান হিসাব করে দেখেছে আর লাখখানেক টাকা হলে মিলটা সম্পূর্ণ নিরাপদ হতে পারে।

কিন্তু সেই লাখখানেক টাকা কোথা থেকে আসবে ?

তার ব্যাঙ্ক থেকে ওভারড্রাফ্‌ট্‌ দিতে পারে। কিছু কিছু দিচ্ছেও। কিন্তু দায়িত্ব তার নিজেকেই গ্রহণ করতে হয়। সেইটে সে সিদ্ধিনাথের কাঁধে চাপাতে চায়। কিন্তু টাকার দায়িত্ব কেউ সহজে নিতে চায় না। সিদ্ধিনাথও অনেক টাকা ঢেলেছে। আর দায়িত্ব নিতে রাজি হবে কি না সন্দেহ। অথচ হবে, বিপদে পড়লেই হবে।

অংশুমান মিসেস হিগিন্সের তরফ থেকে সিদ্ধিনাথের এমনি একটা বিপদের সম্ভাবনার অপেক্ষা করছিল। মিসেস হিগিন্সের দৃষ্টি নিজে থেকে এদিকে না পড়লে তাকেই পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে তার আর প্রয়োজন হল না। মিসেস হিগিন্স নিজেই তৎপর হয়ে উঠেছে।

অংশুমানের মুখে তাৎপর্যপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল। বললে, কুমার বাহাদুরকে ওপরে নিয়ে এস।

উপরের অফিস-ঘরে গিয়ে অংশুমান বসল না। বসল গিয়ে দক্ষিণ দিকের অর্ধেক-ঢাকা অর্ধেক-খোলা প্রশস্ত বারান্দায়।

সিদ্ধিনাথ এল।

ওকে বেশ উদ্বিগ্ন বোধ হচ্ছিল। অংশুমান বুঝলে, ওর সম্বন্ধে সে যা শুনেছে মিথ্যা নয়। এবং বুঝে বেশ খুশি হল।

—আসুন, আসুন কুমার বাহাদুর। খবর সব ভালো ?

প্রচুর হৃদ্যতার সঙ্গে অংশুমান ওকে অভ্যর্থনা জানাল।

—ভালো বিশেষ নয়।—আসন গ্রহণ করতে করতে ক্লান্তভাবে সিদ্ধিনাথ উত্তর দিলে,—বলছি সে সব কথা। কিন্তু আপনার শরীর কি ভালো নেই ? অপূর্ববাবু বলছিলেন।

অংশুমান হেসে উঠল: ও কিছু নয়। ও-রকম একটু আধটু শরীর খারাপ প্রায়ই হয়।

সিদ্ধিনাথ চিন্তিতভাবে বললে, আমার খবর ভালো বিশেষ নয়। একটা অশান্তির মধ্যে পড়ে গেছি।

সিদ্ধিনাথ পকেটে হাত দিয়ে কী যেন ভাবলে।

সেদিকে চকিতে দৃষ্টি হেনে অংশুমান জিজ্ঞাসা করলে, কী অশান্তি ? মিল নিয়ে ?

—না, মিল নিয়ে নয়।—সিদ্ধিনাথ ম্লান হেসে বললে,—সেজন্যে তো আপনিই রয়েছেন।

—তবে ?

—এ অন্য ব্যাপার।

পকেট থেকে একখানা খাম বের করে অংশুমানের হাতে দিয়ে বললে, চিঠিখানা পড়লেই বুঝতে পারবেন।

মিসেস হিগিন্সের চিঠি। গভীর আগ্রহের সঙ্গে অংশুমান চিঠিখানা পড়তে লাগল।

সিদ্ধিনাথ জিজ্ঞাসা করলে, একে আপনি কতদিন থেকে জানেন ?

চিঠি পড়তে পড়তেই অংশুমান বললে, মিসেস হিগিন্সকে ?

—হ্যাঁ।

—প্রায় ওর প্রথম স্বামীর আমল থেকে।

সিদ্ধিনাথ লাফিয়ে উঠল : তার মানে ? ওর ক'টি স্বামী ?

চিঠি পড়তে বেশি সময় লাগল না। সংক্ষিপ্ত কিন্তু কঠিন চিঠি।

সেখানা ভাঁজ করতে করতে অংশুমান সহাস্যে উত্তর দিলে, আপনাকে পেলে চারটে হবে।

ভয়ে এবং দুশ্চিন্তায় সিদ্ধিনাথের গলা শুয়ে গেল। কোনো রকমে বললে, বলেন কী ! আমাকে কি ওকে বিয়ে করতে হবে না কি ?

দুষ্টুমিতে অংশুমানের চোখ পিট্ পিট্ করতে লাগল : সেই রকমই তো লিখেছে।

উত্তেজিত ভাবে সিদ্ধিনাথ বললে, ওর কথা ছেড়ে দিন। শুধু বিয়ে কেন, ও বলবে, তার ওপর বিলাসগড় পরগনার জমিদারিটাও ওর নামে লিখে দিতে হবে। তাই দিতে হবে নাকি ?

—তা তো জানি না। সে সব উকিল-ব্যারিস্টারকে জিগ্যেস করবেন। কিন্তু ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে না জানলে তাঁরাও পরামর্শ দিতে পারবেন না।

—আর পাঁচজনের সঙ্গে যতদূর গড়িয়েছিল তত দূরই গড়িয়েছে।

—তার বেশি নয় তো ?

বিরক্তভাবে সিদ্ধিনাথ উত্তর দিলে, তাই বা কী করে জানব মশাই ! যতদূর গড়াবার কথা, যতদূর সাধারণত গড়ায় ততদূরই গড়িয়েছে। বেশি-কমের কথা জানি না।

হাসিটা চাপবার এবং ঢাকবার জন্যে অংশুমান চিঠিখানা খুলে মুখের সামনে ধরলে। বললে, চিঠিখানায় ভাষার বাঁধুনি দেখছেন?

তেমনি রাগত কণ্ঠে সিদ্ধিনাথ বললে, বাঁধুনি থাকবে না! ও কি সোজা মেয়েমানুষ নাকি?

চিঠিখানা ভাঁজ করে খামের ভিতর পুরতে পুরতে অংশুমান বললে, মেয়েটার যথেষ্ট প্রতিভা ছিল। শুধু জুয়োখেলায় নষ্ট হয়ে গেল। চিঠিটা পড়লে মনে হয়, পাকা ব্যারিস্টারের খসড়া। তা ব্যারিস্টারের বউ তো বটে।

চমকে উঠে সিদ্ধিনাথ জিজ্ঞাসা করলে, ও কি ব্যারিস্টারের স্ত্রী নাকি?

—তাও জানেন না?

—কী করে জানব মশাই?—হাত উলটে হতাশভাবে সিদ্ধিনাথ বললে, —কটা মাস শুধু চরকির মতন ঘোরালে। কিছু কি জানবার ফুরসুত দিয়েছে?

অংশুমান আর পারলে না, হো-হো করে হেসে ফেললে।

তারপর বললে, যা বলেছেন! মেয়েটা অত্যন্ত ধড়িবাজ। ওর ইতিহাস শুনলেই বুঝতে পারবেন কী পাল্লায় পড়েছেন। তার আগে একটু চায়ের কথা বলি। গলা শুধু আপনারই শুকয় নি, আমারও শুকিয়েছে।

চায়ের ফরমাস করে অংশুমান হাসতে লাগল।

তারপর বলতে লাগল :

মেয়েটা বিলেত থেকে এদেশে আসে একটি সওদাগর কোম্পানির ছোট সাহেবের স্ত্রী হয়ে। ব্যবসাসূত্রেই প্রথমে ওর স্বামীর এবং তারপরে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। দুজনেরই খুব চমৎকার চেহারা, অমায়িক ব্যবহার এবং সুন্দর কথাবার্তা!

কয়েক বৎসরের মধ্যেই উভয়ের প্রকাণ্ড পরিবর্তন দেখা গেল। ওর সঙ্গে অবশ্য বেশি দেখাশোনা হত না, কিন্তু ওর স্বামীর সঙ্গে কার্যোপলক্ষে প্রায়ই দেখা হত। লক্ষ্য করতে লাগলাম, ব্যবহারের সেই অমায়িকতা নেই, কথাবার্তা কেমন এলোমেলো, অন্যমনস্ক, এমনকি চেহারাও যেন কী রকম রুক্ষ হয়ে আসছে।

ধীরে ধীরে কানাঘুষো আরম্ভ হয়ে গেল, উভয়ে বনছে না। বেয়ারারা রটাতে লাগল, মেম সায়েব ক্লাবে গিয়ে ক্লাশ খেলে, সায়েব একা একা ঘরে

বসে পেগের পর পেগ মদ খায়। অনেক রাত্রে মেম সায়েব যখন ফেরে তখন কেউই প্রকৃতিস্থ নয়। দেখা হওয়ামাত্র দুজনে মারপিট হয়।

বড় সাহেবের সময় হয়ে এসেছে, বিলেত যাবে। ছোট সাহেবের বড় সাহেব হওয়ার কথা। কিন্তু তখন কানাঘুষা চলছে, ছোট সাহেব কী করবে বোঝা যাচ্ছে না। অন্তরঙ্গদের কাছে ছোট সাহেব নাকি বলেছে, হয় তাকে মেমকে ডাইভোর্স করতে হবে, নয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে মেম নিয়ে দেশে ফিরতে হবে। কোনটা সে করবে বোঝা যাচ্ছে না।

এই যখন অবস্থা তখন রিট—

বলেই অংশুমান হঠাৎ সিদ্ধিনাথের দিকে চেয়ে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলে, ওর নাম যে রিটা সেটা জানার ফুরসুত পেয়েছেন তো? না, তাও জানেন না?

সিদ্ধিনাথ লজ্জিতভাবে জবাব দিলে, না, তা জানি। তারপর বলুন?

অংশুমান বলে চলল:

তখন রিটা ক্লিফোর্ড। রিটা হঠাৎ একদিন আমার অফিসে টেলিফোন করলে, আমার সঙ্গে তার বিশেষ দরকার আছে। কোথায় দেখা করার সুবিধা? বাড়িতে না অফিসে, এবং কখন?

আমি তো অবাক। মিঃ ক্লিফোর্ডের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলেও রিটার সঙ্গে তেমন কিছু নয়। সে আসতে চায় আমার এখানে? কেন?

কেন তা সে বললে না। বললে, দেখা হলে বলবে।

আমি দেখলাম, এ তো মহামুশকিল! ক্বচিৎ-কখনও হলেও ক্লিফোর্ড আমার অফিসে আসে। রিটা থাকতে থাকতে এসে পড়লে কেলেঙ্কারির আর শেষ থাকবে না। তার চেয়ে বাড়িতে আসাই ভালো। আমার সঙ্গে ওদের দাম্পত্য সমস্যা নিয়েই হয়তো আলোচনা করতে আসছে। ক্লিফোর্ডের বন্ধু হিসাবে বোধ হয় আমার সাহায্য চাইবে। সেইদিন সন্ধ্যায় তাকে আমার বাড়িতে আসতে বললাম।

(ইতিমধ্যে রিটা সম্বন্ধে তার মাথায় যে দুর্বুদ্ধি খেলতে আরম্ভ করেছে সেটা অংশুমান চেপে গেল।)

নির্দিষ্ট সময়েই সে এসে উপস্থিত হল। একে তো সুন্দরী, তার উপর এমন সুন্দর বেশভূষা করেছে যে, মনে হল মানবী নয়, দেবরাজের সভা থেকে স্বয়ং উর্বশী নেমে এসেছে।

তাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করে বসালাম। রিটা বসল। হাসিমুখে আমার সঙ্গে নানা অবান্তর প্রসঙ্গের আলোচনা করতে লাগল। কিন্তু মনে হল যেন অত্যন্ত চঞ্চল। সে ছটফট করছে। চোখে উদ্বেগ এবং ব্যস্ততা।

আমি অপেক্ষা করছি আসল প্রসঙ্গের জন্যে।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ বললে, তুমি জর্জের বন্ধু। অত্যন্ত বিপদে পড়ে তোমাকে যদি একটা অনুরোধ করি রাখবে?

আমি সম্ভবত একটু অসতর্ক হয়েছিলাম। তৎক্ষণাৎ কথা দিলাম, নিশ্চয়ই রাখব।

রিটার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললে, কথা দাও জর্জকে বলবে না।

—কথা দিলাম।

—আমার এখনই শ-পাঁচেক টাকার বিশেষ দরকার - Just for a fortnight, দেবে?

হঠাৎ ঘরে বজ্রপতন হলেও আমি এত বিস্মিত হতাম না। ও যে অল্প-পরিচিত স্বামীর বন্ধুর কাছে টাকা চাইতে পারে, এর জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। রিটা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে। সুতরাং বিস্ময় যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় সেজন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

মুখে বললাম, খুব আনন্দের সঙ্গে দোব।

আগ্রহে রিটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে, আমি জানতাম।

লোহার আলমারি থেকে টাকা বার করতে করতে ওই কথাটাই ভাবতে লাগলাম, ও জানত? কী করে জানত যে, চাওয়া মাত্র আমি টাকা দিয়ে দোব? আমাকে কি তেমনি বোকা দেখায়?

পরে বুঝলাম, ওটা কিছু নয়। কথার কথা মাত্র।

ওকে পাঁচখানা একশো টাকার নোট তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিলাম।

টাকাটা ব্যাগে পুরতে পুরতেই ও যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আমায় অজস্র ধন্যবাদ দিলে। ক্লিফোর্ডকে না বলবার জন্য বার বার সতর্ক করে দিলে এবং টাকাটা ফেরত দিতে পনরো দিনের বেশি কোনোমতেই দেরি হবে না জানিয়ে চলে গেল।

সিদ্ধিনাথ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলে, ফেরত দিয়েছিল টাকাটা?

অংশুমান হেসে উঠল। বললে, 'কুমার বাহাদুর অসতর্ক মুহূর্তে একটা

বোকামি করে ফেলেছিলাম সত্যি। কিন্তু টাকাটা ওর কাছ থেকে ফিরে পাবার আশা করব, এমন বোকা নই।

টাকা ফেরত পেলাম না। কিন্তু মাঝে মাঝে টেলিফোনে ভরসা পেতে লাগলাম। অবশেষে একদিন খবর পেলাম, ক্লিফোর্ডের সঙ্গে ওর একটা আপোস হয়ে গেছে। বিচ্ছেদের আপোস। আপোস করা ছাড়া ক্লিফোর্ডের বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। ক্লিফোর্ড ওকে দশ হাজার টাকা দিলে। তার বিনিময়ে রিটাই আদালতে বিচ্ছেদ চাইলে। ক্লিফোর্ড আপত্তি করলে না।

এর কিছুদিন পরেই ও বিয়ে করলে একটি ডাক্তারকে। ডাঃ ফুলার। আমি বলতাম, ডাঃ ফুল। চিকিৎসকাসূত্রে আমার বাড়ি এসেছেন তিনি। বেশ দিলখোলা, খোশমেজাজী ভদ্রলোক। আই. এম. এস. ডাক্তার, প্র্যাকটিসও বেশ ভালোই ছিল।

রিটাকে সুখে রাখার জন্যে ভদ্রলোক যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করা এক জিনিস, তাকে বিয়ে করা আর-এক জিনিস। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ডাঃ ফুলার অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। রিটাকে নিয়ে ঘর করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু কলকাতায় কিছুতেই নয়। ভদ্রলোক গোপনে চেষ্টা করে বদলি হবার হুকুম পেলেন একেবারে আম্বালায়।

রিটা বেঁকে বসল। কলকাতার সমাজে সে তখন এমনই মশগুল হয়ে গেছে যে, কলকাতা ছাড়া তার পক্ষে অসম্ভব। ডাঃ ফুলার অগত্যা একাই চলে গেলেন আম্বালা। সেখানে কিছুদিন অপেক্ষা করার পর জুডিশিয়াল সেপারেশনের নোটিশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুল, ডাঃ ফুলারের অ্যাটর্নি জানাচ্ছেন যে, মিসেস রিটা ফুলারের দেনার জন্যে তাঁর মক্কেল ডাঃ ফুলারের কোনো দায় রইল না। যে কেউ উক্ত মহিলাকে দেনা দেবেন, তিনি তাঁর নিজের দায়িত্বেই দেবেন।

এই বিজ্ঞাপনটা কাজ দিলে। রিটার সঙ্গে তখন দহরম-মহরম চলছে অন্যান্যের সঙ্গে মিঃ হিগিন্সের। হিগিন্সের মাঝারি প্র্যাকটিস। তিনি রিটাকে পরামর্শ দিলেন বিবাহ-বিচ্ছেদের। এবং নিজেই তাকে যথাসময়ে বিবাহ করলেন।

হিগিন্সের সঙ্গে রিটার বেশ বনে গেল। হিগিন্সের মদ এবং জুয়ার নেশা রিটাকেও ছাড়িয়ে যায়। সে রিটাকে সর্ববিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা দিলে। এবং দুজনের রোজগারে ওদের মন্দ চলছিল না।

রিটার নিজের বোঝাই পর্বত। এর উপর অন্যের বোঝা বইবার মেয়ে সে নয়। কিন্তু বোধ হয় উপর্যুপরি দুটো বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলার পর সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বুঝেছিল, পৃথিবীতে নিরচ্ছিন্ন সুখভোগের ব্যবস্থা কোথাও নেই। এবং অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার তুলনায় এটাকেই অপেক্ষাকৃত ভালো মনে হয়েছিল।

সিদ্ধিনাথ জিজ্ঞাসা করলে, সেই হিগিন্স লোকটা কোথায়? চিঠির খসড়া কি তারই তৈরি বলে মনে করেন?

—না।—অংশুমান হেসে বললে,—তিনি মারা গেছেন।

সিদ্ধিনাথ সংশোধন করে দিলেন: বলুন, মরে বেঁচে গেছে।

—তা বলতে পারেন।

—এখন আমি কী করব?

হেসে অংশুমান বললে, আপনাকে আর-কিছু করতে হবে না। যা করেছেন ওই যথেষ্ট। দেখি, আমি কী করতে পারি।

—বাস্, বাস্।

আনন্দে, উৎসাহে সিদ্ধিনাথ লাফিয়ে উঠল। বললে, তা হলেই হল। আপনি ভরসা দিলে আমার আর করবার কিছু নেই।

—ভরসা,—চিন্তিতভাবে অংশুমান বললে,—দেখুন, মেয়েটি জোঁকজাতীয়। অত্যন্ত রক্তপিপাসু। তা ছাড়া মজা লক্ষ্য করেছেন, জোঁকেরই মতো ও একটা আশ্রয় ধরে অন্য আশ্রয় ছাড়ে। হিগিন্স নেই, সুতরাং ও হয়তো সত্যিই অন্য আশ্রয় খোঁজ করছে।

সিদ্ধিনাথ আবার বসে পড়ল। সভয়ে বললে, তা হলে?

—দেখা যাক কী হয়! আমি একবার রিটার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সিদ্ধিনাথ কিছু আশায়, কিছু নিরাশায় উঠতে উঠতে বললে, যা করবার করুন মশাই। আমি আর ভাবতে পারি না। চিঠিখানা পাওয়ার পর কাল সারারাত্রি ঘুমুতে পারি নি।

অনিদ্রার চিহ্নস্বরূপ একটা বিরাট হাই তুলে সিদ্ধিনাথ চলে গেল।

॥ তের ॥

ব্যবস্থাটা কে যে করলে ভগবান জানেন।

সীতানাথের বিশ্বাস, এ স্বপ্নার কাজ। স্বপ্না হাসে। বলে, সে এর বিন্দু বিসর্গও জানে না। কে জানে, সে সত্য বলছে, না লুকুচ্ছে! মোট কথা অংশুমান একদিন সীতানাথকে ডেকে বলল, তাদের একটা মামলা, যে মামলা সীতানাথই তদ্বির করছিল, সেটা প্রিভি কাউন্সিলে পাঠাতে হবে স্থির হয়েছে। ওদের কৌঁসুলী স্থির হয়েছেন সার্ চার্লস জোন্স। সার্ চার্লসকে মামলাটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে সীতানাথের লণ্ডন যাওয়া দরকার। তার কি অসুবিধা হবে?

সীতানাথ তো অবাক!

স্বপ্না যাচ্ছে বিলেত। সে সীতানাথকেও ধরেছিল যাবার জন্যে। তার বিশ্বাস অংশুমানকে বললেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সীতানাথ রাজী হয় নি। তার বিলেত যাওয়ার উপলক্ষ্য কোথায়? কী করতে সে যেতে পারে? যাওয়ার কোনো সূত্রই সামনে নেই। অংশুমানকে বলবে কোন্ মুখে?

অংশুমানকে সীতানাথের বলবার দরকার হল না। ব্যবস্থা হয়ে গেল সীতানাথের বিলেত যাওয়ার। তিন সপ্তাহ, কি প্রয়োজন হলে এক মাসও তাকে থাকতে হতে পারে। এর জন্যে দৈনিক মোটা হারে ফী পাবে।

আহার ঔষধ দুই-ই এক সঙ্গে।

অংশুমানের বাড়ি থেকে সীতানাথ সটান ছুটল স্বপ্নার কাছে।

—হ্যাঁ। বাহাদুরি আছে তোমার।

—কী বাহাদুরি?

—আহা! কিছুই জানেন না যেন!

—কী জানব? সত্যি তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না।

—আহা! কিছুই বুঝতে পারছ না! আমার বিলেত যাওয়া ঠিক করলে কে?

—বিলেত যাওয়া! তোমার!—স্বপ্না হাততালি দিয়ে নেচে উঠল,—কবে গো?

ওর মুখ দেখে মনে হল, কথাটা এই প্রথম শুনছে ও।

—কেন, তুমি শোন নি?

—না।

—স্যার্ অংশুমান বলেন নি?

—না। তুমি যে তাঁকে ধরেছ, তাও তো বল নি!

—আমি কেন ধরতে যাব? আমি তো বলেছিলাম, আমি ধরতে পারব না। আমার বিশ্বাস, তুমি ধরেছ।

—আমি ধরি নি। ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সাহসে কুলোয় নি।

—সত্যি বলছ?

—তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি।

স্বপ্না ডান হাতখানা ওর কাঁধের উপর তুলে দিলে।

সীতানাথ অবাক। কে বললে তা হলে?

স্বপ্না বললে, কেউ বলে নি।

কেউ বলে নি অথচ হয়ে গেল—এ কথা অবিশ্বাস্য। সীতানাথ প্রতিষ্ঠাবান উকিল। সে জানে, প্রত্যেক কাজের পিছনে একটা কারণ থাকে। এবং কারণটা যুক্তিসহ হওয়া দরকার।

বললে, মামলাটা প্রিভি কাউন্সিলে পাঠানো দরকার। সেই সূত্রে আমার নাম মনে পড়েছে?

—হতে পারে, দৈবাৎ এটা ঠিক হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় তাও নয়।

—কী তবে?

—ওঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব তীক্ষ্ণ। কেউ কিছু না বললেও উনি অনেক কথা বুঝতে পারেন,—তোমার মনের কথা, আমার মনের কথা। না না, তুমি হেসো না। আমি দেখেছি। অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণ পেয়েছি। বিশ্বাস কর।

—অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, আমাদের ব্যাপারটা উনি জানেন?

—সুনিশ্চিত, তাঁকে ফাঁকি দিয়ে কেউ কোনো কাজ করতে পারে না।

—এবং আমাদের একটা নতুন আনন্দের সুযোগ দেবার জন্যে এই সূত্র বের করেছেন?

—হ্যাঁ।

—মামলা-মোকদ্দমা বাজে?

—বাজে নয়। ওটা উপলক্ষ্য। এবং এই উপলক্ষ্যটা উনিই আবিষ্কার করেছেন।

সীতানাথ একটু ভাবলে। উকিল মানুষ, যুক্তি ছাড়া কিছুই গ্রহণ করতে চায় না।

বললে, তাই যদি হয় তা হলে আমাদের এক জাহাজে যাওয়ারই ব্যবস্থা হবে

স্বপ্না বললে, হবেই এমন কথা বলা যায় না। ওঁর মনের কথা উনি ছাড়া আর-কেউ জানে না। তবে হওয়া সম্ভব। প্রেমিক-প্রেমিকাদের উনি পরম বন্ধু।

স্বপ্নার কথাটা সীতানাথের মনে লাগল, তবু বিশ্বাস করতে বাধল। হেসে বললে, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ?

—আমি ওই নাম দিয়েছি।

—নামটা ভালো দিয়েছ।—তারপরে বললে,—তা সে যাই হোক, মেমসাহেবদের দেখাবার জন্যে ক'খানা জমকালো শাড়ি কিনবে বলছিলে যে! সে কি আজকে হবে ?

—না।

—সাহেব-বাড়িতে ওভারকোটটার অর্ডারটা ?

—সেও আজ নয় ডার্লিং। বিলেতযাত্রার আগে আমাদের দুজনের একসঙ্গে হবে।

সীতানাথ হেসে বললে, কিন্তু বিলেত যাওয়া যদি আমাদের একসঙ্গে না হয় ?

—হবে, হবে, হবে। এত যখন হয়েছে তখন বিলেত যাওয়াও একসঙ্গেই হবে। দেখে নিও।

বলে স্বপ্না যেন নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল।

বিলাতযাত্রার খবরটা কিন্তু সীতানাথ তখনই অহল্যাকে দিলে না। আজকাল অহল্যাকে কেমন ভয় করে। কী যেন হয়েছে অহল্যার, সব কাজেই,—সব শুভ কাজেই,—বাধা দেয়। সমস্ত বন্দোবস্ত পাকাপাকি না হওয়া পর্যন্ত তাকে জানানো নিরাপদ নয়। হয়তো বলে বসবে, না, যাওয়া হবে না। কী হবে বিলেত গিয়ে ?

স্বপ্নার কথা অহল্যা জানে না। সীতানাথের বিশ্বাস, অংশুমান ছাড়া কাক-পক্ষীও এটা টের পায় নি। অথচ অহল্যা যেন কী রকম হয়ে যাচ্ছে দিন দিন! সব কাজে সন্দেহ। সব কাজে অবিশ্বাস। সীতানাথ সাধ্যমতো ওকে এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করে।

বিলাতযাত্রার খবরটাও ওকে তখনই জানালে না। যখন সব ঠিক হয়ে গেল,—পাসপোর্ট, জাহাজের বার্থ রিজার্ভ,—তখন একদিন এসে হাসতে হাসতে জানালে।

তখন ওদের যাত্রা করতে আর দিন-পনেরোও নেই।

অহল্যা তো আকাশ থেকে পড়ল: বিলেত! বিলেত কেন? সেখানে কী?

—সার্ অংশুমানের একটা কোম্পানির মামলা নিয়ে।

—মামলা নিয়ে?

—হ্যাঁ। একটা মামলায় এখানে ওঁদের হার হয়েছে, সেইটে নিয়ে।

—সেইটে নিয়ে? তুমি যাবে? ওখানে কি উকিল-ব্যারিস্টার নেই?

সীতানাথ বললে, থাকবে না কেন? বড় ব্যারিস্টার দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মামলাটা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে তো?

অহল্যা কিছুতেই যেন বুঝতে পারছে না। বললে, তাই তুমি যাচ্ছ বুঝিয়ে দিতে?

—আর কে যাবে বল? আমি মামলাটা করেছি, ওর অন্ধি-সন্ধি জানি। কত টাকা দৈনিক ফী পাব জান? জাহাজ-ভাড়া তো আছেই, তার উপর

বাধা দিয়ে অহল্যা বললে, কবে যাচ্ছ?

—সাতুই।

—তারও তো আর দেরি নেই!

—না। দিন-পনেরো মাত্র।

অহল্যা নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ভাবলে। উকিল মানুষ, মক্কেলের ফী'তে মামলার জন্যে বিলেত যাচ্ছে, এর মধ্যে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তবু তার মনে নানা দুশ্চিন্তা। মনকে সে বোঝাবার চেষ্টা করে, সীতানাথ সম্বন্ধে কিছুকাল থেকে তার মনে যে দুশ্চিন্তা জেগেছে তা মিথ্যে। তার প্র্যাকটিস বেড়েছে। এর মধ্যে দুশ্চিন্তার কী আছে?

তবু দুশ্চিন্তার হাত থেকে পরিত্রাণ পায় না। এর পিছনে যে অংশুমান আছে, সেই দুশ্চিন্তা সে কিছুতে ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

সীতানাথ জিজ্ঞাসা করলে, তুমি খবর শুনে খুশি হও নি ?

মুখে জোর করে হাসি টেনে অহল্যা বললে, হব না ? তুমি বিলেত যাচ্ছ, এ কি কম কথা ? খুব খুশি হয়েছি।

সীতানাথ আশ্বস্ত হল। এবং সেটা সে গোপন করতে পারলে না। বললে, আমার খুব ভয় ছিল, তুমি হয়তো খুশি হবে না।

—সে কী কথা ! খুশি হব না ? ভয় ছিল কেন ?

—কী জানি কেন !

—কবে ফিরবে ?

—তিন সপ্তাহ। বড় জোর এক মাস পরে।

—যাওয়া-আসা নিয়ে ?

—না। লণ্ডনেই থাকতে হবে এক মাস।

—তার মানে দু মাস বল।

—তাই। কিন্তু তোমার মুখ অমন ফ্যাকাশে লাগছে কেন ? শরীর কি ভালো নেই ?

বোধ হয় অনেক দিন পরে অহল্যার মুখের দিকে সীতানাথ চাইলে। কি বোধ হয়, যে-চোখ দিয়ে আজ চাইলে, সে চোখ দিয়ে অনেক দিন চায় নি।

অহল্যা হেসে বললে, কেন ? ভালোই তো আছে।

সীতানাথ চিন্তিতভাবে ওকে ভালো করে নিরীক্ষণ করল : না। ভালো নেই বোধ হচ্ছে। তুমি লুকুচ্ছ।

এবারে অহল্যা খিল খিল করে হেসে উঠল : কী আশ্চর্য ! ভালো না থাকলে লুকোব কেন ?

সীতানাথ তথাপি বিশ্বাস করল না। বললে, তা হলে তোমার মুখ অমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন ?

—মুখ ? ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন ? বোধ হয় পাউডার বেশি হয়েছে। তা ছাড়া পাউডারগুলো যা হয়েছে, একেবারে বাজে।

অহল্যা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখখানা ঘষলে, বাজে পাউডার উঠে গিয়ে মুখ যাতে একটু আরক্ত বোধ হয়।

বললে, তুমি তো যাচ্ছ। কিন্তু এর মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায় যদি ?

সীতানাথ হেসে ফেললে, এর মধ্যে যুদ্ধ বাধবে তোমাকে কে বললে ?

—খবরের কাগজে যে রকম লিখছে।

—ওরা ওই রকম লেখে। নইলে কাগজ বিক্রি হবে কেন? সকালের কাগজ পড়েই তোমার এই ভয়, সন্ধ্যের দিকে এসপ্ল্যানেডে গেলে তুমি তো কাঁপতে থাকবে। এমন করে হুকারগুলো চেঁচাবে যে মনে হবে, যুদ্ধ বাধবে নয়, বেধে গেছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—তা হলে তুমি যে ক'টা দিন বিলেতে থাকবে, সে ক'টা দিন এসপ্ল্যানেডের দিকে যাচ্ছি না বাবা!

—না, যেও না।

সেই দিন ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যার সময় এসে তাকে ঘিরে ধরল।

—মা, বাবা নাকি বিলেত যাচ্ছেন?

—তাই তো শুনছি।

—তুমি নাকি ভয় পেয়ে গেছ?

—না। ভয় পাব কেন? বিলেত কি কেউ যাচ্ছে না? তুইও তো ক'দিন পরে যাবি?

—আমিও যাব মা?

—যাবি বই কি! লেখাপড়া শিখতে তোরা দুই ভাইই যাবি। আমি কি তখন ভয় পাব?

—বাবা বলছিলেন কিনা।

—উনি কিছুই বোঝেন না।

সীতানাথ বোঝে না। অহল্যার অন্য ভয়। সে-ভয় সীতানাথের চোখে পড়ে না। কোনো সাধারণ মানুষের চোখেই পড়বে না।

॥ চৌদ্দ ॥

সকালে লটি দত্ত টেলিফোন করলে। একেবারে কবিতা দিয়ে আরম্ভ: 'এ কী কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে রঘুরাজ!'

অংশুমান চমকে উঠল: কী সর্বনাশ! সকালেই কবিতা আরম্ভ করলে?

—তোমার কি ধারণা সকালটা কাব্য করার সময় নয়?

—কখনই না।

—তোমার মতে কখন কবিতা বলার সময় তা হলে?

নিম্নকণ্ঠে অংশুমান বললে, সন্ধ্যের পর।

—বাজে কথা।

—জান না বুঝি, কবিতা অনুরাগের ব্যাপার। সেটা সন্ধ্যের পর গলায় ফোটে ভালো।

লটি খিলখিল করে হেসে উঠল: আজ্ঞে না মশাই। কবিতা রাগেরও ব্যাপার। আর সেটা সকালেই ফোটে ভালো। শোন।

—বল।

—স্বপ্নাকে নাকি বিলেত পাঠাচ্ছ?

—কেন? হিংসে হচ্ছে নাকি?

—হবারই তো কথা। আমাকে কবে বিলেত পাঠাচ্ছ বল?

কণ্ঠে প্রচুর বিস্ময় মিশিয়ে অংশুমান বললে, তোমাকে! আমি পাঠাব!

লটি আবার হেসে উঠল: এ আবার কী কথা! তোমার কি ধারণা আমি জাহাজ কোম্পানি খুলেছি যে, আমার লোকজন যে যাবে তার ভাড়া লাগবে না?

অংশুমানের ইচ্ছা করছিল বলে, কোম্পানি আবার খুলবে কি, তুমি নিজেই তো একটি জাহাজ। একেবারে মানোয়ারী। কিন্তু বলতে সাহস করলে না। এতদূর থেকে কথাটা টেলিফোনে লটি কী ভাবে নেবে কে জানে!

বললে, মিঃ দত্ত ইচ্ছা করলে কী না হয়?

—ও! আর কী খবর বল?

অংশুমান উৎসাহের সঙ্গে বললে, অনেক খবর আছে।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ। যে খবরটা তুমি বললে সেটা একটা বড় খবরের আধখানা মাত্র। তা ছাড়া

লটি লাফিয়ে উঠল। এই শ্রেণীর খবরে তার প্রচণ্ড উৎসাহ। বস্তুত বয়স হয়ে আসছে। এখন এই নিয়েই থাকে।

বললে, বল কী! আধখানা মাত্র!

—হ্যাঁ। তা ছাড়াও মজাদার খবর আছে। কিন্তু তুমি তো পণ করেছ এ-বাড়ির ছায়া মাড়াবে না।

লটি ধমক দিলে : বাজে বোকো না। এই তো সেদিন গেছলাম।

—সেদিন মানে মাস তিনেক আগে।

—তা হবে। কিন্তু তার চেয়ে ঘন ঘন গেলে তুমি বিরক্ত হবে বলে যাই না। নইলে যেতে তো ইচ্ছে করে।

—ওঃ! সকাল থেকে খুব যে শোনাচ্ছ! আজ যে একেবারে রণমূর্তি! আসবে আজ সন্ধ্যেবেলায়?

—যাব।

—ঠিক তো? তুমি আবার আসবে বলে আস না।

লটি সহাস্যে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল : বাবা, বাবা! কবেকার একদিনের ত্রুটি তুমি এখনও ভুলতে পারলে না! যাই হোক, আমি ঠিক যাচ্ছি আজ সন্ধ্যেবেলায়।

এবং সত্যি সত্যিই এল। একেবারে ভুবনমোহিনী বেশে।

লটির বয়স চল্লিশ যদি না পেরিয়েও থাকে, তার দেরি নেই। অংশুমানের বান্ধবীরা কয়েকটি তরঙ্গে এসেছে। প্রথম তরঙ্গে যারা এসেছিল তাদেরই মধ্যে অহল্যা। এবং একমাত্র অহল্যা ছাড়া সে-তরঙ্গের আর-কারও সঙ্গে অংশুমানের এখন আর দেখাশোনা নেই। তাদের অনেককে এখন আর অংশুমান দেখলেও হয়তো চিনতে পারবে না। ঠিক মনে নেই, দ্বিতীয় কি তৃতীয় তরঙ্গে এসেছিল লটি, তখন লটি চৌধুরী। সেই লটির বয়স চল্লিশ পার হবারই কথা।

দিনের বেলায় দেখলে তার কিছুটা টের পাওয়া যায়। প্রসাধন, যত সুনিপুণই হোক, দিনে খুব কাজ করে না। কিন্তু রাত্রে লটিকে দেখলে কে বলবে সে স্বপ্নার সমবয়সী নয়!

সাধারণত লটি প্রসাধন-পরায়ণা। যাদের 'সোসাইটি গার্ল' বলা হয় তারা সকলেই তাই। বিনা প্রসাধন-পারিপাট্যে তারা ঘরের মধ্যেও থাকতে পারে না। বিশেষ যখন যৌবন অস্তগামী। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় সেই পারিপাট্য যেন উজ্জ্বলতর হয়েছে।

সে ঘরে ঢোকামাত্র অংশুমান এমন চমকে উঠল যে, লটি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, কী হল?

মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরে অংশুমান বললে, মাথাটা কী রকম ঘুরে গেল!

—ব্লাডপ্রেসার নাকি?

লটি ভয় পেয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, অংশুমানের কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে ইঙ্গিতটা ধরতে পারলে।

সলজ্জভাবে বললে, বাজে বোকো না। তুমি বড় বাজে বক, জান?

অংশুমান ওর একখানা হাত ধরে পাশে বসিয়ে বললে, সত্যি লটি, ডালিয়া ফুলের মতো দীর্ঘকাল ধরে একটির পর একটি দল তুমি মেলেই চলেছ। দলের যেন শেষ নেই। এখনও মেলে চলেছ।

কুটিল ভ্রূভঙ্গি হেনে লটি ধমক দিলে, ফের!

অংশুমান চুপ করলে। লটির জন্যে নয়। তার জন্যেই তো সে অপেক্ষা করছিল। বেয়ারাটার জন্যে। বেয়ারাকে বলাই ছিল, লটি আসতেই সে এসে পানপাত্র এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি টিপয়ে সাজিয়ে দিলে।

বেয়ারা চলে যেতে একটি পাত্রে পানীয় ঢেলে লটি অংশুমানের দিকে এগিয়ে দিলে।

অংশুমান জিজ্ঞাসা করলে, তোমার?

গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে লটি জানালে, আজকে আর চলবে না।

—সে কী! কেন?

—কারণ আছে।

—কী কারণ? তুমি যে খাও, এ তো মিঃ দত্ত জানেন।

—সেজন্য নয়। অন্য কারণ। এখান থেকে বাবা-মাকে দেখতে যাব।

—একযাত্রায় পৃথক ফল!—ক্ষুণ্ণভাবে অংশুমান বললে,—আজ আর সেখানে নাই গেলে লটি। আমি তোমাকে অনেকক্ষণ আটকে রাখতে চাই।

বোতলের লেবেলটা আড়চোখে লটি দেখছিল। দুর্লভ জিনিস, সচরাচর পাওয়া যায় না। লটির মন উসখুস করছিল।

জিজ্ঞাসা করলে, এ দুর্লভ জিনিস কোথায় পেলে ?

সহাস্যে অংশুমান বললে, তুমি একটি দুর্লভ মেয়ে। তোমারই জন্যে বহু কষ্টে সংগ্রহ করেছি। না খেলে দুঃখ পাব।

বলে লটির সম্মতির অপেক্ষা না করেই অংশুমান আর-একটি পাত্রে ওর জন্যে ঢেলে দিলে।

—তোমার পাল্লায় পড়লে আর নিস্তার নেই !

হাসতে হাসতে লটি পাত্রটা তুলে নিলে।

লটি বললে, তারপর বল।

—কার পর ?—অংশুমান জিজ্ঞাসা করলে।

—ওই যে বললে কী নাকি খবর আছে তার আধখানা আমি জানি, আর-আধখানা জানি না।

—হুঁ। এবং অন্যান্য খবর।

অংশুমান পানপাত্র নিঃশেষ করে টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখে দিলে। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বললে, স্বপ্না বিলেত যাচ্ছে। শুধু এইটে তুমি জান।

লটি বললে, হুঁ।

—জান না যে, তার সঙ্গে সীতানাথবাবুও যাচ্ছেন।

—তিনি কে ?

অংশুমান হেসে বললে, অহল্যার স্বামী।

যেন চিন্তা করে করে লটি বলতে লাগল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সীতানাথবাবু। উকিল। তোমার দৌলতে পসার নাকি ভালোই।

প্রতিবাদ করে অংশুমান বললে, ভদ্রলোকের ওপর অবিচার কোর না। আমার সাহায্য ছাড়াই তিনি নাম করেছেন। তার ওপর আমি আর-একটু বাড়িয়ে দিয়েছি। এই মাত্র।

—তিনিও যাচ্ছেন ?

অংশুমান ঘাড় নেড়ে জানালে, তাই বটে।

—স্বপ্নার সঙ্গে ?

—তা বলতে পারব না। তিনি স্বপ্নার সঙ্গে যাচ্ছেন, না স্বপ্না তাঁর সঙ্গে যাচ্ছে, না উভয়েই উভয়ের সঙ্গে যাচ্ছেন, না কেউ কারও সঙ্গে যাচ্ছেন না,

দুজনেই পৃথক-পৃথকভাবে ক্যালিডোনিয়া জাহাজে আগামী সাত তারিখে রওনা হচ্ছেন,—বলা শক্ত।

অংশুমান হাসতে লাগল।

অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, ওদের মধ্যে পরিচয় আছে তো?

—পরিচয়!—ভালো মানুষের মতো অংশুমান বললে,—সে তো আমার জানবার কথা নয়। অবশ্য প্রাথমিক পর্বটা আমার এখানেই হয়েছিল। এখন শুনছি, তোমার আমার মধ্যে যতটুকু পরিচয়, ওদের মধ্যকার পরিচয় তার চেয়ে নাকি অনেক বেশি।

—বল কী!

—হ্যাঁ।

লটি জিজ্ঞাসা করলে, স্বপ্না তো গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান না কী যেন পড়তে যাচ্ছে। ইনি যাচ্ছেন কেন?

—কিনি?

—ওই যে সীতানাথবাবু না কী যেন নাম বললে!

—হ্যাঁ। তিনিও ওই রকমই একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছেন।

—পড়তে?

—না, পড়তে নয়। পড়া বোঝাতে।

—স্বপ্নার?

এবারে অংশুমান হেসে ফেললে। বললে, দেখ কেউ কিছু করতে যাচ্ছে না। বিলেত যাচ্ছে আসলে। কিন্তু একটা উপলক্ষ্য তো দরকার। সুতরাং আমার একটা কোম্পানির টাকায় স্বপ্না যাচ্ছে সমারোহতঃ গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান পড়তে, আর অন্য একটা কোম্পানির টাকায় সীতানাথবাবু যাচ্ছেন সেই কোম্পানির একটা হারা-মামলার আপীলের জন্যে ওখানকার অ্যাটর্নিকে কাগজপত্র বোঝাতে। এইবার ব্যাপারটা সহজ হয়েছে বোধ হয়?

—যথেষ্ট সহজ হয়েছে।—লটি স্বস্তির সঙ্গে বললে,—কেবল একটা প্রশ্ন উঠছে।

—বল।

—যাহা বাহান্ন, তাঁহা বিরানব্বই। এটা তো মান?

—অবশ্য মানি।

—তা হলে এই সঙ্গে অহল্যাকেও পাঠালে না কেন? ওকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে না বলে?

অংশুমান হাসলে: সেজন্যে নয়।

—তবে? কোম্পানি টাকা দিত না?

—এদের যখন দিয়েছে তখন ওকেও দিত। উপলক্ষ্যের অভাব ঘটত না।

—তবে পাঠালে না কেন? পাঠালে মজা হত।

অংশুমান আবারও হাসলে: মজা কিছু হত। ওদের একজন অথবা দুজনই বিলেত অবধি আর পৌঁছুত না।

কৌতুকে লটির চোখ নেচে উঠল।

বললে, তোমার ধারণা ওরা দুজনে জাহাজেই মারামারি করে একজন আর-একজনকে অথবা দুজনেই দুজনকে মেরে ফেলত?

—আমার তাই ধারণা।

লটি খিল খিল করে হেসে উঠল: কিছুই হত না। দুজনে খুব ভাব হয়ে যেত।

—না।

—তুমি কী করে জানলে? আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, তাই হয়।

অংশুমান তথাপি জেদ করতে লাগল: কিন্তু ওদের তা হত না।

—কেন?

—আমার সন্দেহ হয়.

—কী সন্দেহ হয়?

—অহল্যা সীতানাথকে ভালোবাসে।

লটি উচ্ছ্বসিত হেসে উঠতেই অংশুমান ব্যস্তভাবে কথাটার মোড় ফিরিয়ে দিলে: আর একটা খবর বলি শোন। কুমার বাহাদুর ভয়ানক ঝামেলায় পড়েছেন।

—কুমার বাহাদুর কে?

—কুমার সিদ্ধিনাথ বড়গোঁহাইন। আমাদের 'বঙ্গজননী' মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

—কী ঝামেলা?

—মিসেস হিগিন্সকে জান?

—জানি বই কি। তাঁকে নিয়ে ঝামেলা?

লটি উৎসাহিত হয়ে উঠল। মিসেস হিগিন্সকে যে জানে সে মরবার সময়ও তার প্রসঙ্গে সোজা হয়ে বসবে। প্রশ্নটা করে লটিও প্রচণ্ড আগ্রহের সঙ্গে অংশুমানের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অংশুমান বললে, মিসেস হিগিন্স কুমার বাহাদুরকে চিঠি দিয়েছে যে অবিলম্বে তাকে বিবাহ করতে সম্মত না হলে ব্যাপারটা কোর্টে গড়াবে।

লটি বললে, কী সর্বনাশ! তিনবার বিয়ে করার পরেও তার বিয়ের শখ মিটল না?

—বোঝ।

চোখ পিট পিট করে লটি নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, ছেলেপুলে হবে নাকি?

—কুমার বাহাদুর সে সম্বন্ধে আলোক-সম্পাত করতে পারলেন না। তিনি কিছুই জানেন না। এমন কি, ওর যে আর দুবার বিয়ে হয়েছিল, তৃতীয় স্বামী মাত্র কয়েক মাস পূর্বে মারা গেছেন, তাও জানতেন না।

অংশুমান হাসতে লাগল।

লটি বললে, আশ্চর্য মানুষ তো?

—হ্যাঁ।

—এখন তিনি কী করবেন?

—তিনি কিছুই করবেন না। যা কিছু কাজ সে আমাকেই করতে হবে।

—তবে আর ভাবনা কী?

লটি হাসতে লাগল।

অংশুমান বললে, ভাবনা আছে। কারণ ওদিকেও মিসেস হিগিন্সের মতো বিবাহ-বিশারদ। আমি সকালে তাকে ফোন করেছিলাম। তার আসবার সময় হল।

ব্যস্তভাবে লটি বললে, তবে আমাকে মিছিমিছি আটকে রেখেছ কেন? আমি উঠি।

উঠতে যাচ্ছিল, অংশুমান ওর হাত ধরে বসাল।

বললে, না। সেই জন্যেই বিশেষ করে তোমাকে আটকে রেখেছি।

—আমি কী করব?

অংশুমান বললে, তুমি এইখানে বসে থাকবে। ওকে অন্য ঘরে বসাব।

—তারপরে?

—আবশ্যকমতো তোমার পরামর্শ নোব।

—আমার!

—হ্যাঁ দেবী, নিজেকে সামান্য মনে করো না। মনে হয় তোমার পরামর্শের প্রয়োজন হবে।

বলতে বলতেই বেয়ারা এসে খবর দিলে, মিসেস হিগিন্স।

কোথায় তাকে বসাতে হবে সে নির্দেশ দেওয়াই ছিল।

উঠতে উঠতে অংশুমান বললে, পালিয়ো না যেন।

বলে যে ঘরে মিসেস হিগিন্সকে বসানো হয়েছে সেই ঘরে চলে গেল।

প্রচুর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অংশুমান ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, গুড ঈভনিং মিসেস হিগিন্স।

বলেই একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে।

—গুড ঈভনিং।

মিসেস হিগিন্সকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল। অংশুমানের উদ্দেশ্য সে টের পেয়েছে নাকি?

বেয়ারা এ-ঘরেও আবার পানপাত্র সাজিয়ে দিলে। পানে মিসেস হিগিন্সের কখনই ক্লান্তি আসে না। পানশক্তি অসাধারণ।

একথা-সেকথার পরে যখন মিসেস হিগিন্সের কঠিন মুখভাব কিছুটা স্বাভাবিক হল, তখন অংশুমান কথাটা পাড়লে:

—এর মধ্যে একদিন সকালে কুমার বাহাদুর এসেছিলেন।

মিসেস হিগিন্স তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে গেল। পানপাত্র মুখে তুলছিল। ঠোঁটের কাছ থেকে সেটা নামিয়ে রাখলে।

জিজ্ঞাসা করলে, কী বলছিলেন?

—মিলের একটা ব্যাপার নিয়ে এসেছিলেন। তারপরে তোমার কথাও উঠল।

—আমার কী কথা?

—চিঠির কথাটা তুললেন।

—দেখেছ চিঠিখানা?

—দেখলাম।

মিসেস হিগিন্স ধীরে ধীরে পানপাত্রটা আবার মুখে তুলতে তুলতে তার

ফাঁক দিয়ে অংশুমানের দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে জিজ্ঞাসা করলে, কী বলে ?

—বলে ? তুমি কোনো চিঠি পাও নি ?

—না। আমি প্রতিদিন প্রত্যাশা করছি।

অংশুমান বললে, ওর কথা ছেড়ে দিয়ে আগে আমার নিজের কথা বলি।

—বল।

—তোমার চিঠি আমি নিজে খুব 'সিরিয়সলি' নিই নি।

মিসেস হিগিন্স ভ্রূকুঞ্চিত করলে : নাও নি কেন ? না নেবার কী আছে ?

অংশুমান বুঝলে, খুব শক্তর পাল্লায় পড়েছে সে। খুব সতর্কভাবে ওজন করে কথা বলতে হবে তাকে। মনের এই অস্বস্তি ঢাকবার জন্যে একটু হাসলে।

হেসে বললে, তুমি চতুর্থবার বিয়ে করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ, এটা আমি ভাবতে পারছি না। আমি তোমার পুরনো বন্ধু। আমাকে স্পষ্ট করে বলবে, তুমি সত্যি কী চাও ?

মিসেস হিগিন্স একটুক্ষণ নিঃশব্দে কী যেন ভাবলে। হাত বাড়িয়ে পান-পাত্রটা নিয়ে এক নিশ্বাসে সেটা গলায় ঢেলে দিলে। তারপর সেটাকে নামিয়ে রেখে ওর দিকে চাইলে।

বললে, তোমার ধারণা, বিয়েটা ভয়-দেখানো মাত্র, আসলে আমি মোচড় দিয়ে কিছু টাকা বের করে নিতে চাই। এই তো ?

অংশুমান হাঁ-না কোনো উত্তর দিলে না।

মিসেস হিগিন্স বললে, টাকা তো ও অনেক দিয়েছে। যখনই চেয়েছি 'না' বলে নি। তার জন্যে মোচড় দেবার তো দরকার ছিল না।

—তবে ?

—কী তবে ? কেন মোচড় দিচ্ছি ? মোচড় দিই নি তো। টাকা আমি চাই না। আমি ওকেই চাই। ওকে বিয়ে করতে।

—কেন ?

বাঁ হাত দিয়ে মিসেস হিগিন্স ডান হাতের কড়ে আঙুলের একটা পাব ধরে বলতে লাগল : প্রথমত, এবং সেইটেই সব চেয়ে বড় কারণ, ওকে আমি ভালোবাসি।

কী সর্বনাশ !

দ্বিতীয় পাবটা ধরে ফের বললে, দ্বিতীয়ত, স্বামী ছাড়া আমার চলবে না। ওটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। আমার একটা স্বামী চাই। আর ওর মতো ভদ্র উদার স্বামী আমি কোথায় পাব?

বিস্ময়ে অংশুমানের চোখ কপালে উঠেছে, চুল সোজা দাঁড়িয়ে পড়েছে।

কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মিসেস হিগিন্স বলে চলেছে:

—তোমাকে বলি, চার্লির মৃত্যুর পর এই ছ'টা মাস আমি একটি ঘণ্টার জন্মেও ক্লাবে যাই নি। একটি দিন জুয়া খেলি নি। একটি ফোঁটা মদ স্পর্শ করি নি। ছ'মাস পরে তোমার এখানে, এবং শুধু তোমার এখানে বলেই, আজ প্রথম মদ্যপান করলাম। কুমার বাহাদুরের সঙ্গেও একদিন দেখা করি নি। স্রেফ ঘরে বসে কাটিয়েছি। আমি সুনিশ্চিত বুঝেছি যে, বিয়ে না করলে আমি বাঁচব না। তাই কুমার বাহাদুরকে চিঠি দিয়েছি। টাকার জন্মে নয়।

ওর কথার মধ্যে এতটুকু অসংযম নেই, চাপল্যও নেই। কণ্ঠস্বর দৃঢ়, গম্ভীর কিন্তু স্নিগ্ধ। এ সমস্তই কি অভিনয়? তা যদি হয়, ওর বাহাদুরি আছে। এর চেয়ে নিখুঁত অভিনয় অংশুমান কল্পনা করতে পারে না।

অংশুমান, সার্ অংশুমান, হতচকিত হয়ে গেছে। স্তব্ধভাবে ওর শান্ত গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

হঠাৎ অংশুমান হো-হো করে হেসে উঠল।

মিসেস হিগিন্স চমকে ওর মুখের দিকে চাইলে: কী হল? হাসছ যে!

সিগারেটের টিনটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে অংশুমান বললে, দেখছি দুই পাগলের মধ্যে পড়ে আমি মারা যাব।

ভ্রূকুটি করে মিসেস হিগিন্স জিজ্ঞাসা করলে, তার মানে?

—তার মানে তোমরা দুজনে দুটি পাগল! বদ্ধ পাগল!

—কী করে?

দেশলাই জেলে ওর সিগারেটটা অংশুমান ধরিয়ে দিলে। নিজেরটিও ধরালে। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাল্কাভাবে বললে, পাগল ছাড়া আর কী বলব বল?

মিসেস হিগিন্স উৎসুক নেত্রে নিঃশব্দে ওর দিকে চেয়ে রইল।

অংশুমান বললে, দুজনেই সমান পাগল। সেও বিয়ে করবার জন্মে ব্যাকুল। ভালোবাসার কথা বলে। কিছুতে বোঝাতে পারি নে, এই বিয়েটা দুজনের পক্ষেই অসুখের কারণ হবে।

—কেন ?

সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে অংশুমান বললে, কেন বললেই কি বুঝবে ? তাকে বোঝাতে পারি নি, তোমাকেই কি পারব ?

—তা হোক। তবু বল।

অংশুমান শান্তভাবে বলতে লাগল :

—কুমার বাহাদুরের সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। ও হল আসামের একটি অতি প্রাচীন রাজবংশের সন্তান। বাপের একমাত্র সন্তান। তার অবর্তমানে ওই রাজা হবে। আমার কাছে এসেছিল অবশ্য তোমার ব্যাপার নিয়ে। ওর বাপের শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। শেষ ক'টা দিন একমাত্র সন্তানকে কাছে রাখতে চান। তুমি জান বোধ হয়, আমাদের 'বঙ্গজননী' মিলের কুমার বাহাদুরই ম্যানেজিং ডিরেক্টার। ওর অনুপস্থিতিতে তারই একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে এসেছিল।

এখন কথা হচ্ছে, ওর আরও তিনটে স্ত্রী বর্তমান।

মিসেস হিগিন্স লাফিয়ে উঠল। সভয়ে বললে, বল কী !

নিস্পৃহভাবে অংশুমান বললে, হ্যাঁ। ও তো কম বিয়ে করেছে। ওর বাবার তেরোটি রানী। পিতামহের ছিল তেইশটি। ওইটেই ওদের দস্তুর। তোমাকে নিয়ে ওর চারটে রানী হবে। সে এমন কিছু নয়। কিন্তু কয়েকটি বাধা আছে যা ধীরভাবে বিবেচনা করতে হবে।

মিসেস হিগিন্স সাড়া দিচ্ছে না। নিঃশব্দে বিমূঢ়ভাবে শুনে যাচ্ছে।

অংশুমান বলে চলেছে :

—প্রথম বাধা হচ্ছে ওর বাপ, বৃদ্ধ রাজা, অত্যন্ত নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিন্দু। তাঁর জীবিতকালের মধ্যে তোমাকে বিয়ে করলে কুমার বাহাদুরকে রাজ্য লাভের আশা পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু কুমার বাহাদুর তার জন্যে প্রস্তুত।

দ্বিতীয় বাধা হচ্ছে, বাপের মৃত্যুর পরেও যদি বিয়ে করে, ওদের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী তা হলেও একই পরিণাম অনিবার্য। কুমার বাহাদুর তারও জন্যে প্রস্তুত।

কিন্তু তা হলে তোমরা চালাবে কী করে ?

প্রেমের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ খুব মহৎ জিনিস। কবিরা বাহবা দেবে। হয়তো অনেকে কাব্য রচনা করবে। কিন্তু শুধু চাঁদের আলো পান করে তো প্রেমও বাঁচতে পারে না।

আমি আইনজ্ঞদের জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাঁরা বললেন,

(অংশুমান লক্ষ্য করলে, এই কথায় মিসেস হিগিন্স একটু চঞ্চল হয়ে উঠল।)

তাঁরা বললেন, বর্তমান রাজা বাহাদুরের মৃত্যুর পরে,—আগে নয়, রাজা বাহাদুর সম্মতি দেবেন না,—মৃত্যুর পরে তোমাকে হিন্দুধর্মে শুদ্ধি করিয়ে হিন্দুমতে বিবাহ করলে রাজ্যত্যাগ করতে হয় না।

(মিসেস হিগিন্স রুদ্ধ নিশ্বাসে অংশুমানের কথা শুনে যাচ্ছে। এইখানে তার গলার কাছটা একবার যেন নড়ে উঠল। বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারলে না, আটকে গেল।)

এইখানে আমি আর কুমার বাহাদুর একমত হয়েছি যে, বর্তমান রাজা বাহাদুরের মৃত্যুর পরে, মনে রেখো আগে নয়, তুমি শুদ্ধি করে হিন্দু হলে হিন্দুমতে তোমাদের বিয়ে হবে। রাজা বাহাদুরের সত্তর-বাহাত্তর বয়স হল। আর কদ্দিনই বা বাঁচবেন তিনি? দু বৎসর, তিন বৎসর, কি বড় জোর পাঁচ বৎসর। তিনি মারা গেলেন, তোমাদেরও বিয়ে হল। কিন্তু

(মিসেস হিগিন্সের কাগজের মতো সাদা মুখে ধীরে ধীরে রক্তস্রোত আসছিল। কিন্তুর ধাক্কায় আবার পিছিয়ে গেল।)

এই কিন্তুর কথাটাই ভাববার। কুমার বাহাদুরের কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তোমার আছে। সেইগুলো এখনই খুব ধীরভাবে বিবেচনা করা দরকার। বিবাহের পরে আর সময় থাকবে না।

বলে এমন কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে অংশুমান চাইলে যে, একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় ওর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

অংশুমান বললে, ওদের বংশটা গোঁড়া হিন্দু বৈষ্ণবের বংশ। পুরুষেরা বাইরে যত কিছু অনাচার করুক, অন্দরে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবাচার। অর্থাৎ মাছ-মাংস-ডিমের প্রবেশ বন্ধ।

এতক্ষণ পরে মিসেস হিগিন্সের কণ্ঠ থেকে বাক্য নিঃসরণ হল: My God!

—হ্যাঁ। মেয়েরা যে মদ খায়, সে কথা ওরা শোনেও নি জীবনে।

আবার আওয়াজ হল: Good Heavens!

—হ্যাঁ। আর সেই যে অন্দরের জেলখানায় বিয়ের পোশাক পরে একদিন তোমার দেহটা ঢুকল, আর এক দিন ফুলে-ঢাকা খাটে শুয়ে সেই দেহটা বেরুবে।

স্খলিত কণ্ঠে মিসেস হিগিন্স জিজ্ঞাসা করলে, খাটে শুয়ে কেন?

—কারণ হিন্দুর মৃতদেহ অমনি করেই নিয়ে যায়।

—My goodness!

কট মট করে চেয়ে অংশুমান বললে, হ্যাঁ। ভালো করে ভেবে দেখ। পারবে?

—না।

টলতে টলতে উঠে মিসিস হিগেন্স বললে, কুমার বাহাদুরকে বোলো আমার দাবি আমি প্রত্যাহার করে নিলাম। সে মুক্ত।

মিসেস হিগিন্স টলতে টলতে চলে যেতেই লটি এসে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তার হাসি। তরঙ্গিত একটানা হাসি। সে হাসি আর থামে না।

—কী হল? হাস কেন? থাম, থাম।

আরও কিছুক্ষণ পরে হাসি থামল। বললে, হাঁা। একখানা অভিনয় দেখ াম বটে। জীবনে ভুলব না।

অংশুমান জয়গৌরবে হাসছিল। বললে, একখানা অভিনয়, না দুখানা?

—একখানা। তোমার।

—আর ওরটা?

লটি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, ওরটা অভিনয় বলে মনে হল না। ওই জানলার ফাঁক দিয়ে আমি শুধু সব শুনিছি নয়, সব দেখেছিও। মিসেস হিগিন্স আমাকে অবাক করে দিয়েছে।

অংশুমান আবার জিজ্ঞাসা করলে, তুমি বলছ ওটা অভিনয় নয়?

—মনে তো হল না।

—অর্থাৎ কুমার বাহাদুরকে ও সত্যিই ভালোবাসে?

—অসম্ভব কী?

—এবং,—অংশুমান এবারে হেসে ফেললে,—স্বামীও অভ্যাসে দাঁড়ায়? বাইরে যত বন্ধুই থাক্‌, বাড়িতে একটি স্বামী না থাকলে জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে?

—তুমি এটা বিশ্বাস কর না?

—পুরুষের বেলায় করি। আমার একটি প্রজাপতি-মার্কা বন্ধুকে জানি

যার বাইরে ওড়ার কামাই নেই, আবার একটি করে স্ত্রীবিয়োগ হচ্ছে আর একটি করে নতুন দারপরিগ্রহ করছেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেন না। হেসে বলেন, বিয়ে তো করলেন না। আপনি বুঝবেন না।

লটি বললে, পুরুষের বেলায় বিশ্বাস কর, মেয়েদের বেলায় কর না কেন?

—কী জানি। বোধ হয় কখনও এ-রকম কথা শুনি নি বলে। বোধ হয় মেয়েদের সম্বন্ধে এ রকম ভাবতে অভ্যস্ত নই বলে।

লটি টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরালে। দেশলাইটা নিবিয়ে ফেলে দিয়ে বললে, গুড নাইট। আমি চললাম। Wi.h you happy dreams.

অংশুমান 'শুভরাত্রি' জানিয়ে বললে, Happy dreams? কী জানি, আজ সারারাত বোধ হয় মিসেস হিগিন্সের মুখখানাই স্বপ্ন দেখব। মুখখানা দেখলে? যেন বুকে তীর বিঁধেছে। যন্ত্রণায় মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

হেসে ফের বললে, যাই বল, ভালোবাসা ছাড়া আর-কিছুই তোমাদের জব্দ করতে পারে না।

লটি কিন্তু সে প্রশ্নের আর জবাব দিলে না। আর-একবার 'শুভরাত্রি' জানিয়ে অন্যমনস্কভাবে চলে গেল।

কিন্তু তখনই আবার ফিরে এল।

অংশুমান বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আবার ফিরলে যে! কিছু ফেলে গেছ নাকি?

—না, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম। কুমার বাহাদুরের পারিবারিক ব্যবস্থা কি সত্যিই অমনি মধ্যযুগীয়?

অংশুমান হেসে বললে, তা আমি কী করে জানব?

—তবে বললে যে ওঁর তিনটে স্ত্রী!

—মিথ্যে কথা। যতদূর জানি, উনি বিপত্নীক। কয়েকটি ছেলে মেয়ে আছে। আর বিয়ে করেন নি।

—আর ওঁর বাপের তেরটি?

—সেও মিথ্যে।

—আর অন্দরে কড়া পর্দা? তাঞ্জামে চড়ে বিয়ের দিন সেই যে বউরানী অন্দরে ঢুকলেন,

বাধা দিয়ে অংশুমান বললে, সমস্ত মিথ্যে। জিজ্ঞেস করবে, কেন মিথ্যে

বললাম? বল তো, তা ছাড়া মিসেস হিগিন্সের মতো মেয়েকে হটাতে পারতাম?

বিস্ময়ে লটির চোখ কপালে উঠল: কী সাংঘাতিক মানুষ!

অম্লানবদনে অংশুমান বললে, উপায় কী বল! বন্ধুকৃত্য করতে গেলে,

লটি চলে যাওয়ার পর অংশুমান কুমার বাহাদুরকে টেলিফোন করলে। জানিয়ে দিলে, খবর ভালো বলেই মনে হচ্ছে। মিসেস হিগিন্স এসেছিল। এইমাত্র চলে গেল। কাল সকালে অংশুমানের সঙ্গে কথা না বলে সে যেন মিসেস হিগিন্সের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা না করে। অংশুমানের আশঙ্কা, মিসেস হিগিন্স কুমার বাহাদুরকে আজ রাত্রেই কিংবা কাল সকালে টেলিফোন করতে পারে।

কুমার বাহাদুর অত্যন্ত খুশি হয়ে গেল। বললে, সে বেয়ারাকে নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছে, মিসেস হিগিন্স ফোন করলে জানিয়ে দেবে কুমার বাহাদুর শুয়ে পড়েছেন। বাস্।

কিন্তু এ সংবাদে কুমার বাহাদুর যতখানি খুশি হল, অংশুমান ততখানি খুশি হল বলে মনে হল না। সে তখনই শুতে গেল না। পানপাত্রে আরও খানিকটা মদ ঢেলে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে লাগল।

হঠাৎ এক সময় অংশুমানের মনে হল, অহল্যাকে একটা ফোন করলে কেমন হয়? কিন্তু এত রাত্রে আর ফোন করলে না।

দুপুরে টেলিফোনটা বেজে উঠল। অহল্যা নিঃসন্দেহ যে, এ টেলিফোন শারু অংশুমানের কাছ থেকে আসছে। একবার মনে হল, ফোন ধরবে না। বেজে চলুক অনন্ত কাল। কিন্তু শেষ অবধি পারলে না। রিসিভারটা তুললে।

—অহল্যা? কেমন আছ?

—ভালো।

—শুনলাম, শরীরটা নাকি ভালো যাচ্ছে না?

—ভুল শুনেছ।

—তা হবে। আর কী খবর বল?

—আর তো সব ভালোই খবর। শুনেছ, উনি বিলেত যাচ্ছেন?

বলতে গিয়ে অহল্যার ঠোঁটের কোণে একটা শাণিত হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল।

অংশুমান যেন আকাশ থেকে পড়ল : বিলেত? তাই নাকি? সেখানে কী?

—কী নাকি একটা মামলা নিয়ে। এখন তো উকিল হিসেবে খুব নাম হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, শুনেছি খুব ভালো উকিল হয়েছেন।

—হ্যাঁ। নাইবার-খাবার সময় পান না।

—কবে যাচ্ছেন?

—সাত তারিখে।

—তাই নাকি। ভালোই হল আমাদের অফিসের একটি মেয়েও ওই তারিখে যাচ্ছেন। তুমি জাহাজের নাম জান?

—তোমাদের অফিসের একটি মেয়ে? সেও মামলা নিয়ে নাকি?

অংশুমান হেসে ফেললে। বললে, না। তিনি মামলা নিয়ে যাচ্ছেন না। পড়তে যাচ্ছেন। স্বপ্না হালদার। চমৎকার মেয়েটি। তুমি জাহাজের নাম জান না, না?

—না। আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর রাখি না।

—সাত তারিখে ওই একটা জাহাজই ছাড়ছে,—ক্যালিডোনিয়া। সুতরাং ওঁরা এক জাহাজেই যাচ্ছেন মনে হয়।

—ভালোই হল। সঙ্গে মেয়েরা থাকলে অনেক সুবিধা হয়।

—তা হয়, অনেক সুবিধা হয়।

এবার অংশুমানের ঠোঁটের কোণে হাসি খেলে গেল। কিন্তু অহল্যা তো তা দেখতে পেলে না।

অংশুমান আবার বললে, নামটা মনে থাকবে? স্বপ্না হালদার। সীতানাথ-বাবুকে বোলো। বম্বে মেলেই খুঁজে নিতে পারবেন। আমিও মিস্ হালদারকে বলব। পরস্পর-পরস্পরকে খুঁজে নিতে পারবেন।

—তা পারবেন।

—যেতে কম সময় তো লাগে না। তবু গল্প করতে করতে যেতে পারবেন। অপরিচিত পরিবেশ। তারপরে সমুদ্র-পীড়া আছে।

—আছেই তো। উনি এলে বলব।

অহল্যা গুম হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল যুদ্ধে তার হার হয়ে গেল। অংশুমানের সঙ্গে যুদ্ধে বরাবরই সে হেরেছে আজ নতুন কিছু নয়। কত তার বুদ্ধি, কত প্রতাপ, কত সুযোগ!

অহল্যা হেরে গেছে। একে অংশুমান স্বয়ং। তারপরে নতুন জুটল স্বপ্না হালদার।

কে এই স্বপ্না? এর নাম কখনও শুনেছে বলে অহল্যা স্মরণ করতে পারল না। দেখে নি তো নিশ্চয়। কিন্তু নাই দেখুক, আর নাই শুনুক, সে আছে জল-জ্যান্ত। এবং সীতানাথের সঙ্গে এক জাহাজে বিলেত যাচ্ছে।

অংশুমান অনর্থক তাকে বলে নি। অংশুমানের সূত্র থেকে দুজনেই যখন যাচ্ছে, স্বপ্নার নামটা অহল্যাকে শোনাবার জন্যেই অংশুমান বলেছে, সীতানাথকে শোনাবার জন্যে নিশ্চয়ই নয়।

অহল্যা হেরে গেল।

রাত্রে তার কিছু খাবার ইচ্ছে হল না। শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না। ঝিয়ের জেদাজিদিতে একটুখানি দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ল।

রাত্রে সীতানাথ কখন এসেছে টের পায় নি। ভোরে কখন উঠে গেছে তাও না। অফিস যাওয়ার মুখে সীতানাথের সঙ্গে একবার দেখা হল।

অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, কেনাকাটি শেষ হয়েছে?

—কিছু কিছু।

—আর তো সময় নেই।

—না। একটা ছুটির দিন না পেলে শেষ হবে না।

—তোমার জাহাজের নাম কী?

—ক্যালিডোনিয়া।

এই নামটাই অংশুমান করেছিল। ক্যালিডোনিয়া।

অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, চেনা লোক কেউ যাচ্ছে না?

—কী জানি! জাহাজে না উঠলে বোঝা যাবে না। কেন বল তো?

—থাকলে ভালো হয়। গল্প করতে করতে যেতে পায়।

অহল্যা আর-কিছু বললে না। সীতানাথ বেরিয়ে গেল।

॥ পনেরো ॥

সাত তারিখে সীতানাথ চলে গেল। অহল্যা হাওড়া স্টেশনে তাকে তুলে দিয়ে চলে এল। ছেলে মেয়েরাও গিয়েছিল। কিন্তু একবারও তার কৌতূহল হল না, কোন্‌টি স্বপ্না হালদার জানার। অন্তত আন্দাজ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো দিকে চেয়েই দেখল না সে।

ফিরে আসার পরে তার একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তন দেখা গেল।

সাধারণত সে অলস, গম্ভীরপ্রকৃতির। তার কর্মশক্তি কী জানি কেন বেড়ে গেল। আগে ঠাকুর চাকর আসত তার কাছে নির্দেশ নিতে। এখন সে ভোরে শয্যা ত্যাগ করে। নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে ঠাকুর চাকরকে আবশ্যকীয় নির্দেশ দেয়। রাত্রে ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষক আসেন। সকালের পড়াটা অহল্যাই বুঝিয়ে দেয়।

তার যেন সমস্ত বিষয়ে উৎসাহ বেড়ে গেল। সংসারের সমস্ত কিছু সে নিজে দেখে। অনেক কিছু নিজেই করে।

এর মধ্যে একদিন দাদার বাড়ি বেড়াতে গেল।

সন্ধ্যার পর।

দেখলে, নিচের বৈঠকখানা-ঘর সাজানো হয়েছে খুব জমকালো করে মেঝেয় ঝকঝকে ফরাস পাতা। এক প্রান্তে মাঝখানে মখমলের প্রশস্ত আসন। সামনে ফুলদানি দুটিতে ফুলের তোড়া।

—কী ব্যাপার বউদি? কারও বিয়ে নাকি?

অহল্যা অবাক হয়ে গেছে।

সুজাতা হেসে বললে, না না। বিয়ে কিসের? বিয়ে হলে তুমি জানতে পারতে না?

—তা হলে? কী ব্যাপার?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সুজাতা বললে, তোমার কি তাড়া আছে ঠাকুরঝি? একটু রাত্রি অবধি থাকতে পারবে না?

—কেন বল তো?

সুজাতা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে।

তাদের গুরুদেব আসবেন। নাম তাঁর দয়ানন্দ স্বামী। এই কলকাতায় তাঁর অনেক শিষ্য-শিষ্যা। প্রতি পূর্ণিমায় তিনি একজন শিষ্যের গৃহে আসেন। অন্য শিষ্যেরাও সেদিন সেখানে সমবেত হয়। সেখানে ধর্মানুশীলন হয়। আজ অহল্যার দাদার বাড়ি অধিবেশন। অহল্যাকেও থাকবার জন্য বউদি অনুরোধ করলে।

অহল্যার দাদা ইন্দ্রনাথ বাবার প্রকৃতি পেয়েছে। অহল্যার বাবারও একজন গুরু ছিলেন। তাঁরও ধর্মসভায় যোগ দেবার আগ্রহ ছিল। ইন্দ্রনাথ সেই রকম হয়েছে। তা সে যাই হোক, গুরুদেব অহল্যার কাছে নতুন কিছু নয়। ধর্মসভাও তাই। ভাবলে, অনেক দিন এ সবের থেকে দূরে রয়েছে। হাতে কাজও কিছু নেই। দেখাই যাক না, কেমন গুরুদেব।

সুজাতা আবার জিজ্ঞেস করলে, থাকবে?

—মন্দ কী! থাকব বরং। তুমি শুধু আমার বাড়িতে একটা ফোন করে দাও, আমার ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।

তাই হল। একে একে শিষ্যদের আবির্ভাব হতে লাগল। অহল্যা দেখলে, অধিকাংশ শিষ্যই ধনী বৃদ্ধ। তাঁদের মস্ত বড় বড় গাড়ি। কিছু সংখ্যক মধ্যবিত্ত গৃহস্থও আছেন। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় অল্প।

গুরুদেব এলেন যে গাড়িতে সে একটা বিরাট ব্যাপার। যেমন গাড়ি, তেমনি গুরুদেব। বিশাল বপু। কাঁচা সোনার মতো রঙ। ঢুলু-ঢুলু আয়ত নেত্র। তার উপর সোনার চশমা। মুণ্ডিত মস্তক। ক্ষৌরীকৃত গুম্ফ-শ্মশ্রু। পরিধানে সিল্কের গেরুয়া বস্ত্র, গেরুয়া পাঞ্জাবি এবং উত্তরীয়। পায়ে হরিণের চামড়ার চটি।

তিনি ঘরে প্রবেশ করা মাত্র উপস্থিত নরনারী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে। নিজের আসনে বসে তিনি প্রত্যেকের কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। সর্ব শেষে চোখ পড়ল অহল্যার উপর।

—এঁকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না তো?

সুজাতা তাড়াতাড়ি পরিচয় দিলে: আমার ননদ।

—ও!

সেদিন গুরুদেবের বক্তব্য ছিল: দুঃখবাদ।

দুঃখ কাকে বলে। তার জন্ম কোথায়। নিবৃত্তিই বা কিসে। এই নিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল তিনি বলে গেলেন। কত শাস্ত্র থেকে কত শ্লোক

তিনি উদ্ধৃত করলেন, তার ইয়ত্তা নেই। সুমধুর কণ্ঠ, সুদর্শন রূপ এবং আরও একটা কিছু—এই তিনের সমন্বয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করবার তাঁর অসাধারণ শক্তি জন্মেছে। শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে।

অহল্যাও।

দেড় ঘণ্টা পরে তিনি যখন থামলেন, তখনও শ্রোতৃমণ্ডলীর মোহ কাটে নি। একটা আশ্চর্য নৈঃশব্দের মধ্যে আরও কয়েক মুহূর্ত গেল। তারপর, যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে, একে একে সকলে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে লাগল। আরও কিছুক্ষণ পর ঘর নির্জন হয়ে গেল।

অহল্যা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে স্বামীজিকে প্রণাম করলে।

বললে, আপনার ভাষণ বড় সুন্দর লাগল। বাসনা থেকে দুঃখের জন্ম। বাসনা ত্যাগ করতে পারলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। এ তো বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব, না?

স্বামীজি হাসলেন: তত্ত্বের কি জাত আছে মা? তত্ত্ব তত্ত্ব,—হিন্দুও নয়, বৌদ্ধও নয়, কৃশ্চানও নয়।

অপ্রস্তুতভাবে হেসে অহল্যা বললে, তাই বটে। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, বাসনা ত্যাগ করা যায়?

—কেন যাবে না মা? বাসনা তো জীবনের চেয়ে বড় নয়। বাসনা তো জীবনকে ঘিরেই। সেই জীবনই যখন ত্যাগ করা যায়, তখন বাসনা ত্যাগ করা যাবে না?

—সকলেই কি বাসনা ত্যাগ করতে পারে?

স্বামীজি এবারও হাসলেন। স্নিগ্ধ মধুর হাসি। বললেন, সকলের কথা তো জানি নে মা। আমি হয়তো পারি না, তুমি হয়তো পার।

এবারে অহল্যা নিজের কথা পাড়লে: আমি বড় দুঃখী বাবা!

—কে নয় মা? সবাই দুঃখী। কিন্তু দুঃখে ভয় পেলে তো চলবে না, তাকে জয় করতে হবে।

—কী করে জয় করা যায়?

—বাসনা ত্যাগ করে।

অহল্যা আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, এমন সময় সুজাতা এল: স্বামীজির খাবার দেওয়া হয়েছে। অহল্যার দিকে চেয়ে সুজাতা ডাকলে, তুমিও এস না ঠাকুরঝি। ওঁর খাবার কাছে বসে বসে গল্প করবে বরং।

—না বউদি। রাত হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা ভাববে হয়তো। আজ আমি যাই।

স্বামীজিকে আর একবার প্রণাম করে অহল্যা গাড়িতে গিয়ে উঠল।

স্বামীজিকে অহল্যার খুব ভালো লাগল।

ফেরবার পথে বাড়ি ফিরেও অনেক রাত্রি পর্যন্ত অহল্যা তাঁরই কথাই ভাবল। তার মনে হল, বর্তমান দুঃখজীর্ণ জীবনে এমনি একটি ব্যক্তিকেই যেন সে অজ্ঞাতসারে খুঁজছিল এবং তাঁকে পেয়েও গেল যেন দৈবনির্দিষ্ট ভাবে।

আজ তার দাদার বাড়ি যাবার কথা ছিল না। দাদার যে একজন গুরুদেব আছেন এবং আজকেই তিনি আসবেন এও সে জানত না। বিকেলে হঠাৎ তার কী মনে হল, দাদার বাড়ি চলে গেল।

মনে হল কী করে? হঠাৎ। কে যেন তাকে ডাক দিলে। অমোঘ সে ডাক। তাকে শিকল দিয়ে যেন বেঁধে নিয়ে গেল। ইচ্ছা অনিচ্ছা, ভালো লাগা না-লাগার প্রশ্ন উঠল না। গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল যেন অন্য কারও হাতে। অন্য কারও। যাঁর হাতে সংসারের সমস্ত স্টিয়ারিং হুইল। দেখা পাওয়া গেল সেই লোকের, যাঁকেই তার সব চেয়ে প্রয়োজন।

কী রূপ! কী চোখের দৃষ্টি! কী সুন্দর কণ্ঠস্বর!

কিন্তু বাসনা কি সত্যই ত্যাগ করা যায়?

আচ্ছা, ধরা যাক তার কী বাসনা হয়েছে: বড় বাড়ি নয়, বড় গাড়ি নয়, কিছু নয়। সে চাইছে, সীতানাথ অংশুমানের মন্দ প্রভাব থেকে মুক্ত হোক। গৃহস্থের সংসারে সুখে-দুঃখে মানুষের যেমন করে দিন কাটে, ছেলেপুলে নিয়ে তাদের দিনও তেমনি করে কাটুক। স্বপ্না হালদারের (ভগবান জানেন মেয়েটি কে এবং সীতানাথের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক) প্রভাব থেকেও (যদি অবশ্য থাকে) সীতানাথ মুক্ত হোক।

একে কি বাসনা বলা যায়? স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়।

তার পরে যদি একে বাসনা বলাই যায়, এর কোন্‌টিকে সে ত্যাগ করতে পারে? অংশুমান এবং স্বপ্না হালদারের কুপ্রভাব থেকে স্বামীর মুক্তি সে চাইবে না? ভেসে যাবে সীতানাথ? নষ্ট হয়ে যাবে?

অহল্যা আপন মনেই ঘাড় নাড়লে: তা কিছুতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু কেন সম্ভব নয়? সীতানাথ তার কে? সে কি সীতানাথের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি? এখন সীতানাথ যদি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার অভিযোগ করার কী আছে?

অহল্যার মন এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে দমে গেল। অতি সূক্ষ্ম অনুভূতির যে সব অদৃশ্য তার বাইরের আকাশের সঙ্গে মনের সংযোগ সাধন করেছে, সেগুলো যেন শুব্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু তখনই তার মন আবার শক্ত হয়ে উঠল।

বিশ্বাসঘাতকতা নয়। ভালোবাসায় সে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্নও তাই সেখানে ওঠে না। তার উদ্বেগ স্বপ্নাকে নিয়েও নয়। স্বপ্না কে? খুব সম্ভব অংশুমানের হাতের খেলনা মাত্র। এবং স্বপ্নাকে নিয়ে যেটুকু তার উদ্বেগ, সে এই জন্যেই যে সে অংশুমানের হাতের খেলনা। চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের কাছ থেকে আলো ধার করে সে ঝকমক করে।

অংশুমান সূর্য, স্বপ্না চাঁদ।

আর সীতানাথ কে? চকোর? অহল্যা আপন মনেই হেসে ফেললে। কে জানে সে কে?

বাসনা ত্যাগের কথা নয়, যদি অংশুমানকে সে একবার দেখে নিতে পারত! তাকে হারাতে পারত! কিন্তু অংশুমান অত্যন্ত শক্তিশালী। তাকে কেউ হারাতে পারে না। অহল্যা তো নয়ই। অহল্যা স্বপ্নার মতো তার হাতের পুতুল নয়। কিন্তু তারই সৃষ্টি তো?

অহল্যা স্বপ্নার মতো চাঁদ নয়। অংশুমানের কাছ থেকে ধার-করা আলোয় উজ্জ্বল নয়। তার নিজস্ব একটা আলো আছে। কিন্তু সে মাটির প্রদীপের আলো। টিম টিম করে। তা নিয়ে সূর্যকে হারানো যায় না।

অহল্যার সমস্ত শরীর নিশপিশিয়ে উঠল: কিন্তু যদি কোনো রকমে তাকে হারানো যেত! যদি কোনো রকমে!

কিন্তু কী রকমে?

অহল্যা ভাবতে বসল, কী করে তাকে হারানো সম্ভব!

যার যে অস্ত্র সেই অস্ত্রে তাকে হারানো সম্ভব নয়। কোনো মানুষ নখ-দন্তের যুদ্ধে বাঘকে হারাতে পরে না।

অর্থ এবং শঠতা অংশুমানের সবচেয়ে শক্তিমান অস্ত্র। অর্থ এবং শঠতার

যুদ্ধে তাকে হারায় এ সাধ্য অহল্যার নেই। সে চেষ্টা নিষ্ফল। সেখানে সার অংশুমান অপরাজেয়।

তা হলে?

অহল্যার হঠাৎ মনে হল, দয়ানন্দ স্বামী পারেন না অংশুমানকে হারাতে? অর্থে নয়, শাঠ্যেও নয়,—দয়ানন্দ স্বামীর যে আত্মিক বল, তার কাছে কি মাথা নোয়াবে না অংশুমান?

কথাটা মনে হতেই বিছানায় শুয়ে অহল্যা ছটফট করতে লাগল। তার মনে হল, নিজের সমস্ত কথা সে যদি স্বামীজির কাছে প্রকাশ করে বলে, কিছুই গোপন না করে, তা হলে তিনি কি সাহায্য করতে পারেন না? কাল সকালেই যদি সে চলে যায় স্বামীজির আশ্রমে? আশ্রমের ঠিকানা তো তার নেওয়াই আছে।

সকাল হতে কত দেরি কে জানে? অধীর আগ্রহে প্রভাতের প্রতীক্ষা করতে করতে অহল্যা কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে অহল্যার ঘুম ভাঙতে প্রায় ন'টা হল।

সাধারণত সে দেরিতেই ওঠে। কিন্তু অসুস্থ না হলে এত দেরি বড়-একটা হয় না। ঠাকুর চাকর ক'বারই তার ঘরে উঁকি দিয়ে ফিরে গেছে। আবার এক বার যখন এসে দাঁড়াল তখন তাদের পায়ের শব্দে অহল্যা চোখ মেলে চাইল।

তার মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। শরীর দুর্বল। ওদের দিকে একবার চেয়েই আবার সে ক্লান্তভাবে চোখ বন্ধ করল। তার অবচেতন মনের মধ্যে তখনও সেই একটি সুর গুঞ্জন করছে: অংশুমানের অশুভ প্রভাব থেকে সীতানাথকে মুক্ত করতে হবে, মুক্ত করতেই হবে।

এই তার একমাত্র বাসনা। ইহকালের এবং পরকালের জন্যে আর কোনো বাসনা তার নেই। এই বাসনা পরিতৃপ্ত হলেই সে মুক্ত।

স্নানান্তে যখন সে বসবার ঘরে এসে বসল, তখনও এই একই চিন্তা তার মনের মধ্যে গুঞ্জন করছে। কিন্তু তার উগ্রতা গেছে কমে। স্নানের পর কিছুটা সে শান্ত হয়েছে। এখন স্বামীজির কাছে অকপটে, এবং কিছুই গোপন না করে, সমস্ত কথা বলার সাহস তার নেই। রাত্রির অন্ধকারে যে সাহস তার বুকের মধ্যে টগবগ করে ফুটে ফেনিয়ে উঠেছিল, প্রভাতের আলোয় তা শান্ত হয়ে গেছে।

না। অতখানি সে পারবে না।

কিন্তু কতখানি পারবে তাও তো স্থির করতে পারছে না।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

আঃ! অংশুমান! অংশুমান নিশ্চয়। সকালেই জ্বালাতন করতে আরম্ভ করলে! বিরক্তভাবে অহল্যা রিসিভার তুললে :

--হ্যালো।

—কে, ঠাকুরঝি?

—হ্যাঁ। কী খবর বউদি?

—শোন। আজ বিকেলে কী করছ?

—চিরকাল যা করে থাকি। অর্থাৎ কিছুই করছি না। কেন, আসবে?

—যাব। তারপরে তোমাকে নিয়ে অন্য একটা জায়গায় যাব।

—সিনেমায়?

—না, অন্য জায়গায়।

— বল না কোথায়?

একটু ভেবে সুজাতা জানালে, শোন। গুরুদেব এখনই টেলিফোন করছিলেন, বিকেলে তোমাকে নিয়ে ওঁর ওখানে একবার যেতে। তোমাকে নাকি তাঁর কী বলবার আছে।

—আমাকে?—ভয়ে অহল্যার মুখ শুকিয়ে গেল,—কী বলবার আছে?

—তা তো জানি নে ভাই।

অহল্যা চুপ করে রইল।

—তা হলে এই কথাই রইল। তুমি তৈরি হয়ে থাকবে। আমি পাঁচটা নাগাদ যাব।

এ এক ঝামেলা।

জিজ্ঞাসা করা হল না, আর কে যাবে? কোনো সভা আছে, কি এমনি যাওয়া? তাকে গুরুদেবের কী বলবার থাকতে পারে? তার দুঃখ তিনি কি দূর করে দিতে পারেন?

এ আর এক নতুন চিন্তায় পড়ল অহল্যা।

অবশেষে চিন্তার জাল যখন জটিল হয়ে উঠল মনে মনে এলোমেলো আলোচনার ফলে, তখন সে আর পারলে না। বউদিকে ফোন করল :

—বউদি!

—কী ব্যাপার?

—বিকেলে আসছ তুমি?

—নিশ্চয়।

—দাদাও আসছে না কি?

—না, না। তোমাকে উনি কী বলতে চান।

—কী বলতে চান ভাই? আমার ভয় করছে।

—আহা! ভয়ের কী আছে? উনি নিজে যখন কাউকে ডাকেন, সে তখন সৌভাগ্য বলেই মনে করে। ভয় পেও না। চল। তোমার ভালোই কিছু হবে।

তথাপি যেন আশ্বস্ত হল না। তার চোখের দৃষ্টি তো পবিত্র নয়। সেই চোখে উনি কী দেখলেন কে জানে!

অহল্যা দেখলে স্বামীজি সামনের প্রশস্ত বারান্দায় পায়চারি করছেন। ওকে দেখে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

কলকাতার উপকণ্ঠে অনেকখানি জায়গার উপর বাংলোর মতো একখানা টালির বাড়ি। অনেকগুলো ফলের গাছের ছায়ায় ঢাকা। সামনের খানিকটা জায়গায় ফুলের বাগান। প্রশস্ত বারান্দার দু'পাশ জাফরি দিয়ে ঢাকা। তাতে কয়েকটি বেগুনী ফুলে ভরা লতা উঠেছে। নির্জন জায়গা। পাখির কিচিরমিচির ডাকে সেই নির্জনতার মাধুর্য যেন আরও বেড়েছে।

অদ্ভুত ভালো লাগল অহল্যার। বিশেষ করে দয়ানন্দস্বামীর স্নিগ্ধ সুন্দর হাসির নিঃশব্দ অভ্যর্থনা।

অহল্যা এবং তার বউদি গিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, এস মা, এস। চিরসুখী হও। আমি তোমার জন্যেই এখানে পায়চারি করছি। চল, ঘরে গিয়ে বসবে চল।

সামনেই একটি বড় হল, চারিদিকে শোফা। বোধ করি গণ্যমান্য পদস্থ শিষ্যেরা এসে বসেন। মেঝেয় একখানা কার্পেট বিছানো। সামনের দেওয়ালে একটা প্রকাণ্ড তৈলচিত্র। বাঁ দিকের ঘরটি বোধ হয় ঠাকুরঘর। দরজার সামনের একটি পর্দা আধখোলাভাবে বাঁধা।

ওরা ডান দিকের ঘরে এসে বসল।

এটি স্বামীজি এবং তাঁর শিষ্যদের শয়নকক্ষ। এক পাশে একখানি খাটে বিছানা পাতা। পরিষ্কার ধপধপে বিছানা। মাথার দিকে জলচৌকির উপর একটি রূপার গড়গড়ায় নলটি জড়ানো রয়েছে। ওপাশে আর-একটি জলচৌকির উপর কয়েকটি কম্বল ও বালিশ সযত্নে ভাঁজ করা। তাঁর শিষ্যদের বিছানা। রাত্রে মেঝেয় পাতা হয়।

এখন মেঝের উপর একখানি নাতিদীর্ঘ গালিচা বিছনো।

স্বামীজি খাটের উপর বসলেন। ওরা দুজনে গালিচার উপর।

স্বামীজি বললেন, কাল তোর জন্যে সারারাত ঘুমুতে পারিনি মা। কী যে কষ্ট হচ্ছিল সে আর বলবার নয়।

জানলার বাইরের দিকে চেয়ে যেন আপন মনে স্বামীজি কথা বলছিলেন। কথাটা যে কাকে বললেন বুঝতে না পেরে দুজনেই সমস্বরে বলে উঠল: আমার জন্তে!

কিন্তু স্বামীজি আপন মনে বলেই চললেন:

'আমি বড় দুঃখী বাবা, আমি বড় দুঃখী'। কেঁদে আর বাঁচি নে। ঠাকুরকে বললাম, মেঘ যখন দুঃখে কালো হয়ে ওঠে তখনই ওর মুক্তি নামে বৃষ্টিধারায়। আমার অহল্যা মায়ের মুক্তি কবে নামছে তুমি আমাকে বল।

সারা রাত্রির মধ্যে ঠাকুর সাড়া দিলেন না। কত ডাকলাম, কত কাঁদলাম, তবুও না।

ভোরের বেলা প্রথম পাখির ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কবির একটি লাইন হঠাৎ আমার মনে গুনগুনিয়ে উঠল: 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর'।

ক্ষ্যাপা খুঁজছে,—পাহাড় থেকে বনে, বন থেকে নদীতে, নদী থেকে সমুদ্রে। পাথর পাচ্ছে আর কাঁকালের লোহায় ছোঁয়াচ্ছে। প্রথম প্রথম দেখছে, পাথরের ছোঁয়ায় লোহা সোনা হচ্ছে কি না। তারপরে ওটা ক্রমে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। পাথর পায়, লোহায় ঠেকায়, ছুঁড়ে ফেলে দেয়। চেয়ে দেখে না লোহাটা সোনা হল কি না। হঠাৎ একদিন ক্ষ্যাপা চিৎকার করে উঠল: কাঁকালের সে লোহাটা আর লোহা নয়, সোনা। কখন পরশ পাথর পেয়েছিল। কোন্ আঁস্তাকুড় থেকে পেয়ে কোন্ আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছে, খেয়াল নেই।

কবি ক্ষ্যাপার জন্য কেঁদেছেন। আমি বলি, কান্না কিসের! কান্নার তো কিছু নেই। ও তো পরশ পাথর পেয়েছিল। কাঁকালের লোহাই তো নয়, ওর মনের লোহাও সোনা হয়ে গেছে যে! ওর খোঁজা শেষ হয়ে গেল। পরশ পাথরের প্রয়োজনও শেষ হয়ে গেল। আবার কী! পরশ-পাথর তো জমিয়ে রাখার জিনিস নয়, ছুঁইয়েই ফেলে দেবার জিনিস।

ভাবলাম, ঠিক। আজকেই অহল্যা-মাকে ডেকে জিগ্যেস করতে হবে, তুই তো কাঁদলি। কিন্তু যে কাঁদনের ছোঁয়া লেগে আমার মতন পাথরও কাঁদে, সে তো সোজা কাঁদন নয়। একবার দেখ্ তো চেয়ে, তোর মনের যে দাঁড়ে পাখিটা বসে আছে, সেটা সোনা হয়ে গেছে কি না!

একবার দেখ্ তো মা ভালো করে।

অহল্যার বউদি কাঠের মতো শক্ত হয়ে বসে। চোখে তার পলক পড়ে না।

স্বামীজির দৃষ্টি বাইরে থেকে ফিরে সোজা নামল অহল্যার মুখের উপর। ওর মনে হল, ওটা চোখ নয়। পেঁজা তুলোর মত সাদা নরম একখণ্ড মেঘ আর তার মধ্যেখানে এক টুকরো কালো আগুনের পিণ্ড যেন জলছে। আর তার ছোঁয়া লেগে ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন মুহুর্মুহু বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। ঠক ঠক করে কাঁপছে তার শিথিল অবশ দেহ।

সে চিৎকার করে উঠল : প্রভু, আমাকে তুমি বাঁচাও। আমার চেয়ে মহাপাপী ত্রিভুবনে আর নেই। আমি তোমার শরণ নিলাম। আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও···

সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নমূল লতার মতো তার দেহ সেইখানে লুটিয়ে পড়ল।

কিন্তু কেউ ব্যস্ত হল না। কেউ তার শুশ্রূষার জন্মে অগ্রসর হল না। কেউ একটু নড়ল না পর্যন্ত। অহল্যার বউদি স্থাণুর মতো নিশ্চল। চোখ অপলক। স্বামীজির দুই চোখ মুদ্রিত। তারই কোণে জমেছে দুই বিন্দু জল। উজ্জল-সুন্দর মুখে নেমেছে করুণায় ছায়া।

সমস্ত আশ্রম নিস্তব্ধ। বুঝি পাখিরাও শব্দ করতে ভুলে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে অহল্যা ধীরে ধীরে উঠে বসল। চোখের জলে মুখ ভেসে গেছে। অত্যন্ত ক্লান্ত। যেন প্রকাণ্ড পরিশ্রম গেছে এতক্ষণ। ক্লান্তিভরা আবিষ্ট দুই চোখ মেলে গুরুদেবের দিকে চাইলে। তাঁর চোখ আবেশ-বিহ্বল। ঠোঁটের কোণে অতি সূক্ষ্ম রহস্যময় হাসি।

ধীরে ধীরে খাট থেকে নেমে ওদের তিনি ডাকলেন : আরতি হচ্ছে, চল দেখিগে।

আরতি হচ্ছে। পার্থসারথির। কালো কষ্টিপাথরের চতুর্ভুজ মূর্তি। চারিহাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম। মুণ্ডিতশীর্ষ একটি তরুণ শিষ্য পুজো করছে। তার বাঁ হাতে ঘণ্টা, ডান হাতে পঞ্চপ্রদীপ। বিগ্রহের পাশে দাঁড়িয়ে আর-একটি ওই রকম শিষ্য চামর ব্যজন করছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে তৃতীয় একটি শিষ্য কাঁসর বাজাচ্ছে।

স্বামীজি দরজার বাইরে জোড় হাতে দাঁড়ালেন। আর পিছনে দুই পাশে অহল্যা ও বউদি।

অনেকক্ষণ পরে আরতি শেষ হল। ওরা ঠাকুরকে প্রণাম করে তারপরে গুরুদেবকে প্রণাম করে গাড়িতে উঠল। গুরুদেবের সঙ্গে আর-একটি কথাও

হল না। এমন কি সমস্ত পথ ওরা দুজনেও নিঃশব্দে এল। বউদিকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে অহল্যা নিজের বাড়ি ফিরে এল।

এর কয়েক দিন পরে। সন্ধ্যাবেলার দেরি নেই।

বড় ছেলে দীপঙ্কর খেলতে গেছে। শিপ্রাদের কলেজে কী একটা অনুষ্ঠানের মহড়া চলেছে। কদিন থেকে তার ফিরতে রাত্রি হচ্ছে। ছোট দুটির টিউটর এসেছেন। নিচে পড়ছে তারা।

অহল্যা গা ধুয়ে এসে তার ঠাকুর-ঘরে সন্ধ্যার পূজার যোগাড় করছিল। পিতলের ফুল রাখবার রেকাবিটা পরিষ্কার করে মেজে গামছা দিয়ে মুছছে। এমন সময় সিঁড়িতে ভারী জুতোর শব্দে সে বাইরে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

অংশুমান!

এ বাড়ি ইতিপূর্বে কোনোদিন সে আসেনি। সম্ভবত সীতানাথের জন্যেই। সম্ভবত আসতে সাহস করে নি। আজ সে এল কী সাহসে! সীতানাথ অনুপস্থিত বলে? অথবা কি

ওকে ওই রকম স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অংশুমান খানিকটা হতচকিত হয়ে গেল। এবং নিজের সেই বিব্রত ভাবটা গোপন করবার জন্যে মুখে হাসি টেনে জিজ্ঞাসা করলে, কী? চিনতে পারছ না?

—সত্যি। একটু অসুবিধা হচ্ছিল। এস, ভেতরে বস।

উপরের বসবার ঘরে অংশুমানকে নিয়ে গিয়ে অহল্যা বললে, বস। এইটেকেই আমার ড্রইংরুম বলে কল্পনা করতে পার।

অংশুমান আপনমনেই বললে, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হল এইখানে তো তুমি থাক। একবার নামলাম।

অহল্যা একটু হাসলে। বললে, বেশ করেছ। কিন্তু এই প্রথম এলে মনে হচ্ছে। বাড়ি খুঁজতে কষ্ট হয়নি তো?

—উকিলের বাড়ি, দরজায় নাম লেখা থাকে মক্কেলদের জন্যে। তাদের কল্যাণে আমাদেরও খুঁজতে কষ্ট হয় না।

অংশুমান হাসতে লাগল।

অহল্যা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অংশুমান আটকালে: চায়ের জন্যে তো? চা খাব না। এইমাত্র খেয়ে বেরুচ্ছি।

—গরিবের বাড়ির চা একটু চেখে যাবে না?

—না। শোন, সীতানাথবাবুর চিঠি পেয়েছ ?

—দিন পনেরো আগে একখানা পেয়েছিলাম। ভালোই আছেন।

—হ্যাঁ। ভালেই আছেন। কালকের ডাকে আমিও স্বপ্নার একখানা চিঠি পেয়েছি। স্বপ্নাকে চেন তো ?

অহল্যা নীরবে ঘাড় নাড়লে।

—চেন না ?—অংশুমান বললে,—তোমাকে বলেছিলাম বোধ হয়, আরও একটি মেয়ে ওই একই জাহাজে যাচ্ছে। সেই মেয়েটি। স্বপ্না হালদার।

—তা হবে।

—হ্যাঁ। ওদের আগে থেকেই পরিচয় ছিল।

—বোধ হয় তোমারই মারফত ?

—কিছুটা তাই বটে। তা সে যাই হোক, ওখানে গিয়ে ওরা বেশ আছে। এখন একই হোটেলে রয়েছে অবশ্য। তবে সীতানাথবাবু চলে এলে স্বপ্না আর একটা সস্তা জায়গা দেখে নেবে এখন।

অহল্যা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে। অংশুমানের মুখের রেখাগুলো পড়বার চেষ্টা করছে।

অংশুমান বলতে লাগল : বেশ আছে। আজ থিয়েটার, কাল সিনেমা, পরশু অন্য কোথাও। কিছু নয় তো হাইড পার্কেই সন্ধেটা কাটাচ্ছে।

হঠাৎ অহল্যার হাতের রেকাবিটার দিকে দৃষ্টি পড়ল : ওটা কী ?

লজ্জিত হাস্যে অহল্যা বললে, রেকাবি। পুজোর ফুল রাখা হয়।

—পুজোর ফুল !—বিস্ময়ে অংশুমান প্রায় চিৎকার করে উঠল,—তুমি কি পুজো-আচ্চা আরম্ভ করলে নাকি ?

অহল্যা পরিহাসভরে উত্তর দিলে, বয়স তো হচ্ছে। কিছু করতে তো হবে। শুধু তোমাদের সেবা করলেই তো পরকালের কাজ হবে না।

—পরকাল। তা ঠিক।—অংশুমান যেন দমে গেল। একটু থেমে বললে,—দেখ অহল্যা, আমি সীতানাথবাবুর খবর নিতে আসিনি। স্বপ্নার খবর দিতেও নয়।

অহল্যা তা জানে। অংশুমান যত গভীর জলের মাছই হোক, অহল্যা তাকে অন্তত কিছুটা চেনে। এটুকু বুঝেছে যে, এই পথে অন্যত্র যেতে গিয়ে হঠাৎ তার বাড়ির কথা মনে পড়েছে এটা মিথ্যা কৈফিয়ৎ। সীতানাথের

খবর নিতে হয়তো সে আসে নি, স্বপ্নার খবরটা কথাচ্ছলে দেওয়ার প্রয়োজন তার মনে মনে ছিল।

অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, তবে?

—তবে? কেন এসেছি তাও কি তোমাকে বলতে হবে? অথচ 'তুমি কেমন আছ' সেইটেই না জিজ্ঞেস করে চলে যাচ্ছিলাম!

অহল্যা হাসলে। বললে, আমি কেমন আছি জানবার জন্যে এসেছিলে?

—আবার কী! সীতানাথের জন্যে যেটুকু আমার মাথাব্যথা, সে তো তোমারই জন্যে। নইলে সীতানাথ আমার কে?

অহল্যা কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর সহজ কণ্ঠে বললে, তার জন্যে এতদূর আসবার তো কখনও দরকার হয় নি।

—না। তার জন্যে টেলিফোন আছে। কিন্তু টেলিফোনে তো দেখা যায় না।

অংশুমান হাসতে লাগল। তাকে কথায় পারা শক্ত।

অহল্যা বললে, তাই দেখতে এসেছ, আমি কেমন আছি?

—হ্যাঁ। তারও জন্যে আসবার দরকার এতদিন হয় নি। কারণ তুমিই গিয়ে দেখা দিয়ে এসেছ। কিন্তু, কী দোষ করেছি তুমিই জান, সম্প্রতি ওখানে যাওয়া তো একেবারেই বন্ধ করেছ।

শেষ কথার মধ্যে যেন একটা চাপা অভিমান টনটন করে বেজে উঠল।

অহল্যা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। তার নিষ্পলক দৃষ্টি অংশুমানের উপর নিবদ্ধ। ঘরের আকাশ অল্পক্ষণের জন্যে থম থম করে উঠল। এর আগেও এমনি হয়েছে কতবার। মুহূর্ত মধ্যে হয় অহল্যা, নয় অংশুমান একে অন্যের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অংশুমান হয়তো তেমনি একটু-কিছুর জন্যে প্রতীক্ষা করছিল, গাছ যেমন করে নতশিরে প্রতীক্ষা করে ঝড়ের আলিঙ্গনের।

কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না।

অহল্যা সহজ সুন্দর হাসির দক্ষিণা হাওয়ায় থমথমে ভাবটা উড়িয়ে দিলে। জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছি দেখলে?

—ভালো। খুব ভালো।—অংশুমান তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে,—অর্থাৎ আমি যেমন ভেবেছিলাম তেমন নয়।

অংশুমানের উত্তরে অহল্যা খুব কৌতুক বোধ করলে। জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কী ভেবেছিলে?

—আমি ?

—হ্যাঁ।

অংশুমানের বোধ হয় বলতে ইচ্ছা করছিল না। তবু অহল্যার সনির্বন্ধ উপরোধে বলতে হল : ভেবেছিলাম তুমি বিরহে কাতর।

কার বিরহে, অংশুমানের কথার মধ্যেই তা নিহিত ছিল। বুঝতে বিলম্ব হয় না।

হেসে অহল্যা বললে, ভেবেছিলে এসে দেখবে, পদ্মপত্রের বিছানায় শুয়ে সন্তাপ দূর করছি ?

--কতকটা।

—কিন্তু অহো ভাগ্যমহোভাগ্যম্! তার বদলে আমি রেকাবি মাজছি! না ?

—হয়তো 'সেহ বাহ্য'।

—না। অন্তরেও আমি রেকাবি মাজছি, এঁটো রেকাবি। তাতে ঠাকুরের ফুল রাখা যাবে কি না জানি না।

এ ধাক্কাটা সামলাতে অংশুমান সময় নিলে।

সেই ফাঁকে অহল্যা আবার বললে, তা ছাড়া যাঁর তোমার মতো পৃষ্ঠপোষক রয়েছে, সঙ্গিনী রয়েছেন স্বপ্না, তাঁর জন্যে আমি এত দূর থেকে ভেবে কী করব বল ?

সন্ধ্যা হয়ে আসে। পাশের বাড়িতে শাঁখ বাজল। পূজার সময় হয়েছে। অহল্যা ব্যস্ত হল।

বুঝতে পেরে অংশুমান বললে, আমি যাই অহল্যা। তোমার পুজোর সময় হয়ে এল।

—এর মধ্যে আর কোনোদিন কি আসবে ?

—বোধ হয় না। তবে আসতে পারি বা না পারি, অন্তত টেলিফোনে তোমার খবর নোব।

অংশুমান সিঁড়িতে কয়েক ধাপ নেমেই আবার উঠে এল।

অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, কী হল ? কিছু বলবে ?

সিঁড়ির দিকে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অংশুমান বললে, কে যেন একটি মহিলা আসছিলেন।

সবিস্ময়ে অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, মহিলা ?

—হ্যাঁ।

ব্যস্তভাবে অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় ?

—সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ফের ফিরে গেলেন। কে জানে আমাকে দেখেই কি না !

—তোমাকে দেখে ?

অহল্যা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে উঁকি দিলে।

—কই, কেউ নেই তো !

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অংশুমান বলে গেল, বললাম তো, চলে গেলেন।

কে মেয়েছেলে ? অহল্যার কাছে কেউ তো বড় একটা আসে না। হবে কেউ। দরকার থাকলে আবার আসবে। অহল্যা পুজোয় আর দেরি করতে পারে না। বলতে গেলে সব কাজই বাকি। সে তাড়াতাড়ি পূজার ঘরে চলে গেল।

যে মেয়েটি সিঁড়ি থেকে ফিরে গেল সে সুজাতা। গুরুদেবের আশ্রমে গিয়েছিল। ফেরার পথে একবার অহল্যাকে দেখে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল। অহল্যা আগে ছিল শুধু ননদিনী। ননদিনী, যদিও রায়বাঘিনী নয়। এখন হয়েছে তার উপর গুরুভগ্নী। বোধ হয় সেইজন্যেই টান বেড়েছে।

আগে অহল্যার দিক থেকে যাওয়াটা নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু সুজাতার দিক থেকে আসাটা সে তুলনায় নিতান্তই কম ছিল। প্রয়োজন পড়লে আসার চেয়ে টেলিফোনের সাহায্যই বেশি নিত। এখন আসা ক্রমশ বাড়ছে।

খুব উৎসাহের সঙ্গেই সুজাতা দুম দুম করে উঠছিল। হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে দেখে, অংশুমান। অংশুমানকে অনেকেই চেনে, সেও চেনে। দেখামাত্র সেথমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অংশুমান সুজাতার এই অবস্থা দেখেই উপরে উঠে এসেছিল।

অংশুমানের সঙ্গে অহল্যার সম্পর্কের কথা সকলে যেমন জানে, সুজাতাও তেমনি। এবং কম জানাটাই বেশি মারাত্মক। তাতে কল্পনার অবকাশ প্রচুর, যেমন আরও সকলের হয়েছে।

সুতরাং সীতানাথের অনুপস্থিতিতে অংশুমানের এ বাড়িতে প্রবেশ নিজের

চোখে দেখামাত্র সুজাতাকে যেন কাঁকড়া-বিছায় কামড়াল। তার সমস্ত দেহ এবং মন একটা অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরে উঠল। সে আর উপরে উঠল না। অহল্যাকে দেখবার আগ্রহ উবে গেছে। তরতর করে নিচে নেমে সে পালিয়ে বাঁচল। নিচের ঘরে গৃহশিক্ষকের কাছে অহল্যার ছোট সন্তান দুটি পড়ছিল। তাদের সঙ্গে কথা কইবার পর্যন্ত ইচ্ছা হল না।

হিংস্র জন্তুতে তাড়া করলে মানুষ যেমন মরি-বাঁচি-জ্ঞানশূন্য হয়ে পালায়, তেমনি করে পালিয়ে এল একেবারে নিজের বাড়ি। ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দিয়েই ছুটল উপরে।

নিচের ঘরে ইন্দ্রনাথ ছিল। সুজাতার ত্রস্ত দ্রুত পদশব্দে সেও ভয় পেয়ে গেল। চিৎকার করে বললে, কী হল? কী হল?

সুজাতা নতুন আবেষ্টনে এসে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু পায়ের গতি অত সহজে থামে না। শুষ্ককণ্ঠে সাড়া বাজছে না। তবু উপরে উঠতে উঠতেই কোনো মতে বললে, কিছু হয় নি।

—তবে অমন করে ছুটছ কেন?

—ছুটি নি।

এ-কথাটা যখন বললে তখন সুজাতা উপরে উঠে এসেছে। শোবার ঘরে খাটের উপর গায়ের চাদরটা ফেলে দিলে। ইচ্ছা হচ্ছিল, বিছানায় শুয়ে পড়ে। কিন্তু গা ঘিনঘিন করছিল। স্নান না করে খাটে শোওয়া অসম্ভব। তখনই ছুটল কলঘরে।

মুখে সে যে ভরসাই দিক, তার শুষ্ক কণ্ঠস্বরে, তার ছুটে চলার ভঙ্গিতে ইন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হতে পারলে না। পিছু পিছু সেও উপরে চলে এল। কিন্তু সুজাতা তখন কলঘরে।

কলের শীতল জলের নিচে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সুজাতা যেন সুস্থ হতে লাগল। মনের অস্থিরতা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। অনেকক্ষণ পরে যখন সে শোবার ঘরে এল তখন নিজেকে সামলে নিয়েছে।

ইন্দ্রনাথ তখন শোবার ঘরে চিন্তিতভাবে পায়চারি করছে। ওকে আসতে দেখে খাটে গিয়ে বসল।

জিজ্ঞাসা করলে, কী ব্যাপার?

—কোথায়?

—অমন অস্থিরভাবে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ঢুকলে যে?

সুজাতা হেসে বললে, অনেকক্ষণ বাড়িটাকে দেখি নি কিনা, বোধ হয় সেইজন্যে।

উত্তর শুনে ইন্দ্রনাথ হেসে ফেললে। বললে, বাড়ির উপর তোমাদের ভয়ানক মমতা, না?

সুজাতা স্বীকার করলে, হ্যাঁ।

—একটুক্ষণ বাইরে থাকলে বাড়ির জন্যে হাঁপিয়ে ওঠ, না?

—হ্যাঁ।

—আমাদের ঠিক তার উলটো।

—অর্থাৎ একটুক্ষণ বাড়িতে থাকলে বাইরের জন্যে হাঁপিয়ে ওঠ?

—হ্যাঁ।

সুজাতা হেসে বললে, গুরুদেব ওই জন্যে বলেন, পুরুষেরা বারমুখো আর মেয়েরা ঘরমুখো।

ইন্দ্রনাথ এ সমস্যার সমাধান করে দিলে: তার কারণ আমাদের কর্মক্ষেত্র বাইরে, তাই বাইরে আমাদের টানে। আর তোমাদের কর্মক্ষেত্র ঘরে, তাই ঘর তোমাদের টানে।

—হ্যাঁ।

স্ত্রী-পুরুষের ঘর-বাহির তত্ত্বটা বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে সুজাতা ইন্দ্রনাথের হাত থেকে বাঁচল। কিন্তু তার মন তথাপি সুস্থ হল না। রাত্রে শুয়ে শুয়ে তার কেবলই মনে হতে লাগল, অহল্যা তাঁর সুন্দর বাইরেটা দিয়ে গুরুদেবকে ঠকাচ্ছে। এবং নিষ্ক্রিয়তার সাহায্যে সুজাতাও পরোক্ষভাবে এই প্রবঞ্চনায় সাহায্য করছে। অবিলম্বে অহল্যা সম্বন্ধে সমস্ত কথা গুরুদেবকে না জানানো পর্যন্ত তার নিষ্কৃতি নেই। তার পরে অহল্যাকে চরণে স্থান দেওয়া-না-দেওয়ার ভার গুরুদেবের।

॥ সতেরো ॥

সন্ধ্যাবেলায় লটি দত্ত এল। অংশুমান তখন একগাদা ফাইলের মধ্যে অন্যমনস্ক-ভাবে নিঃশব্দে বসে। লটির পায়ের শব্দে চমকে তার দিকে চেয়েই থমকে গেল। লটি এসেছে নিতান্ত সাধারণ বেশে, যে-বেশে অংশুমান কোনোদিন তাকে দেখে নি। মুখ রঙ-করাই, কিন্তু খুব হালকা রঙ। তার ভিতর দিয়ে তার স্বাভাবিক গৌর আভা পরিস্ফুট। মাথার চুল অগোছালো। শাড়িখানি মোটেই জমকালো নয়। পরবার ভঙ্গীও নিতান্ত সাধারণ।

অংশুমান বলে উঠল : তোমাদের হল কী লটি?

সামনের একটা কুশনে বসতে বসতে লটি সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলে, কেন, কী আবার হবে!

—এ রকম বৈরাগিণী বেশ!

—বোধ হয় ছুনিয়ার হাল-চাল দেখে-শুনে।

—কেন, হাল-চাল কী অপরাধ করলে?

—কী জানি! ছুনিয়ার বাঁধন যেন ক্রমেই আলগা হয়ে আসছে। শোন, তোমার কুমার বাহাদুরের খবর কী?

অংশুমান সহাস্যে বললে, ভালো। তার পরদিনই ভোরে তিনি এসে উপস্থিত। এমন কি দাড়ি কামাবারও তর সয় নি।

– তার পরে?

—বললাম তাকে মিসেস হিগিন্সের সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছিল সেই সমস্ত।

—তিনটে স্ত্রী বর্তমান। গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবার। কড়া পর্দা। এ সব কথা বললে?

—সমস্ত। বললাম, মিসেস হিগিন্স যা মেয়ে হয়তো টেলিফোন কিংবা অন্য সূত্রে এ সব কথা জানবার চেষ্টা করবে। আপনিও এই কথা বলবেন। নইলে বিয়ের জন্যে ভদ্রমহিলা যে রকম ক্ষেপেছেন, আপনার পরিত্রাণ নেই।

—শুনে ভদ্রলোক কী বললেন?

—বলবেন কী? ভদ্রলোকের তখন কাঁদ-কাঁদ অবস্থা। আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে ভদ্রলোক বিগলিত হয়ে গেলেন: আপনি আমাকে বাঁচালেন। দুশ্চিন্তায় ঘুমুতে পারতাম না। ভয় হচ্ছিল পাগল হয়ে যাব না তো! আপনার ঋণ আমি জীবনে শুধতে পারব না।

কুমার বাহাদুরের ভঙ্গী নকল করে বলতে বলতে অংশুমান হি-হি করে হাসতে লাগল।

লটি বললে, আজ দুপুরে মিসেস হিগিন্সের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

অংশুমান চমকে উঠল: কোথায়? কী করে? আমাদের কথা কিছু ফাঁস করে দাও নি তো? ও কিন্তু সাংঘাতিক মেয়ে।

লটি হাসলে। বললে, না, ফাঁস করে দিই নি। কিন্তু দেবার ইচ্ছে যে না হচ্ছিল তা নয়। দেখলাম, হোটেলের একটি কোণে একা বসে লাঞ্চ করছিল।

—সঙ্গে কেউ নেই?

—সম্পূর্ণ একা। বলতে পার, সর্বাঙ্গীণ একা। ঘাড় নিচু করে খাচ্ছে। কোনো দিকে চাইছে না।

—তার পরে?

—কী মনে হল, লাঞ্চ শেষ হতে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম: নমস্কার মিসেস হিগিন্স! চিনতে পার? ও কী রকম অদ্ভুত ভঙ্গীতে আমার দিকে চাইলে। বললে, হ্যাঁ—না, কিন্তু তোমায় কোথায় দেখেছি ঠিক মনে করতে পারছি না।

আমি আত্মপরিচয় না দিয়েই জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ?

—আছি। চলে যাচ্ছে।—বলতে বলতে বিল মিটিয়ে চলে গেল।

অংশুমান নিঃশব্দে, কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে শুনে যাচ্ছিল।

লটি বললে, কী রকম যেন ভেঙে গেছে ভদ্রমহিলা। চেহারায়, চলায়, বেশ বুড়ি হয়ে যাচ্ছে। এত কষ্ট হল!

—কষ্ট হল? কেন?

—তা জানি নে। কিন্তু মনে হল সেদিন তোমার কাছে ও অভিনয় করে নি। স্বামী ছাড়া ও বোধ হয় বাঁচতে অভ্যস্ত নয়। স্বামীর অভাবেই অমনি জবুথবু হয়ে যাচ্ছে বোধ হয়।

অংশুমান তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে হেসে উঠল: তার জন্য চিন্তা করছ কেন?

স্বামী একটা দুষ্প্রাপ্য বস্তু নয়। ইতিপূর্বে যখন অভাব ঘটে নি, এবারও অভাব ঘটবে না। ঠিক একটা জুটিয়ে নেবে।

লটি বললে, ওকে দেখলে তোমারও কষ্ট হত।

—না, হত না।

—তার মানে মেয়েদের ওপর তোমার দরদ নেই।

অংশুমান হো-হো করে হেসে উঠল: লোকে আরও বেশি বলে। বলে, শুধু মেয়ে নয়, কারও ওপরই আমার নাকি দরদ নেই।

—কথাটা বোধ হয় একেবারে মিথ্যে নয়।

—কী জানি সত্যি না মিথ্যে! তবে এটা ঠিক যে, মেয়েদের মতো আমি ভাবপ্রবণ নই। তা ছাড়া

—তা ছাড়া?

—তুমি মিসেস হিগিন্সকে জবুথবু দেখে যেমন বিচলিত হয়েছ, আমি কুমার বাহাদুর উল্লাসিত মুখ দেখে তেমনি খুশি হয়েছি।

তারপরেই বললে, চুলোয় যাক মিসেস হিগিন্স। এখন এই সন্ধ্যেটায় কী করা করা যায় বল?

লটি বললে, কিছুই করা যায় না। আমাকে এখনি উঠতে হবে।

—সে আবার কী!

—হ্যাঁ। খুব জরুরী দরকার।

লটি তার ভ্যানিটি ব্যাগটা কাঁধে ফেলে উঠে পড়ল।

লটি চলে গেলে সেই একরাশ ফাইলের সামনে অংশুমান আবার ভাবতে বসল: তাই তো! পৃথিবীর বাঁধন কি সত্যই আগলা হয়ে আসছে?

অহল্যা পূজায় মন দিয়েছে। ফুল তুলছে, পূজার বাসন মাজছে, শাঁখ বাজাচ্ছে, হয়তো পূজার ঘরে সিংহাসনের উপর একটা ঠাকুরও বসিয়েছে!

মিসেস হিগিন্স চতুর্থবার বিবাহের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে ভেঙে পড়েছে।

আর লটি, প্রজাপতি-মার্কা লটি, তাই দেখে বিচলিত হয়ে এমন বৈরাগিণী বনে গেছে যে, এই সুন্দর সন্ধ্যাটা মাটি করে দিয়ে চলে গেল! সন্ধ্যার পরে তারও আজকাল দরকারী কাজ থাকছে!

দুনিয়ার বাঁধন আলগা হয়েই গেল বটে!

—আসতে পারি ?

কুমার বাহাদুরের কণ্ঠস্বর না ? অংশুমান উৎসাহে প্রায় লাফিয়ে উঠল : আসুন, আসুন ! কুমার বাহাদুর আসুন।

সিদ্ধিনাথ আসন পরিগ্রহ করতেই অংশুমান জিজ্ঞাসা করলে, স্ত্রীলোকটা আর আপনাকে বিরক্ত করে নি তো ?

—মিসেস হিগিন্স ? না।—সিদ্ধিনাথের কণ্ঠে অপার বিস্ময়।

—টেলিফোন করে নি ?

—না।

—আর একটা উকিলের চিঠি ?

—তাও না। কী ব্যাপার বলুন তো মশাই ?—মিসেস হিগিন্সের নীরবতা যেন সিদ্ধিনাথকে খুব দুশ্চিন্তায় ফেলেছে,—অন্য কাউকে গাঁথলে না কি ?

মৃদুহাস্যে অংশুমান বললে, না।

—কী করে জানলেন ?

—খবর পেয়েছি।

—কী রকম ?

—একজনের সঙ্গে লাঞ্চের সময় হোটেলে দেখা হয়েছে।

আগ্রহে সিদ্ধিনাথের মুখটা সূচাগ্র হয়ে গেল। রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, তার পরে ?

—দেখে, হোটেলের এক কোণে নিরিবিলি ঘাড় গুঁজে লাঞ্চ খাচ্ছে।

—একা ?

—একা। এখনও বোধ হয় কাউকে গাঁথতে পারে নি।

অংশুমান হাসতে লাগল। একটু থেমে বললে, আর পারবেও না বোধ হয়।

—কেন ?

—যা বর্ণনা পেলাম, এই ক'দিনে বয়স যেন তার অনেক বেড়ে গেছে। কী রকম জবুথবু হয়ে গেছে !

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। এর পরে আপনার একদিন আমাকে খাইয়ে দেওয়া উচিত।

—দোব।

বলে অন্যমনস্কভাবে সিদ্ধিনাথ ভাবতে বসে গেল। কবে খাওয়ানো যায় সেই সম্বন্ধে, কি মিসেস হিগিন্স সম্বন্ধে বোঝা গেল না।

অংশুমানও কী রকম অন্যমনস্ক হয়ে গেল। হঠাৎ একসময় জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা কুমার বাহাদুর, বিবাহ অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়, এ আপনি বিশ্বাস করেন ?

—বিবাহ ?—সিদ্ধিনাথ থতমত খেয়ে গেল,—অভ্যাসে ?

—হ্যাঁ।

অংশুমান ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলে : যেমন ধরুন একজন বিবাহিতা মেয়ে। মেয়েটি ভালো নয়। বাইরে বন্ধুবান্ধবও আছে। সেই মেয়েটির স্বামী মারা গেল। তখন, যদিও তার পুরুষ-বন্ধুর অভাব নেই, তবু সে আর-একটা বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হল।

—কেন ?—সিদ্ধিনাথ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

—কারণ স্বামী নাকি তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বাইরে যে জীবনই যাপন করুক, বাড়িতে স্বামী একটি তার চাই-ই। নইলে সে অস্বস্তি বোধ করবে, দেখতে দেখতে বুড়ি হয়ে যাবে। বিশ্বাস করেন ?

এতক্ষণে সিদ্ধিনাথ ব্যাপারটা বুঝলে। বললে, পৃথিবীতে অবিশ্বাস্য কিছু নেই। এর চেয়েও অবিশ্বাস্য ঘটনা আমি জানি। হয়তো আপনিও জানেন। কিন্তু সে যাক। আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

—কী বলুন ?

—আপনি যে ঘটনাটা বললেন, সে কি মিসেস হিগিন্স সম্পর্কে ?

মৃদু হাস্যে অংশুমান বললে, যদি বলি—হ্যাঁ তাই, আপনি কি বিশ্বাস করতে চাইবেন না ?

একটু ভেবে সিদ্ধিনাথ উত্তর দিলে, চাওয়া-না-চাওয়ার প্রশ্ন নয়। কিন্তু বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে।

—কেন ?

—ওকে আমি চিনি।

—কী রকম চেনেন ?

এই প্রশ্নে সিদ্ধিনাথ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল : কী রকম চিনি বলব ?

—বাধা না থাকে বলুন।

—আপনাকে বলেছি, এক নম্বর, দু নম্বর, তিন নম্বর কেন, ওর যে কোন

নম্বর স্বামী বেঁচে ছিল, ওর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সংস্রবেও সে কথা ঘুণাক্ষরে জানবারও ফুরসুত পাই নি। বলি নি একথা?

— বলেছেন।

—আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম, ও সম্প্রতি বিধবা হয়েছে। এবং এই ভদ্রলোক ছিলেন ওর তিন নম্বর স্বামী।

—ঠিক।

—সম্প্রতি ভদ্রলোকের মৃত্যুর তারিখ এবং অন্যান্য বিবরণ সংগ্রহ করলাম। তা থেকে কী জানলাম জানেন?

—কী?

কয়েক মুহূর্ত অংশুমানের দিকে চেয়ে থেকে সিদ্ধিনাথ বললে, মিঃ হিগিন্স হাসপাতালে মারা যান।

— তা হবে।

ঝড়ের মতো গড়গড় করে সিদ্ধিনাথ বললে, যে রাত্রে ভদ্রলোক মারা যান সে রাত্রি ও আমার বাগানবাড়িতে ছিল। পরদিন সকালে বাড়ি ফিরে মৃত্যু-সংবাদ পায়। আর শুনবেন?

বক্তা এবং শ্রোতা দুজনেই স্তব্ধভাবে বসে রইল।

সিদ্ধিনাথ চলে যাবার পর অংশুমানের মস্তিষ্কে নানা চিন্তা এলোমেলো ঘুরতে লাগল। কখনও সিদ্ধিনাথের কথা, কখনও অহল্যার কথা, কখনও বা নিজের কথা। এর ফাঁকে ফাঁকে লটি দত্ত আসে, স্বপ্না হালদার আসে আবার সীতানাথও আসে।

আসল চিন্তাটা হল, মানুষ চায় কী?

সিদ্ধিনাথ অভিজাতবংশের সন্তান। অংশুমান মিসেস হিগিন্সের কাছে যেভাবে চিত্রিত করেছে, সেটা অবশ্য সত্য নয়। কিন্তু সে বিবাহিত সত্য,—এবং সন্তান বর্তমান। বাপও এখনও বেঁচে রয়েছেন। হৃদয়ের শ্রদ্ধা, প্রীতি, স্নেহ, প্রেম,—যা কিছু মানুষকে পশু থেকে স্বতন্ত্র করেছে,—সবই তাদের জন্যে সংরক্ষিত। অথচ মেয়েমহলে ঘোরাঘুরির বাতিকও আছে। কিন্তু সেটা নিতান্তই দেহগত। তার সঙ্গে হৃদয়ের কোনো সম্পর্ক নেই।

এই কথা তার নিজের সম্বন্ধেও সত্য। অহল্যার সম্বন্ধেও।

অহল্যাকে সে নিজেই বিবাহ করতে পারত, কিন্তু করে নি। ইচ্ছা করেই

করে নি। ভালোবাসায় সে বিশ্বাস করে না। সুতরাং ভালোবাসার পাত্রীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করাও সম্ভব হয় নি। অহল্যা নিজেও কোনোদিন এর জন্যে জেদ করে নি। জেদ করলে কী হত, এই মুহূর্তে অংশুমানের পক্ষে বলা শক্ত। মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগছে, অহল্যা জেদ করলে হয়তো সে রাজি হয়ে যেতেও পারত। অসম্ভব নয়।

যাই হোক, অহল্যা জেদ করে নি। বরং বিনা প্রতিবাদেই সীতানাথকে বিবাহ করে নিঃশব্দে, বলতে গেলে হাসিমুখেই, তার ঘর করতে, তার ঘরণী হতে গেছে। অংশুমানেরও তার জন্যে কোনোদিন বুকের ভিতরটা জ্বালা করে ওঠে নি। বরং সেও প্রসন্নচিত্তেই এই বিবাহের সমস্ত ব্যয় বহন করেছে।

আর সেদিন তারা কেউই নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিল না। সমস্ত বুঝে-সুজেই এই কাজ ঘটেছে। আবার উভয়েরই সেদিন ভরা যৌবন। অহল্যা এম. এ. পাস করেছে। অংশুমানেরও অর্থাভাব ছিল না। ব্যবসায়ে সে তখন কিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তার শক্তি সম্বন্ধে ব্যবসায়ী-মহলে প্রত্যয়ও জেগেছে। সকল দিক দিয়েই উভয়ের মনে যথেষ্ট ভাবালুতার অবকাশ ছিল। অথচ কেউ সেই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেবার কথা চিন্তাও করে নি।

এমনি করেই চলে এসেছে। বেশ দীর্ঘকালই চলে এসেছে। অংশুমানের বান্ধবীদের উপর অহল্যার ঈর্ষার পরিচয় যেমন কোনোদিন লেশমাত্রও পাওয়া যায় নি, সীতানাথের উপরও অংশুমানের ঈর্ষার প্রকাশ তেমনি কোনোদিন দেখা যায় নি। ভালোবাসার ভান না করে, ঈর্ষা-ভাবালুতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে বন্ধুভাবে অংশুমান ও অহল্যার দিন বেশ কেটে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে এ কী ফাটল দেখা দিল!

সীতানাথকে অংশুমান ঈর্ষা করতে আরম্ভ করল কেন? অহল্যা এ বাড়ি আসা তো বন্ধ করেছেই, এমন কি অংশুমান জীবনে প্রথম অহল্যার বাড়ি গিয়েও যথোচিত অভ্যর্থনা পেলে না কেন?

নিয়মিত দেখাশোনার ফলে অংশুমানের খেয়াল না থাকতে পারে যে অহল্যা আর তরুণী নয়, সে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছে। তবু ঠাকুরপূজায় মন দেবার মতো বয়স তার হয়েছে এমন কথাও অংশুমান কিছুতেই মানতে পারে না।

হঠাৎ ওদিকেই বা সে ঝুঁকল কেন?

অংশুমান ভেবে পায় না, কেন। জৈব-আনন্দের স্রোতে কি তার ভাঁটা পড়ল? যদি পড়ে থাকে, সে কি সীতানাথের ব্যবহারে? না কি অংশুমানেরই ব্যবহারে?

অংশুমান কখনই তো অহল্যার উপর অবিচার করে নি। বরং,—এই কথাটা ভাবতে গিয়েও অংশুমানের মুখ রীতিমত গম্ভীর হয়ে উঠল,—বরং অহল্যাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে এসেছে, যা কখনও কোনো মেয়েকে করার উপলক্ষ্য তার ঘটে নি। অংশুমানের দিক থেকে অহল্যার মুখ ফেরানোর কোনো কারণ সে কল্পনাই করতে পারে না।

একটি কারণ এই হতে পারে যে, অহল্যার মন ঘুরেছে সীতানাথের দিকে। কিন্তু এই অবেলায় ওদিকে তার মন ঘোরবার সময় হল? হলই যদি তবে সীতানাথকে বাঁচাবার জন্যে সে চেষ্টা করছে কই? স্বপ্নার প্রসঙ্গেই বা তার মুখ ঈর্ষায় কালো হয়ে উঠল কই?

কিসের প্রতিক্রিয়া ওর মনে কাজ করছে?

অংশুমান ভাবে। ভেবে কিছুই স্থির করে উঠতে পারে না। আর যতই স্থির করে উঠতে পারে না, মনের মধ্যে ততই অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে। আর আগের মতো কর্মের সমুদ্রে ডুব দিতে পারে না।

॥ আঠারো ॥

অংশুমান চলে যাওয়ার পর অহল্যা একটু হাসল। স্বপ্নার প্রসঙ্গ তুলে অহল্যার মনে সে ঈর্ষার উদ্রেক করবার চেষ্টা করেছিল। অহল্যার হাসির সঙ্গে যে গর্ব মেশানো ছিল সে এইজন্য যে, অংশুমানের চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছিল। স্বপ্নাকে সে ঈর্ষা করে না।

সীতানাথের জীবনে যদি স্বপ্নার আবির্ভাব ঘটে থাকে, অহল্যা তার জন্যে ঈর্ষান্বিত নয়। সে জানে, স্বপ্না উপলক্ষ্য মাত্র। সে অংশুমানের সৃষ্টি। অংশুমানের প্রয়োজনে সীতানাথের জীবনে তার আবির্ভাব ঘটেছে। সত্য কথা বলতে গেলে সীতানাথও উপলক্ষ্য মাত্র। অংশুমানের সঙ্গে তার নিগ্রহ-অনুগ্রহ কিছুরই সম্পর্ক নয়। আসলে দড়িটানাটানি চলছে অহল্যা আর অংশুমানের মধ্যে। আর অংশুমান যখন বাড়ি বয়ে এসে তার সঙ্গে স্বপ্নার আলোচনা করে গেছে তখন অংশুমান অথবা অহল্যা কারও মনে সংশয় নেই যে, এই যুদ্ধে অহল্যারই হার হয়েছে।

অহল্যা মুখ নামিয়ে সে কথা ভাবলে।

কিন্তু পূজার বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। অহল্যা দেরি করতে পারলে না। তাড়াতাড়ি পূজার ঘরে চলে গেল। বিজলী আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘৃতের প্রদীপটা জাললে। ধূপদানির সব ক'টি ধূপকাটি জ্বালিয়ে দিলে। তারপর রাধাকৃষ্ণের পটের সামনে নিজের আসনটিতে বসে ধ্যানস্থ হল।

কিন্তু কে এসেছিল তখন ?

অংশুমান বললে, একটি মহিলা।

তার কাছে বেশি মেয়ে আসে না। আত্মীয়-বন্ধু তার বেশি নেই। এক সুজাতা আসে মাঝে মাঝে। আর দু-চারটি মহিলা। তাদের মধ্যে কে আসতে পারে ?

সুজাতা কি ?

কিন্তু সুজাতা এসে এমন করে চলে যাবে কেন ?

অংশুমানকে দেখে ?

তাকে কি সুজাতা চেনে? চিনলেই বা তাকে দেখে অমন করে চলে যাবার কী আছে?

সে যদি না হয়, তা হলে অন্য কে হতে পারে?

অহল্যা একে একে সম্ভবপর মহিলাদের নাম মনে করতে লাগল। হঠাৎ এক সময় খেয়াল হল সে আর ধ্যানস্থ নেই। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির ধ্যান সে করছে না। আবার সে চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ হবার চেষ্টা করলে।

অংশুমানের স্পর্ধা কম নয়! বাড়ি বয়ে এসে সে অহল্যাকে ব্যঙ্গ করে যেতে সাহস করে!

এই সাহস আসে কোথা থেকে? অর্থ থেকে? জীবনযুদ্ধের সফলতা থেকে? বিচিত্র নয়। সাধারণ মানুষ ভিক্ষুকের মতো অর্থবানের চারদিকে ভিড় করে। কেউ প্রার্থী হিসাবে, কেউ বা কোনো প্রত্যাশা না রেখেই। সাধারণ মানুষ স্বভাবধর্মেই কাঙাল। অর্থ তাদের জীবনের পরমার্থ। সেই অর্থ যে, যে-ভাবেই হোক, লাভ করেছে তার স্তাবকতা নিঃস্বার্থভাবে করেও তারা ধন্য বোধ করে। .

অংশুমানের দম্ভও এরাই বাড়িয়েছে। নইলে অংশুমান তো এমন ছিল না। আগে, অনেক আগে অবশ্য, সে বিনয়ী ছিল, নম্র ছিল, ভদ্র ছিল। অজস্র কাঙালের স্তবস্তুতিতে বেড়েছে তার দম্ভ।

অহল্যার মনে হল, সীতানাথও এই অজস্র স্তাবকের দলে যোগ দিয়েছে। নিঃস্বার্থভাবে নয়, লোভে। অর্থের লোভে, প্রতিষ্ঠার লোভে সীতানাথের মতো লোকও তার কাছে আত্মবিক্রয় করলে!

আর বিনিময়ে এল অর্থ, এল ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা, এল বিলাতযাত্রার সুযোগ, স্বপ্না এবং আরও কত কী তাই বা কে জানে! অহল্যা তো জানেই না, অংশুমান নিজেও জানে কি না সন্দেহ।

ঘণ্টাখানেক পরে অহল্যার আবার খেয়াল হল সে ধ্যানস্থ নয়। ঠাকুরের চিন্তা থেকে অনেক দূরে শয়তানের রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মন। ভাবতেই গাটা ঘিনঘিন করে উঠল।

বুঝলে, আজকে আর তার ধ্যান হবে না। মন চঞ্চল। তার ভারকেন্দ্র বিচলিত। মন নিম্নগামী। আজ আর তাকে ঊর্ধ্বপথে নিয়ে যাওয়া বোধ হয় সম্ভব হবে না।

ক্লেদ জমে গেছে মনে। স্বামীজির কাছ থেকে এসে মন বড় চমৎকার

পর্যায়ে এসেছিল। অংশুমান এসে সমস্ত মাটি করে দিলে। ঠাকুরকে কোনো মতে একটা প্রণাম করে অহল্যা বিরক্তভাবে উঠে দাঁড়াল। আর-একবার স্নান করে না এলে বোধ হয় ঘুমই হবে না তার।

পূজার ঘর বন্ধ করে সে স্নানঘরে চলে গেল।

ক্লেদ জমে যাচ্ছে। অহল্যার মনে কেবলই ক্লেদ জমে যাচ্ছে। কাল সারা-রাত্রি তার চোখে এক ফোঁটা ঘুমও নামে নি। সকালেও মন চঞ্চল। পূজার ঘরে অনেকক্ষণ ধ্যান করবার চেষ্টা করেছে। পারে নি। ক্রমাগত কেঁদেছে, তার ঠাকুরকে ডেকেছে। এ তার হল কী? কেন এমন হল?

এক-একটা মানুষ আছে যাদের সান্নিধ্যে বিষ আছে। অংশুমান এসেছিল, তারই সান্নিধ্যের বিষের জ্বালায় সে কি ছটফট করছে?

সমস্ত দিন ছটফট করে কাটিয়ে সে আর পারলে না। অংশুমান তো রইলই। শয়তানের কাছে একবার যে মাথা নুইয়েছে তার পরিত্রাণ কোথায়?

তার দরজা শয়তানের জন্যে বন্ধ করা কঠিন।

তা হলে সে কি আর শান্তি পাবে না? যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রইল অংশুমান, জড়িয়ে রইল স্বপ্না-সীতানাথ? কোনো দিকে কি আর নিষ্কৃতি নেই?

কিন্তু কী চায় সে?

ভগবান?

চোখ বন্ধ করে একখানা আরাম-কেদারায় শুয়ে অনেকক্ষণ ভাবল সে। না, ভগবান সম্বন্ধে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। সকল সাধারণ মানুষের যেমন একটা অস্পষ্ট ধারণা থাকে তারও তার বেশি নেই। ভগবানকে চাওয়ারই বা মানে কী, পাওয়ারই বা মানে কী তাও জানে না।

তা হলে কী চায় সে? শান্তি?

কিন্তু শান্তিই বা কাকে বলে? সূর্য উঠবে, নির্বিঘ্নে অস্ত যাবে আবার নির্বিঘ্নে উঠবে, এই কি শান্তি?

সে কথা যদি ধরতে হয়, তা হলে তার জীবনে সূর্যের উদয়াস্ত তো নির্বিঘ্নেই ঘটছে। তাকে তো কেউ বিরক্ত করছে না। তারা তাদের নিজেদের পথে চলছে। সে অধিকার নিশ্চয়ই তাদের আছে। তারা কেউ—না অংশুমান, না সীতানাথ, কেউ তো তার পথে দাঁড়িয়ে তার চলায় বিঘ্ন

উৎপাদন করছে না। কেউ তো তাকে বলছে না—তুমি এমন কর, অমন কোরো না,—এমন হও, অমন হয়ো না। তার যাত্রাপথে কেউ জবরদস্তি করছে, এমন কথা অহল্যা কী করে বলতে পারে?

আসলে সে ক্লান্ত। মানুষের উপর সে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। হৃদয়ের গতিবেগ তাই মন্থর হয়ে এসেছে। এই মন্থরতা এনেছে ক্লান্তি। জীবনে কাউকে হয়তো সে ভালোবাসে নি, ভালোবাসতে পারে নি। কি হয়তো বেসেছে, কিন্তু সে নিজেই জানে না। কিন্তু ভালোবাসুক, ভালোবাসতে পারুক আর না পারুক, সামাজিক মানুষের সহস্র সংস্কার হৃদয়ের পথ দিয়ে প্রত্যাশার শিকড় গেড়ে রস নেয়। নিয়ে বাঁচে। সেই রস তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। ফুরিয়ে গেছে প্রত্যাশা। সে ক্লান্ত।

তাই সে দুঃখ পায়। আর গুরুদেব বলেছেন, বাসনা ত্যাগ না করতে পারলে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ নেই। কিন্তু বাসনা কি ত্যাগ করা যায়? এই প্রশ্ন সে সেদিনও করেছিল। আজও তার মনে এই প্রশ্নই বারে বারে উঠতে লাগল: বাসনা কি ত্যাগ করা যায়? কোনো মানুষ কি বাসনা ত্যাগ করতে পারে?

কী জানি অন্য মানুষ পারে কি না, কিন্তু অহল্যা তো পারে না।

ঠাকুরকে সে ডাকে। কামনা নিয়েই ডাকে। ডাকে, অংশুমানের দর্প চূর্ণ করবার জন্যে। ডাকে, সীতানাথকে অংশুমানের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্যে—সীতানাথের জন্যে নয়, অহল্যার নিজের জন্যে। অংশুমানের হাতে পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচার জন্যে, হয়তো শান্তির জন্যেও।

তার কাছে ঠাকুর অবলম্বন। শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। মানুষের কাছে প্রত্যাশা যখন শেষ হল, মানুষ যখন বারে বারে তাকে বিড়ম্বিত করলে, তখন সে ঠাকুরকে ধরলে। মুক্তির জন্যে নয়, বাঁচবার জন্যে। পার্থিব জীবনের ক্লেদ-গ্লানি এবং লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে।

তা হলে মাঝখানে আবার একটি গুরুদেব কেন? ঠাকুরকে কি সরাসরি ধরা যায় না?

যায়। হয়তো যায়। কিন্তু রাস্তাটা অহল্যার ঠিক চেনা নেই। তার জন্যে গুরুদেবকে ধরতে হয়েছে। তিনি তাকে রাস্তাটা বলে দেন। সাহস দেন, সান্ত্বনা দেন এইখানে তাঁর প্রয়োজন।

বস্তুত, অহল্যা অনেক ভেবে দেখলে, ঠাকুরের চেয়ে গুরুদেবের সঙ্গেই,

যেন তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। ঠাকুর একটা পটে-আঁকা মূর্তি। একটা ছবি। না দিতে পারেন সাহস, না সান্ত্বনা।

পক্ষান্তরে গুরুদেব রক্ত-মাংসের মানুষ। শান্ত, সৌম্য, সুন্দর। যেমন মধুর শান্তি, তেমনি মধুর বাণী। শুকতারার মতো চোখ করুণায় ছলছল। তাঁর কাছে সব কথা বলা যায়। মানুষের দুঃখ তিনি বোঝেন। মানুষের দুঃখে তিনি কাঁদেন, সুখে হাসেন। পটে-আঁকা ছবিকেও হয়তো বলা যায় সব কথা। কিন্তু তিনি কি মানুষের দুঃখ বোঝেন? তাকে সাহস দেন, সান্ত্বনা দেন? তা যদি হত, তা হলে মানুষের এত দুঃখ কেন? পৃথিবীতে এত দুঃখ কেন?

না। অহল্যার সঙ্গে, এবং বোধ করি তাঁর সমস্ত শিষ্য-শিষ্যার সঙ্গেই ঠাকুরের চেয়ে গুরুদেবের যোগাযোগই ঘনিষ্ঠতর। সকলেই ছুটে আসে স্বামীজির কাছেই। নিশ্চয়ই এই প্রত্যাশা নিয়ে যে, তিনি তাদের কামনা পূর্ণ করবেন, তাদের দুঃখ থেকে ত্রাণ করবেন।

পরিত্রাতার মতোই তাঁর রূপ, তাঁর চোখের দৃষ্টি, তাঁর ভাষা।

অহল্যার মনে হল, মানুষকে মানুষ ছাড়া আর কেউ ত্রাণ করতে পারে না। ভগবানও না। তাঁর সে রকম অভিপ্রায়ই নেই। এক পারেন মা, আর গুরুদেব। পরলোকগতা মায়ের কথা মনে পড়ে অহল্যার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল।

সমস্ত দিন অস্থিরভাবে কাটিয়ে বিকেলে অহল্যা গাড়িখানা বের করলে। চলল গুরুদেবের আশ্রমে।

ফটকের বাইরে গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে ঢুকতেই একটি শিষ্য সহাস্যে তাকে অভ্যর্থনা করলে। ছেলেটি ফুলগাছে জল দিচ্ছিল।

বললে, আসুন। গুরুদেব আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

—আমার জন্যে?

অহল্যা বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।—ছেলেটি সবিনয়ে বললে,—যান। তিনি বসবার ঘরে রয়েছেন।

অহল্যা নড়ল না। সবিস্ময়ে পুনরায় প্রশ্ন করলে, আমি আসব তিনি কি জানেন?

—জানেন বলেই তো বোধ হল।

ছেলেটির ঠোঁটে মৃদুমন্দ হাসি।

—কিন্তু আমি তো আসবার কথা তাঁকে জানাই নি। আমি যে আসব তা আমি নিজেই জানতাম না। হঠাৎ কী মনে হল, চলে এলাম।

—তবু তিনি জানেন বলেই তো মনে হল।—ছেলেটি বলতে লাগল,—ফুলগাছে জল দেবার জন্যে বেরুচ্ছি, ডেকে বললেন, অহল্যা আসবেন এখুনি। তাঁকে বোলো, আমি বসবার ঘরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।

—বললেন এই কথা!

—তাই তো বললেন।

তারপরে ওর বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে ছেলেটি সহাস্যে বললে, আপনি অবাক হচ্ছেন দিদি, আমরা অবাক হই না। কিছুদিন পরে আপনিও হবেন না।

—কেন?

—দেখবেন, উনি সকলের মনের সব কথা জানেন। আমরা তার বহু প্রমাণ পেয়েছি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

একটু পরে অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, তোমার নামটি কী ভাই? তুমি আমাকে দিদি বলেছ মনে থাকে যেন।

ছেলেটি হাসলে। বললে, আমার নাম নিরুপম।

—নিরুপম ব্রহ্মচারী। না? নিরুপম তো তোমার লৌকিক নাম?

—হ্যাঁ। এখনও সন্ন্যাসে দীক্ষা পাই নি। আপনি আর দেরি করবেন না। উনি অপেক্ষা করছেন।

—করুন। আমার ওঁর চেয়েও ভালো লাগছে ওঁর গল্প। তুমি ওঁর গল্প কিছু কর। উনি কি সব মানুষের মনের কথা জানতে পারেন?

এ রকম বিদঘুটে প্রশ্নের সম্মুখীন নিরুপম বোধ হয় এর আগে কখনও হয় নি। একটু বিব্রত বোধ করলে। একটু ভাবলে।

তারপর বললে, সব মানুষের কথা তো জানি না, তবে তাঁর কাছে যাঁরা আসেন, যাঁদের কথা তিনি ভাবেন, তাঁদের মনের কথা জানেন।

—সে কী করত, কী করে, কী ছিল, কী হয়েছে—সব জানেন?

একটু চিন্তা করে নিরুপম বললে, বোধ হয় জানেন। তা হলে একটা গল্প বলি শুনুন।

জলের ঝারিটা বাগানে নামিয়ে রেখে নিরুপম অহল্যার কাছে এল। বলতে লাগল :

—গেল সপ্তাহে একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে এসেছিলেন। জামাই বর্মায় এঞ্জিনীয়ার। মাস দেড়েক ধরে তাঁর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। ওঁরা ভেবে অস্থির। গুরুদেব একটু চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ হলেন। চোখ খুলে হেসে বললেন, অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিল। এখন ভালো আছে। আজ সন্ধ্যেয় তোমরা টেলিগ্রাম পাবে। ওর জাহাজ ছেড়েছে। মঙ্গলবারে এসে পৌঁছুবে।

চোখ বড় বড় করে অহল্যা শুনছিল। জিজ্ঞাসা করলে, তারপর ?

—তারপর আর কী !—নিরুপম হাসলে,—টেলিগ্রাম হাতে করে সন্ধ্যের পর ভদ্রলোক হাসতে হাসতে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করলেন। জামাই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালেই ছিলেন। তাঁর জাহাজ মঙ্গলবার ভোরেই এসে পৌঁছুচ্ছে।

নিরুপম হাসতে লাগল।

অহল্যা বললে, আশ্চর্য !

নিরুপম বললে, আশ্চর্য আপনার আমার কাছে। নইলে ব্রহ্মকে যিনি জেনেছেন, ভূত ভবিষ্যৎ কিছুই তাঁর জানতে বাকি নেই। তিনি না-জানেন কী ? গভীর রাত্রে বাইরে এসে দেখেছি, খোলা জানলার নীচে গুরুদেব ধ্যানস্থ। চোখ মুদ্রিত। দেহে স্পন্দনের কোনো চিহ্ন নেই। নিষ্কলঙ্ক ললাটে পড়েছে চাঁদের শুভ্র আলো। সে যে কী দৃশ্য দিদি, বলবার নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি তো দেখছিই। পা যেন মেঝের সঙ্গে আটকে গেছে। চোখের পলক পড়ে না কতক্ষণ ধরে দেখছি, কোনো হুঁশ নেই। হঠাৎ এক সময় গুরুদেবের স্পর্শে চমকে উঠলাম। তিনি আমার কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে হাসছেন।

জিজ্ঞেস করলেন, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ ?

জানি না। কী করছিলাম জানি না। তিনি ধ্যান করছিলেন নিভৃতে। তাতে দেখবার কী ছিল জানি না। কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। শুধু তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লাম।

এও আশ্চর্য! কিন্তু অহল্যা এই গল্প মন দিয়ে শুনছিল বলে মনে হয় না। সে অন্য কথা ভাবছিল: স্বামীজি সব জানেন। অন্তত তাঁর যারা স্নেহভাজন তাদের সব কথা তিনি জানেন। অহল্যা সম্প্রতি তাঁর কাছে যাওয়া-আসা করছে। খুব সম্ভবত স্নেহভাজনও। নইলে সে যে আজ বিকেলে তাঁর কাছে আসছে, তিনি কী করে বলবেন? সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, অহল্যার সব কথাও তিনি জানেন। তার অতীত, তার বর্তমান, এমন কি তার ভবিষ্যৎও।

অথচ লজ্জায় সমস্ত গোপন করে যাচ্ছে নিরর্থক।

নিরুপম অহল্যার চিন্তার খবর জানে না। সে ভাবলে, তার গল্প শুনে অহল্যা মোহিত হয়ে গিয়েছে। এই ভেবে আরও একটা গল্প সে বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখলে, গুরুদেব বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ব্যস্তভাবে জলের ঝারি তুলে নিয়ে অহল্যাকে তাড়া দিলে: আপনি আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ওই দেখুন, গুরুদেব আপনার দেরি দেখে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন!

কিন্তু স্বামীজি যে অহল্যার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন, এমন কি তার দেরি দেখে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর কথায় এবং আচরণে তার বিন্দুমাত্র আভাসও অহল্যা পেল না। বরাবরই তিনি যেমন শান্ত, সৌম্য, স্থির, এখনও তেমনি। ব্যস্ততা কিংবা অধৈর্যের চিহ্নমাত্র নেই।

অহল্যা প্রণাম করতে তিনি স্মিত হাস্যে আশীর্বাদ করে তাকে বসতে বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কী খবর মা? সব ভালো তো?

—ভালো? ভালো কিছুই নয় প্রভু।

কথাটা এমন আকস্মিকভাবে অহল্যা বলতে চায় নি। বলবার কথা ভাবেও নি। হঠাৎ কেমন তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

স্বামীজি হেসে উঠলেন। গম্ভীর ভাবে নয়, একেবারে ছেলেমানুষের মতো

বললেন, ভালো নয় কী রে! মন্দ বলে কোথাও কিছু আবার আছে না কি! সব ভালো, যা-কিছু ঘটে সবই ভালো।

বিস্মিতভাবে অহল্যা বললে, সে কী করে হয় প্রভু? সংসারে ভালোও ঘটে, মন্দও ঘটে। ভালো ভালো, মন্দ মন্দ। মন্দকে কী করে ভালো বলি?

যেমন ধরুন, আমার মনে সুখ নেই, শান্তি নেই। একে কি করে ভালো বলি?

—জোর করে।—স্বামীজি হাসতে লাগলেন,—বলব ওই যে অসুখ, ওইটেই সুখ। অশান্তিই শান্তি। জোর করে বলব।

অহল্যা অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

স্বামীজি বললেন, জান না নেই বললে সাপের বিষ নেমে যায়?

এবারে অহল্যা হেসে ফেললে। তার শিক্ষিত তর্কপরায়ণ মন উন্মুখ হয়ে উঠল। বললে, সে ঢোঁড়া সাপের বিষ। কেউটের বিষ 'নেই' বললেই নামে না, অনেক দেখেছি।

উত্তর শুনে স্বামীজি রাগ করলেন না। বরং হেসেই ফেললেন। বললেন, অনেক হয়তো দেখেছ। কিন্তু এটা দেখ নি, যেমন করে নেই বললে বিষ নামে তেমন করে সে বলতে পারে নি।

—তা হতে পারে।—অহল্যা স্বীকার করলে,—কারণ কেমন করে নেই বললে বিষ নামে সে আমি জানি না। আমার মনে অহর্নিশি বিষের জ্বালা। নেই বলে তাড়িয়ে দিতে পারব না। আমার জীবনের সমস্ত কথা অকপটে বলব বলে আজ এসেছি। সমস্ত শুনে যদি চরণে ঠাঁই দেন ভালো, না দিলেও অভিযোগ করব না। আমি অতি পাপিষ্ঠা।

বলতে বলতে অহল্যা হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে। কিছুক্ষণ পরে অশ্রুবেগ সংবরণ করে চোখ মুছে স্বামীজির দিকে যখন চাইলে, দেখলে সে মুখে তেমনি প্রসন্ন হাসি যা দিয়ে তাকে তিনি কিছু আগে অভ্যর্থনা করেছিলেন।

বললেন, তোমার কোনো কথাই শোনবার আমার সময় হবে না মা।

আর্তস্বরে অহল্যা বললে, হবে না? তা হলে আমি বাঁচব কেমন করে?

—তুমি তো বেঁচেই আছ গো, দিব্যি বেঁচে আছ।

তেমনি ব্যাকুল কণ্ঠে অহল্যা বলে উঠল: আপনি জানেন না বাবা—

বাধা দিয়ে সহাস্যে স্বামীজি বললেন, আমি জানি মা, তুমি বেঁচেই আছ। মারা গেছে যাকে তুমি পাপিষ্ঠা বলছিলে সেই মেয়েটা। ওরা অল্পপরমায়ু নিয়েই আসে। ক'দিন খুব দৌড়ঝাঁপ করে কখন এক সময় মরে যায় কেউ টেরও পায় না। আমি অনেক দেখলাম যে! বাইরের লোকে ওদের লাফানোটাই দেখতে পায় মরাটা ধরতে পারে না।

অহল্যা একটু থমকে গেল। স্বামীজির কথার সত্যতা যাচাই করবার

জন্যে মনের গভীরে চোখ বুলোতে লাগল। মনটা যেন ঠিক পরিষ্কার হল না। তাই আবার একটা কী বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় সুজাতা ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। অহল্যাকে দেখতে পেলে বলে বোধ হল না।

—এস মা, এস। সব ভালো তো?

—হ্যাঁ প্রভু, আপনার আশীর্বাদে সমস্ত কুশল।—সুজাতা সবিনয়ে উত্তর করলে।

অহল্যা একদৃষ্টে সুজাতার দিকে চেয়ে। কিন্তু সুজাতার দৃষ্টি স্বামীজির দিকে। সে এত কাছে বসে অথচ সুজাতা তাকে দেখতে পাচ্ছে না ভেবে সে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করছিল।

সুজাতা যে জন্যে এসেছিল সে কথা বলার সুযোগাভাব। মনে মনে যত ক্রুদ্ধই সে হয়ে থাকে, অহল্যার সামনেই অহল্যার প্রসঙ্গ গুরুদেবের কাছে উত্থাপন করা যায় না। অগত্যা তার আগমনের অন্য কারণটা তুললে:

—আমি এসেছিলাম প্রভু।

—বল।

সুজাতা বললে, কাল একাদশী। পরশু দ্বাদশীর পারণটা যদি আমার ওখানে হয়, সবাই মিলে প্রসাদ পাই।

গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, সে তো হবার নয় মা।

—কেন? অন্য কোথাও কি

—ঠিক ধরেছ মা, অন্য, কোথাওই বটে। কিন্তু যোর কাছে যাব সে এখনও জানে না।

সুজাতা বিস্ময়জড়িত অস্ফুট কণ্ঠে বললে, সে আবার কী! তিনি জানেন না?

—না। কিন্তু তাতে অসুবিধ. হবে না। অহল্যা-মা!

—প্রভু!

—পরশু দ্বাদশীর পারণটা তোমার ওখানে না হলে তো চলতেই পারে না।

—ঠাকুরঝির ওখানে!—সুজাতা যেন লাফিয়ে উঠল। তার চোখ বাঘিনীর মতো জ্বলতে লাগল।—সে কিছুতেই হতে পারে না প্রভু। তার চেয়ে—

—আমি স্থির করে ফেলেছি মা।

স্বামীজির কণ্ঠস্বর শান্ত, কিন্তু দৃঢ় এবং একটু যেন কঠোর। ওঁর এ রকম কণ্ঠস্বর সুজাতা কখনও শোনে নি। সে স্তব্ধ হয়ে গেল।

স্বামীজি বলতে লাগলেন, তুমি মনে দুঃখ কোর না সুজাতা-মা! পরন্তু আমার অহল্যা-মা'র হাতের রান্না না হলে আমার পারণই হবে না। তুমি এসে সেইখানে প্রসাদ পাবে। ও তো হাড়-কিপটে! তোমাকে নিমন্ত্রণ করবে না, আমিই করলাম। যাওয়া চাই।

স্বামীজি শিশুর মতো হো-হো করে হাসতে লাগলেন।

॥ উনিশ ॥

নির্দিষ্ট দিনে সীতানাথ ফিরল।

ফিরল বটে, কিন্তু সেখানে প্রথম দর্শনেই টের পেলে এই মাস দুয়েকেই তার বেশ খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে,—দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে সিগারেট খাওয়া এবং কথা বলবার ভঙ্গি পর্যন্ত। মানুষের জীবনে দু মাস কিছুই নয়। কিন্তু যে বদলাতে চায় তার পক্ষে দু মাসই যথেষ্ট। দু মাস আগে সীতানাথের যে ঢিলাঢিলা স্বভাব ছিল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অহল্যা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে, তার অনেক বদল হয়েছে।

স্টেশন থেকে ফিরেই সে স্নানের ঘরে ঢুকল। এবং সেখান থেকে বেরিয়ে এসেই অহল্যাকে চায়ের জন্যে বলে অংশুমানকে টেলিফোন করতে বসল :

—হ্যালো! আমি সীতানাথ চৌধুরী। কেমন আছেন ?

—আধ ঘণ্টা হল।

—ভালো আছে।

—হ্যাঁ, একটা পরীক্ষা তো সামনেই। ভালোভাবেই পাস করবে আশা করি।

—প্রায়ই দেখা হত। কিছু জিনিস পাঠিয়েছে আপনার জন্যে।

—হ্যাঁ।

—লাঞ্চে দেখা হচ্ছে তো ? তখন সব কথা হবে।

একতরফা কথা হল। অহল্যা বুঝলে অংশুমানের সঙ্গে কথা হচ্ছে। বুঝলে স্বপ্নার প্রসঙ্গও এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু শুধু সীতানাথের কথা থেকে সবটা বুঝতে পারলে না। তার জন্যে কোনো কৌতূহলও বোধ করলে না।

জিজ্ঞাসা করলে, পোশাক পরলে যে ? কোর্টে বেরুবে না কি ?

—নিশ্চয়।

—ট্রেনের ধকল গেছে সারা রাত্রি। এই তো এলে, আজ নাই যেতে।

সীতানাথ হাসলে। বললে, অহল্যা, জীবন এত সহজ নয়। ট্রেনের ধকল দূরের কথা, কোনো মানুষের জন্যেও অপেক্ষা করার সময় নেই। মানুষ

একলা চলে। কে কখন তার পাশে এসে দাঁড়ায় কিছুরই স্থিরতা নেই। এইটে দেখে এলাম ইউরোপে।

আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে সীতানাথ বলে চলল: সেখানে কারও ওপর কারও মমতা নেই। কোনো সম্পর্কই চিরস্থায়ী নয়। চলার পথে কেবলই ঘন ঘন বদল হচ্ছে। তার জন্যে কেউ শোকও করে না।

অহল্যা ওর কথার ভিতর দিয়ে ওকে লক্ষ্য করছিল। বললে, তুমি যা বলছ সেইটেই হয়তো ওদের সত্যিকার রূপ নয়। দু'দিনের জন্যে যারা যায়, তাদের হয়তো অমনি ভুল বোধ হয়।

সীতানাথ বললে, না। ওরা কাজের লোক। আমাদের মতো বসে ঝিমোয় না, ধানাই-পানাই ভাবেও না। ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেবার ওদের অবকাশ নেই।

অহল্য প্রতিবাদ করলে না। ইউরোপ তার আদর্শ নয়। তারা যেমনই হোক, তা নিয়ে তার মাথাব্যথাও নেই।

শুধু বললে, তা হবে।

উৎসাহের সঙ্গে সীতানাথ বললে, তাই বলে দিনরাত্রি শুধু যে ওরা কাজই করে তাও নয়। কাজের সময় যেমন অনন্যচিত্তে কাজ করে, অবকাশের সময়ও তেমনি আনন্দ করতে জানে, ছুটিও জানে।

অহল্যা হেসে বললে, মোটামুটি তো একই দাঁড়াল।

—কী করে?

—ওদের জীবনে আধখানা কাজের ঠাস-বুনুনি আর বাকি আধখানা ফাঁকা। আমাদের সবটা মিলে ঢিল-বুনুনি। মোটামুটি একই দাঁড়াল না?

একটু চিন্তা করে সীতানাথ বললে, না, এতে বোঝা যায় ওদের আর আমাদের জীবনদর্শন পৃথক।

—সে তো বটে,—অহল্যা কথার মোড় ঘুরিয়ে বললে,—তা হলে খেয়ে যাবে তো?

সীতানাথ উঠতে উঠতে বললে, না। হোটেলে খেয়ে নোব। ভরপেট খেয়ে গিয়ে কাজ করা যায় না।

ওকে উঠতে দেখে অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, ফিরবে কখন?

ভ্রূ কুঁচকে হিসাব করে সীতানাথ বললে, কোর্ট থেকে ফিরতে দেরি হবে না। তারপরে স্নান করে চা খেয়ে সাবু অংশুমানের ওখানে যেতে হতে পারে।

—লাঞ্চে তো দেখা হবে। তারপরেও যেতে হবে?

—যেতে হতে পারে বললাম। যদি যেতে হয়, তা হলে কখন ফিরব বলা কঠিন।

আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে সীতানাথ বেরিয়ে গেল।

সীতানাথ বিলাত যাওয়ার আগে দীর্ঘকাল তার চোখের সামনেই ছিল। কিন্তু কোনোদিন তার লক্ষ্যের বস্তু ছিল না। সে কী করছে, কেমন করে করছে, কোনোদিন লক্ষ্য করে দেখার কৌতূহল বোধ করে নি। বিলাত থেকে ফিরে তার কাছে ওর মূল্য কি বেড়ে গেল!

অহল্যা লক্ষ্য করলে, ইংরাজীতে যাকে chained smoker বলে, সীতানাথ তাই হয়েছে। তার দেশলাই দরকার হচ্ছে না। ফুরিয়ে-আসা সিগারেটের আগুনে নতুন সিগারেটটা ধরাচ্ছে। বিলাতী অগ্নিহোত্রী আর কি!

লক্ষ্য করলে, লম্বা লম্বা পা ফেলে বেশ দ্রুতবেগে এখন হাঁটছে সে।

কোর্টে সেদিন সীতানাথের কাজ কিছু ছিল না। কয়েকটা বড় মামলা বিলাত যাওয়ার আগে ফেলে গিয়েছিল। জুনিয়ারকে বলে গিয়েছিল, সেগুলোর দিন নিতে। কোর্ট লম্বা দিন দিয়েছিল। জুনিয়ারের সঙ্গে সে বিষয়ে আলাপ করা এবং মক্কেলদের তার আসার খবর দিয়ে যোগাযোগ করা।

কিন্তু সে সব কোথায় পড়ে রইল। জুনিয়ার মামলার কথা বলবার ফাঁক পেলে না। মক্কেলদের তো কথাই নেই। বার-লাইব্রেরিতে সীতানাথ পা দেওয়ামাত্র বার-লাইব্রেরি যেন ভেঙে পড়ল।

যারা তার সিনিয়র, যারা তার সমবয়সী এবং যারা তার জুনিয়র সবাই হুড়মুড় করে তাকে ঘিরে ধরল। আর—

কখন ফিরলে? কেমন দেখলে? কেমন লাগল? কেমন ছিলে?—প্রশ্নের পর অনর্গল প্রশ্ন। উত্তর দেবার ফাঁক নেই। একদল আসে, একদল যায়। সীতানাথ হাঁপিয়ে উঠল। তার উত্তর কেউ শুনতে চায় না। সকলেই অবিশ্রান্ত কেবল প্রশ্ন করে চলে।

বাইরের লোক, মক্কেল, তারাও ভিড় আর কোলাহল দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন

করে: কী ব্যাপার? জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছেন না কি? ইংরেজ আমলে জেল যাওয়ার চেয়ে বড় সম্মান আর ছিল না। সীতানাথের সম্মানপূর্ণ অভ্যর্থনা দেখে তাদের সেই রকমই মনে হয়েছিল।

শুনলে, তা নয়। ভদ্রলোক প্রিভি কাউন্সিলে একটা জটিল মামলা বুঝিয়ে দেবার জন্যে বিলেত গিয়েছিলেন। আজ ফিরেছেন।

বিস্ফারিত চোখে তারা সীতানাথকে দেখে নিলে। প্রিভি কাউন্সিলে যাঁরা আইন-ব্যবসা করেন তাঁরা অসামান্য লোক নিঃসন্দেহে। তাঁরা তো সাহেবই। তাঁদের মামলা বুঝিয়ে দিতে যারা যায়, ছোট আদালতে প্র্যাকটিস করলেও তারা যে প্রায় তাঁদেরই সমকক্ষ এই তাদের ধারণা হয়। এবং সেই সশ্রদ্ধ বিস্ময় তাদের চোখে ফুটে উঠল।

আজ সীতানাথের কোর্টে কাজ কিছু ছিল না বটে, কিন্তু যা হল তাতে তার মর্যাদা লক্ষগুণ বেড়ে গেল।

বন্ধুদের হাত থেকে কোনোক্রমে ছাড়া পেয়ে সীতানাথ লাঞ্চে গেল। সেখানে সার্ অংশুমান স্মিতহাস্যে তাকে অভ্যর্থনা জানালে।

অংশুমানকে দেখে সীতানাথ চমকে উঠল। এই দু মাসের মধ্যে তাকে অসম্ভব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মাথার টাক প্রশস্ততর হয়েছে। কানের পাশে পাকা চুলগুলো স্পষ্টতর হয়েছে। মুখখানিও কী রকম শীর্ণ!

সীতানাথ জিজ্ঞাসা করলে, আপনার শরীর কি ভালো নেই?

অংশুমান হাসলে: কেন, যেমন রোজ থাকি তেমনিই তো আছি।

—কী রকম শ্রান্ত দেখাচ্ছে!

—শ্রান্ত দেখানোর কি দোষ আছে? সমস্ত দিন অসুরের মতো কী পরিশ্রম যে করতে হয়, তা তো জানেন না।

—জানি না, তবে অনুমান করতে পারি। বড় হতে গেলে, বড় শ্রমস্বীকার করতে হয়।

স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে অংশুমানের উৎসাহ চিরদিনই কম। সে তৎক্ষণাৎ কাজের প্রসঙ্গে নামল:

—তারপরে, মামলার কী অবস্থা?

মামলার অবস্থা ভালোই। সার্ চার্লস প্রায় নিশ্চিত করেই বলেছেন যে মামলায় জিত হবে। সীতানাথ মামলার ব্যাপারটা বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। অংশুমান যে খুব মন দিয়ে শুনছিল তা মনে

হচ্ছিল না। কিন্তু শেষের দিকে যখন অংশুমান দু-একটা প্রশ্ন করলে, সীতানাথ অবাক হয়ে গেল।

বুঝলে, লোকটা অসাধারণ বুদ্ধিমান। এবং আইন সম্বন্ধে যদিচ তার বিশেষ জ্ঞান নেই, সাধারণ বুদ্ধিটা অত্যন্ত প্রখর।

সবশেষে অংশুমান জিজ্ঞাসা করলে স্বপ্নার খবর: পড়াশোনা কী রকম হচ্ছে তার?

সীতানাথ সে সম্বন্ধেও বিস্তৃত বিবরণ দিলে। বললে, ও-দেশের পড়াশোনার পদ্ধতিটাই অন্যরকম। প্রত্যেককে প্রচুর খাটতে হয়। ফাঁকি দেবার কোনো উপায় নেই।

—আপনার সঙ্গে দেখা হত প্রায়ই?

—প্রায়ই হত না। মামলাটা তৈরি করার জন্যে সার্ চার্লসের নির্দেশে আমাকেও প্রচুর খাটতে হত, কলেজের পড়ায় তাকেও। রবিবার বিকেলটা একসঙ্গে কাটানো যেত।

—অসুবিধা হচ্ছে না কিছু?

—কিছুমাত্র না। তবে এ দেশের মেয়ে ওদের অপরিচিত পরিবেশে গিয়ে প্রথমটা একটু অসুবিধা ভোগ করেই। সেটা পরে থাকে না।

ও দেশের ছাত্রছাত্রী, খানাপিনা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধেও সীতানাথ একটা নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দিলে।

অংশুমান বললে, দেশের জন্যে মন-কেমন করছে না তো?

—না, না।

—আপনি যতদিন ছিলেন সে ভালোই ছিল সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি চলে আসার পরে কেমন থাকবে, সেইটেই চিন্তা।

সীতানাথ তাড়াতাড়ি জোরের সঙ্গে বললে, না, না। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সে বেশ শক্ত মেয়ে।

—আর তো কিছু নয়।—সার্ অংশুমান উঠতে উঠতে বললে,—কোম্পানির টাকায় গেছে। কিছু না করে ফিরে এলে আমিও লজ্জা পাব, ডিরেক্টররাও বিরক্ত হবেন, ভবিষ্যতে অন্যের যাওয়াও বন্ধ হবে।

ওর পিছু পিছু আসতে আসতে সীতানাথ বললে, সেটা সে বোঝে। আমাকে বলেছেও কতদিন। যথেষ্ট পরিশ্রম করছে। আমার বিশ্বাস, সে বেশ ভালোই ফল করবে।

সার্ অংশুমানকে গাড়িতে তুলে দিয়ে সীতানাথ আর-একবার কোর্টে গেল। সেখানে আরও কিছুক্ষণ থেকে বাড়ি ফিরে এল। পোশাক ছেড়ে, চা খেয়ে আবার বেরুল।

সীতানাথ বেরিয়ে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরেই সিঁড়ি থেকে শব্দ পাওয়া গেল: কই গো, সাহেব কোথায়? আমরা সাহেব দেখতে এলাম।

সুজাতার গলা। পায়ের শব্দে বোঝা গেল শুধু বউদি নয়, পিছনে দাদাও আছে।

—কোথায় গেল সাহেব?

ওদের অভ্যর্থনা জানিয়ে অহল্যা হাসতে হাসতে বললে, অল্পক্ষণ হল বেরিয়েছেন।

—বেরিয়েছে কী গো! এসে-এসেই বেরুনো!

ইন্দ্রনাথ বললে, কাজের লোক। ওদের তো বসে থাকলে চলে না।

সুজাতা কৃত্রিম কোপে বললে, তাই বলে এসে-এসেই বেরুতে হবে! একটা দিনও না বেরুলে চলবে না!

অহল্যা হেসে বললে, তা হলে শোন: স্টেশন থেকে বাড়ি পৌছুলেন সাড়ে ন'টায়। দশ মিনিটের মধ্যে বাথরুমে ঢুকলেন। বেরিয়ে এসে চা খেয়েই কোর্টে ছুটলেন। চারটের সময় ফিরে এসে চা খেয়ে পাঁচটার মধ্যেই আবার উধাও।

—তা হলে তোমার সঙ্গেই বলতে গেলে ভালো করে দেখা হয় নি?

—কই আর হল!

স্বামীর দিকে চেয়ে বললে, এইখানে থেকেই ঠাকুরঝির সঙ্গে যদি দেখা না হয়ে থাকে, তা হলে অতদূর থেকে আমরা আর কী করে দেখা পাব বল?

ইন্দ্রনাথ বললে, আমরা তা হলে আর বসব না অহল্যা। এখান থেকে আরও কয়েকটা জায়গা ঘুরে বাড়ি ফিরব।

—আর-একটু বসবে না?

—কিন্তু সে কি এখন ফিরবে?

—কী করে বলব? কিছুই বলে যান নি।

—তা হলে আজ থাক্, আর-একদিন আসব।

ওরা চলে যাবার পরেই দয়ানন্দ স্বামী ফোন করলেন:

—সীতানাথের আজ ফেরবার কথা ছিল, পৌছেছেন ?

—হ্যাঁ বাবা। সকালেই পৌছেছেন।

—শরীর বেশ ভালো আছে ?

—ভালোই তো বোধ হল।

—বেশ, বেশ। তোমার শরীর বেশ ভালো ?

—আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি।

—ছেলেমেয়েরা ?

—সব ভালো।

—আচ্ছা মা। বাবাজিকে আমার আশীর্বাদ দিও।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হল। একটু পরেই সীতানাথ ফিরে এল। উপরে গিয়ে অহল্যাকে দেখতে পেলে না।

মেয়ে বললে, মা পুজোয় বসেছেন।

—পুজোয় !—সীতানাথ অবাক,—পুজো কী ?

মেয়ে বুঝিয়ে দিলে, মা তো মন্ত্র নিয়েছে কিনা। এলে দেখবে, কী সুন্দর গুরুদেব !

—তার পরে ?

—তার পর থেকে মা সকাল-সন্ধ্যে পুজোয় বসেন।

—আচ্ছা !—সীতানাথ খুব কৌতুক বোধ করছিল,—কখন বসেছেন ?

—একটু আগে।

—কখন পূজা শেষ হবে ?

—ন'টার কম নয়। কোনো কোনো দিন তারও চেয়ে বেশি দেরি হয়।

—বাঃ !

হাসতে হাসতে সীতানাথ নীচে নামতে লাগল।

মেয়ে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি আবার বেরুচ্ছ বাবা ?

—না মা, নীচে বসছি।

—তোমাকে কি চা পাঠিয়ে দোব ?

—একটু দিও।

যারা খবর পেয়েছে, এমন দু-একজন মক্কেল এল এর পর। কারও কাজ কিছু ছিল না বিশেষ। তাদের বিদায় করে সীতানাথ লাইব্রেরি-ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলে।

পূজা শেষ করে অহল্যা সেই ঘরে ঢুকেই কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সীতানাথ মদ্যপান করছে।

ওকে দেখে হাসতে হাসতে বললে, এটি সার্ চার্লসের কীর্তি। উনিই ধরিয়েছেন। ও-দেশে সবাই খায়, তাতে দোষ কিছু নেই। তা ছাড়া, সার্ চার্লস বলেন, যাদের অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনা করতে হয়, তাদের পক্ষে একটুখানি খাওয়া স্বাস্থ্যকর। কথা বলছ না যে! তুমি কি রেগে গেলে?

অহল্যা যেন পাথর হয়ে গেছে। সাড়া দিতে পারলে না।

॥ কুড়ি ॥

তারপরে অংশুমান আর-একদিনও অহল্যার বাড়ি যায় নি। অহল্যাও আসে নি। অবশ্য সে যে আসবে না তা তো জানা কথা। সে আসবে না। কী একটা তার হয়েছে। অংশুমানের সন্দেহ, অহল্যা সীতানাথের প্রেমে পড়েছে। যদিচ সীতানাথকে দেখে তা বলে মনে হয় না। কিংবা ওই গুরুদেবের ব্যাপারটাও হতে পারে।

সীতানাথও একদিন হাসতে হাসতে এই প্রসঙ্গ তুলেছিল: জানেন, আপনার বোন এর মধ্যে আবার একটা গুরুদেব সংগ্রহ করেছেন!

সাগ্রহে অংশুমান জিজ্ঞাসা করেছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুনেছি বটে। কী ব্যাপারটা বলুন তো?

হাত উলটে সীতানাথ উত্তর দিয়েছিল, কী করে জানব বলুন? বিলেত থেকে ফিরে এসে শুনি, দীক্ষা নিয়েছেন। সকাল-সন্ধ্যে পুজো। যেমন-তেমন পুজো নয়, দু'ঘণ্টা-আড়াই ঘণ্টা ধরে।

পরিহাস করে অংশুমান বলেছিল, আপনি ছিলেন না, হাতের কাছে আর-কোনো কাজ না পেয়ে হয়তো এই খেলায় মেতেছে।

বাধা দিয়ে সীতানাথ বলেছিল, না না, খেলা নয়। আমার শ্বশুর মশায়েরও শুনেছি এ বাতিক ছিল।

অংশুমানের মনে পড়ল, ছিল। বাতিকই বটে। কোনো মতে সংসার চালিয়ে বাকি সমস্ত টাকা গুরুর পিছনে ব্যয় করতেন। সেই বাতিকই কন্যা হয়তো উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। পাবার বয়সও এইটে।

জিজ্ঞাসা করেছিল, দেখেছেন এঁকে?

—না। শুনেছি নাকি খুব সুন্দর।

সুন্দর! হ্যাঁ নিশ্চয়, সুন্দরই তো হবে। মেয়েদের বয়সে যখন ভাঁটা পড়ে আসে তখন সেই সঙ্গে চিরাচরিত সমস্ত আকর্ষণও শিথিল হয়ে আসে। তখন অন্য একটা কিছু চাই। হয়তো গুরুদেব। এবং নিশ্চয়ই একটি সুন্দর গুরুদেব। তপ্ত কাঞ্চনের মতো উজ্জ্বল বর্ণ, ঢুলু-ঢুলু চোখ, মধুরভাষী একটি গুরুদেব। ধর্মের নামে এই আনন্দের মধ্যে বাকি জীবনটা কাটাতে বেশ লাগে।

সীতানাথ বলে চলেছিল: আমার বড় শালা ইন্দ্রনাথবাবুর এই বাতিক আছে। ইনি তাঁরই গুরুদেব। এখন ভাই-বোন দু'জনের কাঁধেই চেপেছেন।

—চাপবেনই তো!—অংশুমান বলেছিল,—সুযোগ পেলে কে ছাড়ে বলুন? আপনার বাড়ি আসেন মাঝে মাঝে? আহারাদি করেন? প্রসাদ-টসাদ পান? কীর্তনানন্দ হয়?

—আমার চোখে তো পড়ে নি।

অংশুমান বলেছিল, একটা খুব ভুল হয়ে গেছে সীতানাথবাবু।

—কী ভুল?

—এই সব ব্যবসা-বাণিজ্য, দৌড়-ঝাপ না করে একটা গুরুদেব হয়ে বসতে পারলে কাজ হত। নিদেন একটা ভালো গুরুর চেলা। নির্ঝঞ্ঝাটে জীবনটা কাটানো যেত।

—যা বলেছেন!

সীতানাথ তা হলে গুরুদেবকে দেখে নি। কীর্তনও শোনে নি। অংশুমানের ইচ্ছা করে ভদ্রলোককে দেখতে। কী আছে তাঁর কাছে, যাতে করে অহল্যার মন বেঁধেছেন!

অংশুমান জিজ্ঞাসা করেছিল, ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা করে তো? না পূজো-আচ্চা নিয়েই থাকে?

সীতানাথ হেসেছিল: এইবার বিপদে ফেললেন!

—কেন?

—ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার কালে-ভদ্রে দেখা হয়। কী করে জানব তাদের দেখাশোনা কেউ করে কি না।

অংশুমান বুঝেছিল, গুরুদেব সম্বন্ধে তার নিজের যে মনোভাব, সীতানাথের মনোভাব তত বিরূপ নয়। গুরুদেব একটা জুটেছে। যেমন করেই হোক জুটে গেছে। এটা সে পছন্দ করে না। কিন্তু এ নিয়ে বিশেষ মাথাও ঘামায় না। তা যদি হত, তা হলে গুরুদেব সম্বন্ধে সে নিশ্চয় সতর্ক থাকত। কে তিনি, কোথায় থাকেন, কী করেন, কেমন লোক—এ সব খোঁজ-খবর রাখত।

খোঁজ-খবর অংশুমানও রাখে না। কিন্তু সেটা সময়াভাবে। সময় থাকলে খবর নেবার চেষ্টা করত। ইচ্ছা হয়।

ইচ্ছা হয় অহল্যার কাছে যেতেও। তার সংসারের মধ্যে তাকে দেখতে। যেখানে সে ছেলেমেয়ের মা, গৃহের গৃহিণী, স্বামীর স্ত্রী। হয়তো সহ্য করতে কষ্ট হবে, কিন্তু এমন ইচ্ছাও হয় যে, গিয়ে দেখে আসে সীতানাথকে সে সামনে বসে কেমন করে খাওয়াচ্ছে! কিন্তু তার উপায় নেই।

অথচ উপায় ছিল। একেবারে তার মুঠোর মধ্যে। ইচ্ছা করলে অহল্যাকে সে বিবাহ করতে পারত।

দুপুরে অংশুমানের অফিসে সিদ্ধিনাথ গুট গুট করে এসে উপস্থিত হল। সাধারণত এভাবে সে আসে না। অংশুমানের অফিস-ঘরে ঢুকতে গেলে যাদের কার্ড দিতে হয় না, সিদ্ধিনাথ তাদের দলে। অংশুমানের সঙ্গে তার খাতির কতখানি তা বেয়ারা থেকে আরম্ভ করে পদস্থ কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই জানে। ধনী এবং অভিজাত হিসাবে সকলেই তাকে খাতির করে। সেও সেই মেজাজেই অংশুমানের ঘরে ঢোকে। ঢোকামাত্র অংশুমান সমাদরে তাকে অভ্যর্থনা করে।

কিন্তু আজ সে ঘরে ঢুকল গুট গুট করে। যেন চোরের মতো। মুখের ভাব, চোখের চাহনি, এমন কি পায়ের গতি পর্যন্ত চিন্তাকুল। সাবু অংশুমান তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইলে।

সিদ্ধিনাথ জিজ্ঞাসা করলে, ভালো আছেন?

দেখামাত্র এই মামুলি প্রশ্ন সিদ্ধিনাথ সর্বত্রই করে থাকে। শুনলে মনে হয়, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি ভালো ছিল না, অথবা ভালো থাকার কথা নয়। কিন্তু সে রকম কোনো অর্থ এর পিছনে নেই। নিতান্ত অর্থহীন এই প্রশ্ন নিয়ে সিদ্ধিনাথ কথা আরম্ভ করে।

অংশুমান তা জানে। সুতরাং এ প্রশ্নের আর উত্তর দিলে না। বরং প্রতিপ্রশ্ন করলে, আপনাকে এ রকম দেখাচ্ছে?

ঈষৎ হেসে সিদ্ধিনাথ উত্তর দিলে, এই রকমই দেখাবে।

এ বিষয়ে অংশুমান আর মাথা ঘামাতে চাইল না। অন্য প্রশ্ন করলে: অনেক দিন পরে এলেন। এখানে ছিলেন না নাকি?

—না।

—কোথায় গিয়েছিলেন?

সিদ্ধিনাথ যেন মেপে মেপে কথা বলছে. যেন উকিলের জেরার সম্মুখীন। আর সেই সঙ্গে কী রকম ইতস্তত করছে।

বললে, একবার দেশে গিয়েছিলাম।

—হঠাৎ ঠিক নয়. তবে একবার হঠাৎই।

অংশুমান উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিল। সিদ্ধিনাথ এ রকম করে কথা বলছে কেন; ওর মস্তিষ্ক সুস্থ আছে তো ?

উদ্বিগ্ন ভাবেই প্রশ্ন করলে : বাড়ির খবর ভালো তো ?

—ভালো !—সিদ্ধিনাথ অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাসলে,—ভালো আর কী ক'রে হবে ? বাবার বয়স হয়েছে, শরীর জীর্ণ, সেজন্যে কিছু নয়। কিন্তু গৃহিণী,

সিদ্ধিনাথ থামলে।

উদ্বিগ্ন ভাবে অংশুমান জিজ্ঞাসা করলে, তিনি কেমন আছেন ?

—ভালো বললে ভালো, মন্দ বললে মন্দ।—সিদ্ধিনাথ নির্লিপ্ত ভাবে উত্তর দিলে।

অংশুমান বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে. তার মানে ?

—তার মানে, তিনি তো দীর্ঘকাল থেকে ভুগছেন। তা প্রায় বছর পাঁচেক হবে। ডাক্তারে জবাব দিয়েছেন বাঁচার আশা নেই। কিন্তু কবে মারা যাবেন তা ভগবান ছাড়া কেউ জানেন না।

সিদ্ধিনাথ চুপ করে রইল।

অংশুমানও। কী বলতে চায় সিদ্ধিনাথ ? কী কামনা করছে সে ? স্ত্রীর সুস্থ নীরোগ জীবন, অথবা মৃত্যু ? তার গৃহিণী যে চিররুগ্ন মতন হয়ে আছেন তা অংশুমান জানত না। এ প্রসঙ্গ কোনোদিন ওঠে নি। সিদ্ধিনাথও তার পারিবারিক জীবনের এই অস্থযোগ কোনোদিন প্রকাশ করে নি

অনেকক্ষণ পরে সিদ্ধিনাথ বললে, সেইজন্যেই গিয়েছিলাম।

অর্থটা স্পষ্ট হল না। অংশুমান বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, কী জন্যে ?

—আর কতদিন তিনি কষ্ট দেবেন সেইটে জানতে।

কী ভয়ানক ! অংশুমান চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল আর কি বললেন, জিগ্যেস করলেন ?

—করলাম।

—কী জবাব দিলেন ?

—শুধু মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলেন। বললেন, আমার আপত্তি নেই। তুমি আর-একটা বিয়ে করতে পার। শুধু,

আগ্রহে অংশুমানের গলা লম্বা হয়ে এসেছিল। রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে, শুধু ?

—শুধু এখানে, আমার সামনে, ছেলেমেয়েদের সামনে এনো না।

—বললেন !

—হ্যাঁ। আমিও তাতে রাজি হয়েছি। আসলে তাঁর মত পাওয়া যে কঠিন হবে না, এ আমি জানতাম।

—কী করে জানতেন ? হিন্দু সতী সাধ্বী স্ত্রী

বাঁ হাত তুলে শেষ কথাগুলো উড়িয়ে দিয়ে সিদ্ধিনাথ বললে, না, না, সেজন্যে নয়।

—তবে ?

একটু ভেবে সিদ্ধিনাথ বললে, আসল কথা কী জানেন, পনেরো বৎসর আমাদের বিয়ে হয়েছে, ছেলে-মেয়ে হয়েছে, কিন্তু ভালোবাসা কাকে বলে প্রথম জানলাম কলকাতায় এসে।

অংশুমান আর পারলে না। এবারে সত্য সত্যই লাফিয়ে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় ? কোথায় ?

নতমুখে সিদ্ধিনাথ জবাব দিলে, মিসেস হিগিন্সের কাছে।

—কী সর্বনাশ ! মিসেস হিগিন্স !

অংশুমানের বাক্যের পশ্চাতে যে অর্থ লুকিয়ে ছিল তা সিদ্ধিনাথের অবিদিত নয়। কিন্তু তা যেন সে গ্রাহ্যই করলে না। হয়তো শুনতেই পেলে না। নিজের আগেকার কথার জের টেনে সিদ্ধিনাথ বলে চলল :

—জানলাম ভালোবাসার রূপ কী। কী চায় আর কী না পেলে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, কবে জানলাম জানেন ?

অংশুমান নিঃশব্দে ওর দিকে চেয়ে রইল। জবাব দেবার কথা ভুলেই গেল।

সিদ্ধিনাথ বললে, যেদিন আপনার মুখে শুনলাম, রিটা বলে গেছে, স্বামী ছাড়া তার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব।

এতক্ষণে অংশুমান যেন সম্বিৎ ফিরে পেলে রিটা হিগিন্সের প্রসঙ্গ ওঠায়। হেসে বললে, হ্যাঁ। বলে গেছে। কিন্তু ভালোবাসার কথা নয়,

স্বামীর কথা। তার স্বামী চাই। মিঃ হিগিন্সের মতো যেমন-তেমন একটা স্বামী হলেও চলবে।

ভুরু কুঁচকে অংশুমান হাসতে লাগল।

সেই হাসিতে সিদ্ধিনাথ খানিকটা জমে গেল। তখন-তখনই জবাব দিতে পারলে না। একটু পরে বললে, স্বামী শব্দের দ্বারা রিটা কী বলতে চেয়েছিল জানি না। কিন্তু আমি বলব না, বলব ভালোবাসা। বলব ভালোবাসা ছাড়া মানুষের জীবন শুকিয়ে যায়। তার আর কোনো মানে থাকে না।

—আচ্ছা! সিগারেট-কেসটা সিদ্ধিনাথের দিকে অংশুমান এগিয়ে দিলে। —তা হলে এখন কী করবেন ভাবছেন? স্ত্রীর অনুমতি তো পাওয়া গেছে।

—হ্যাঁ। ভাবছি বিবাহ করব।

—বিবাহ!—অংশুমান যেন একটু বিরক্ত হল,—কেন, নির্বন্ধন ভালোবাসায় অসুবিধা কী?

একটু ভেবে সিদ্ধিনাথ বললে, আমার অসুবিধা নেই। কিন্তু অন্য পক্ষের আছে।

—অন্য পক্ষটি কে?

—রিটা।

রিটা! অংশুমান আর একবার লাফিয়ে উঠল। কিন্তু যে কথা তার মুখে এসে গিয়েছিল তা সামলে নিলে। নিঃশব্দে সিদ্ধিনাথের দিকে চেয়ে রইল।

সিদ্ধিনাথ বললে, রিটা বিবাহ ছাড়া আর কিছুতে রাজি নয়। কিন্তু তাতেই একটা বিঘ্ন দেখা দিয়েছে।

—বিঘ্নটা কী?

—এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে সিভিল ম্যারেজ হয় না।

—তা হলে?

মেঝের কার্পেটের উপর নিঃশব্দে হাতের লাঠিটা কয়েকবার ঠুকে সিদ্ধিনাথ বললে, রিটা হিন্দু-বিবাহের প্রস্তাব করেছে।

—তা কী করে হয়? সে তো কৃশ্চান।

—বলছে হিন্দু হতে তার আপত্তি নেই। এখন তো শুদ্ধি হয়েছে। অর্থাৎ স্বামী একজন তার চাইই।

অংশুমান জিজ্ঞাসা করলে, তা হলে সেই ব্যবস্থাই স্থির করছেন?

—ক্ষতি কী?

—লাভ-ক্ষতির কথা আপনার বিবেচ্য।—অংশুমানের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ উষ্মা সূচিত হল।—কী স্থির করলেন তাই জানতে চাইছি।

সিদ্ধিনাথ বললে, মোটামুটি একটা স্থির করেছি। কিন্তু পাকাপাকি করার আগে আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি। আপনি কী বলেন ?

অংশুমান বললে, আমি কিছু বলি না সিদ্ধিনাথবাবু। এক্ষেত্রে আমার পরামর্শও নিষ্প্রয়োজন ; তবে যাই করুন, ভালো করে ভেবে-চিন্তে করবেন।

নিঃশব্দে চিন্তিত মুখে সিদ্ধিনাথ মাথা নেড়ে সায় দিলে।

সন্ধ্যার শো'তে লটিকে নিয়ে অংশুমানের সিনেমায় যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে লটি এসে দেখে একখানা ইজি-চেয়ারে অংশুমান অফিসের পোশাকেই নিশ্চেষ্ট শুয়ে। সিনেমায় যাবার প্রস্তুতি চোখে পড়ল না।

সবিস্ময়ে লটি বললে, ও কী! এখনও তৈরি হয়ে নাও নি ?

ঈজি-চেয়ারের হাতলের উপর লটিকে বসবার জন্যে ইঙ্গিত করে অংশুমান বললে, আজ সিনেমা থাক্ লটি।

—কেন, টিকেট কর নি ?

—টিকেট করেছি। কিন্তু কেমন যেন উৎসাহ বোধ করছি না।

লটি লক্ষ্য করলে, ওর স্বর অসম্ভব ক্লান্ত। এমন সাধারণত দেখা যায় না। মেয়েদের দেখলেই অংশুমানের চোখ শিকারী বেরালের মতো জ্বলে ওঠে। কিন্তু আজ যেন নিষ্প্রভ।

জিজ্ঞাসা করলে, শরীর ভালো আছে তো ?

—শরীর ভালোই আছে। কিন্তু সিদ্ধিনাথ এসে কেমন যেন সব মিইয়ে দিয়ে গেল।

—কেন, মিইয়ে দিলেন কী করে ?

—বলছি। তার আগে এইখানে বস। অংশুমান চেয়ারের হাতলে বসবার জন্যে ফের ইঙ্গিত করলে।—আমার একটা কথার উত্তর দেবে ?

জিজ্ঞাসা করলে, কী কথা ?

—তুমি ভালোবাসায় বিশ্বাস কর ?

—বলব না।

লটি খিল খিল করে হেসে উঠল।

—কেন বলবে না ?

—আমার খুশি।

অংশুমান চুপ করে রইল।

লটি ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার হেসে উঠল: তোমার আজ কী হয়েছে বল তো?

—ওই যে বললাম, সিদ্ধিনাথবাবু এসে সব মিইয়ে দিয়ে গেছেন।

—কিন্তু কী করে, তা কই বললে?

চেয়ারে অংশুমান সোজা হয়ে উঠে বসল। বললে, ভদ্রলোক আবার একটা বিয়ে করতে যাচ্ছেন।

—আবার একটা মানে? একটি রয়েছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। তিনি চিররুগ্না, মরবার নাম করছেন না। তবে এই দিক দিয়ে ভালো বলতে হবে, স্বামীকে আর-একটি বিবাহের অনুমতি দিয়েছেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

লটি বললে, একালে কোনো স্ত্রী এ রকম অনুমতি দিতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না।

—কিন্তু এর পরেরটি আরও বিস্ময়কর: সিদ্ধিনাথবাবু বিয়ে করতে যাচ্ছেন আর-কাউকে নয়, স্বয়ং মিসেস হিগিন্সকে।

—বল কী!

—হ্যাঁ। মিসেস হিগিন্স শুদ্ধি হয়ে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করবে। তখন হিন্দু-মতে বিয়ে হবে। কারণ স্ত্রী বর্তমানে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয় না।

লটি বড় বড় চোখ মেলে অবাক হয়ে অংশুমানের দিকে চেয়ে রইল। কিছুতেই কথাটা সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

অবশেষে বললে, ঠাট্টা করছ?

—মোটেই না। আজ দুপুরে আমার অফিসে এসে নিজে বলে গেলেন। কথাটা সেই থেকেই ভাবছি। কেন এমন হয়? ভেবেছিলাম, তুমি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, হয়তো তোমার কাছ থেকে কিছু হদিস পাব।

লটি অন্য কথা ভাবছিল। বললে, কিন্তু তুমি কৌশলে মিসেস হিগিন্সকে নিরস্ত করেছ শুনে ভদ্রলোক কী আশ্বস্তই হয়েছিলেন!

—সত্যি।

—তা হলে এখন আবার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন?

—যতদূর বোঝা গেল, মিসেস হিগিন্সের যেমন স্বামী ছাড়া একটি দিনও চলবে না, ভালোবাসা ছাড়া সিদ্ধিনাথবাবুরও তেমনি অবস্থা।

—সেই ভালোবাসার সাধ মিটবে মিসেস হিগিন্সের কাছ থেকে, তার চতুর্থ-না-পঞ্চম স্বামী হয়ে?

—ভদ্রলোক বললেন কী জান?

—কী?

—মিসেস হিগিন্সের কাছ থেকেই উনি নাকি প্রথম ভালোবাসার স্বাদ পেলেন!

লটি হো-হো করে হেসে উঠল: পাগল! বদ্ধ পাগল!

—হতে পারে। ওঁকে যদি না চিনতাম তা হলে বলতাম, মিথ্যেবাদী, শয়তান।

—তা নয়?

—না। এবং সম্ভবত পাগলও নয়।

—কী তবে?

—জানি না। ভালোবাসা কাকে বলে খবর পেলে হয়তো একটা বিশেষণ চেষ্টা-চরিত্র করে যোগাড় করতে পারতাম। কিন্তু খবরটা তো তুমি দিলে না।

অংশুমান একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে।

লটি হেসে উঠল: আমিই কি জানি যে খবর দোব!

—তুমিও জান না?

—না।

—কী আশ্চর্য!

—আশ্চর্য কিছুই নয়।—লটি ওর কাঁধের উপর একখানা হাত রাখলে। —সত্যি কথা বলব?

—বল।

—নির্ভয়ে?

—নিশ্চয়ই।

শান্ত কণ্ঠে লটি বললে, শুনে দুঃখ পেয়ো না। আমার বিশ্বাস, তোমার সংস্পর্শে যে এসেছে, সে-ই ভালোবাসায় বিশ্বাস হারিয়েছে।

ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে অংশুমান বললে, কেন? আমি কি এমনই পাষণ্ড? মিসেস

হিগিন্স কি আমার চেয়েও পাষণ্ড নয়? অথচ তার কাছ থেকেই সিদ্ধিনাথ-বাবু প্রথম ভালোবাসার স্বাদ পেলেন!

লটি জবাব দিতে পারলে না।

ক্ষুণ্ণ স্বরে অংশুমান বললে, জবাব দিচ্ছ না কেন? কথা বল। কেন এমন হয়?

—জানি না। জানতে চাইও না। আমরা যারা ভালোবাসায় বিশ্বাস করি না, কী বা হবে ওসব জেনে!

—তা ঠিক।

—বরং চল, এমন সুন্দর রাত্রে নির্জন মাঠের মধ্যে দিয়ে দুজনে ঘুরে আসা যাক। সিনেমায় যাওয়া তো হলই না। সন্ধ্যেটা একেবারে নষ্ট হয় কেন?

—সেই ভালো। বাজে কথা ভেবে মন খারাপ করার কোনো অর্থ হয় না।

অংশুমান উঠে দাড়াল।

॥ একুশ ॥

মাস কয়েক পরে স্বপ্না ফিরে এল বিলেত থেকে। অংশুমান এবং সীতানাথ উভয়কেই খবর দেওয়া ছিল। সীতানাথ নির্দিষ্ট সময়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিল তাকে আনতে।

দেখা যে খুব বেশি দিন পরে তা নয়। কিন্তু উভয়েরই মনে হচ্ছিল যেন বহুকাল দেখা হয় নি। বহুকালের অদর্শনজনিত আনন্দ প্রথম সাক্ষাতে উভয়েই চক্ষু থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

এই অল্পদিনেই স্বপ্নার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু প্রভূত। তার সূচনা সীতানাথ বিলাতেই দেখে এসেছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্তন কী রূপ নিতে পারে তা ধারণাতে ছিল না।

গায়ের ওভারকোটটা সীতানাথই ওর জন্যে বিলাতে তৈরি করিয়ে দিয়েছিল। বিলম্বিত নূতন ধরনের ভ্যানিটি ব্যাগটাও। কিন্তু ঢেউ-খেলানো ছাঁটা চুল বোধ করি সে চলে আসার পরে হয়েছে। তার চলন-বলন একেবারে বদলে গেছে। পিছনে ফিরে কথা শুনলে মনে হয় যেন কোনো মেম সাহেব ইংরিজি ঢঙে এবং সুরে বাংলা কথা বলছে। চলার সঙ্গে মনে হবে, মেম সাহেব হেঁটে যাচ্ছে।

এই সমস্তয় সীতানাথ মুগ্ধ হবে কি হবে না ঠিক করতে পারছিল না। কিন্তু সব চেয়ে অবাক হয়ে গেল, মোটরে উঠে যখন স্বপ্না ঝকঝকে রূপোর সিগারেট-কেসটা বার করে একটা সিগারেট ধরালে।

ওর বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে স্বপ্না বোধ হয় একটু লজ্জা পেলে। লজ্জিত অস্ফুটভাবে স্বপ্না জিজ্ঞাসা করলে, সিগারেটটা ফেলে দোব?

—কেন?

—মেয়েদের ধূমপান তুমি পছন্দ কর না মনে হচ্ছে।

—না, না। তাতে কী! এখন তো কিছু কিছু বাঙালী মেয়ে খাচ্ছে দেখা যায়। বিশেষ যারা বিলেত ঘুরে এসেছে।

—ও-দেশে

স্বপ্না ও-দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে বোধ হয় একটা বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু মনে পড়ল, সীতানাথও অল্প কিছুদিন আগেই বিলেত থেকে ফিরেছে। ও-দেশের মেয়েদের নিজের চোখে সে দেখে এসেছে। মনে পড়তেই চুপ করে গেল।

সীতানাথ কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই অন্য কথা ভাবছিল: মনে কর অহল্যা যদি এমন করে তার সামনে একটা সিগারেট ধরাত, কী বলত সে? বলতে পারত, না না, তাতে কী হয়েছে! ধূমপান তো কিছু কিছু মেয়ের মধ্যে চল হয়েছে আজকাল। পারত বলতে?

লটি দত্ত জানে, পুরুষের কাছে স্ত্রীর একটা বিশেষ মর্যাদা আছে, একটা বিশেষ রূপ। কোথাও তা সে ক্ষুণ্ণ হতে দেয় না। সশ্রদ্ধ সতর্কতায় তার পবিত্রতা সে রক্ষা করার চেষ্টা করে। সর্বত্র। ট্রামে, বাসে, রঙ্গালয়ে। সকল সময়। সে পুরুষ যে স্তরের হোক না কেন।

সীতানাথ একথা জানে না, কিন্তু একান্ত গভীরে তার মন জানে। সে আর তার গুহায়িত মন দুজনে মিলে এলোমোলা করে কথাটা ভাবছিল অন্যমনস্কভাবে।

স্বপ্না বললে, সার্ অংশুমানের ওখানে যাব।

—এখন?

—হ্যাঁ। সকলের আগে। নইলে রক্ষে থাকবে না।

—তার পরে?

—তার পরে আমার ফ্ল্যাটে।

—সেখান থেকে?

—তোমার সঙ্গে নিরুদ্দেশে।

—কতক্ষণ পর্যন্ত?

স্বপ্নার চোখ দুটি আবেশে বিহ্বল হয়ে উঠল। বললে, তুমি চলে আসার পরে এমন অবস্থা হল!

স্বপ্না খিল খিল করে হেসে উঠল।

—কী হল?

—মনে হল, জাহাজে লাফিয়ে উঠে পড়ি। তোমাকে ছেড়ে একটা ঘণ্টাও আমি থাকতে পারব না। ক'দিন কী যে মনের অবস্থা হয়েছিল! কাজে মন বসাতে কী বেগই না পেতে হয়েছিল!

স্বপ্না হাসতে লাগল।

সীতানাথ বললে, এখানে আমারও সেই অবস্থা হয়েছিল। ক'টা দিনই বা বিলেতে একত্র ছিলাম! অথচ মনে হচ্ছিল, সেইটেই আমার সত্যিকারের জীবন। মনে হচ্ছিল, এতকালের যে অভ্যস্ত জীবন, তা যেন আমার সত্যিকার জীবন নয়, তাতে যেন আমি কোনোদিন অভ্যস্ত ছিলাম না। কোনোদিন কোনো যোগ ছিল না।

ভ্রূকুটি হেনে স্বপ্না বললে, বাজে কথা বোল না। তোমাদের আবার মন-কেমন করে!

ওর একখানা হাত চেপে ধরে সীতানাথ ব্যাকুলভাবে বললে, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর। এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না।

অংশুমানের গেটের সামনে গাড়ি থামল। হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে স্বপ্না নামল। তার পিছনে সীতানাথ।

এই সময়টা সার্ অংশুমানের নীচের ঘর বারান্দা লোকে লোকারণ্য থাকে। রাজনৈতিক, সাংবাদিক এবং আরও বিবিধ প্রকারের অর্থী-প্রত্যর্থীর ভিড় ঠেলা যায় না। সীতানাথও তাই দেখেছে। স্বপ্নাও।

দুজনেই অবাক হয়ে গেল, নীচেটা জনশূন্য বললেই চলে।

ওদিকের একটা ঘর থেকে টাইপ-রাইটারের অবিশ্রান্ত একটানা ঠকা-ঠক শব্দ আসছে। অংশুমানের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র বা অন্য কাগজপত্র টাইপ হচ্ছে।

দু-তিনটি, মাত্র দু-তিনটি অনাথ যুবক,—কেউ বারান্দার চেয়ারে নিঃশব্দে বসে খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছে, কেউ বা নিঃশব্দপদসঞ্চারে পাশের ঘরগুলিকে উঁকি মারছে, কেউ বা পাশের ছেলেটির সঙ্গে চুপি চুপি কথা কইছে। শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে সার্ অংশুমান কিছুদিন থেকে নীচে নামছে না। অনেকেই দু'চারবার এসে আসছে না। কিন্তু এদের বোধ হয় ধৈর্যের শেষ নেই। এরা আসছে। কী জানি যদি দৈবাৎ সার্ নামে, যদি দৈবাৎ দেখা হয়ে যায়! আশা কুহকিনী!

সামনের ঘরটায় দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা এবং সাংবাদিকরা বসে চা পান করে, সে ঘর একেবারে খালি।

দু-চারটি বেয়ারা-চাকর ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু নিতান্ত উদাসীন-

ভাবে। কে আসছে, কে যাচ্ছে, কার কী প্রয়োজন, সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপই নেই।

সীতানাথ এবং স্বপ্না একবার থমকে দাঁড়াল। ভাবলে, কাউকে জিজ্ঞাসা করে, স্যার অংশুমান আছে কি নেই? কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করবে? সামনে কাউকে দেখা গেল না।

ওরা সিঁড়ি বয়ে উঠতে লাগল।

একটা বেয়ারা নীচে নামছিল। পরিচিত মুখ। এরাও তার পরিচিত। তাই প্রশ্ন করবার আগেই বললে, দক্ষিণের বারান্দায় বসে আছেন। কেউ নেই, সোজা চলে যান।

ওরা উপরে উঠে গেল।

হ্যাঁ, দক্ষিণের বারান্দাতেই অংশুমান রয়েছে। তার অভ্যস্ত প্রতিদিনকার আরাম-কেদারায়,—নিঃশব্দে অর্ধশায়িতভাবে।

পায়ের শব্দে ওদের দিকে চেয়ে অংশুমান হাসলে। সম্ভবত ওদের সে প্রত্যাশা করছিল।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে মনে-মনে সময়টা হিসাব করে বললে, স্টেশন থেকেই সটান আসছ বোধ হয়?

পাশের সোফায় বসতে বসতে দুজনে নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে এই অনুমান সমর্থন করলে।

স্বপ্নার মনে হল, অংশুমান যেন বৃদ্ধ হয়ে গেছে। বয়সের দিক দিয়ে নয়, শরীরের দিক দিয়েও নয়। কিন্তু চোখের দৃষ্টি, কথার স্বর যেন দীপ্তিহীন, বৃদ্ধের মতো।

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করলে, আপনার শরীর কি ভালো নেই?

—ভালোই আছে তো।

একটু পরে স্বপ্না আবার জিজ্ঞাসা করলে, নীচে বিশেষ ভিড় দেখলাম না। নীচে কি নামেন না?

—না। ওদেরই উৎপাতে ছেড়ে দিয়েছি। তবু নাছোড়বান্দা কেউ কেউ আসে শুনি।

—হ্যাঁ।—স্বপ্না হেসে বললে,—দু-চারজনকে দেখলাম।

—ওরা আমার মৃত্যুর আগে আমাকে নিষ্কৃতি দেবে না। ওরা আসবেই।

অংশুমানও হাসলে।

আবার কিছুক্ষণ সকলেই নিঃশব্দে বসে রইল।

এমন বড়-একটা হয় না। স্বপ্না জানে, সীতানাথ না জানতে পারে, ঘরে মেয়েরা থাকলে অংশুমানের মুখে কথার খই ফোটে। স্বপ্না যখনই এসেছে, একা অথবা লটির সঙ্গে, দেখেছে অংশুমানের কথা আর ফুরোয় না। কিন্তু আজ থেকে থেকেই তার কথা ফুরিয়ে আসছে। বারে বারেই থেমে যাচ্ছে। অংশুমানের একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তন হয়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই অংশুমান সীতানাথের দিকে চেয়ে হেসে বললে, স্বপ্নার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। না?

সীতানাথও হাসলে: হ্যাঁ।

—স্বাস্থ্যেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

সীতানাথ বললে, অনেক।

—ভারি সুখের খবর, তুমি ভালো করে পাস করেছ। আমি খুব দুর্ভাবনায় ছিলাম—স্বপ্নার দিকে চেয়ে অংশুমান বললে,—ফেল করলে ডিরেক্টারদের কাছে লজ্জা পেতাম।

স্বপ্না লজ্জিত বিনয়ে মুখ নামালে।

অংশুমান বললে, তোমার জন্যে অন্য জায়গায় একটা চেষ্টা করছি। বিলেত থেকে হয়তো অনেক ব্যয়বহুল অভ্যেস যোগাড় করে এনেছ। এ মাইনেতে তো কুলোবে না। কিন্তু যতদিন সেটা না হচ্ছে, এখানেই কাজ কর। আমি বলে দিয়েছি, তুমি কালকেই কাজে যোগ দিতে পারবে। না কি দু-একদিন বিশ্রাম করতে চাও?

অন্য জায়গায় তার জন্যে ভালো চাকরির চেষ্টা হচ্ছে শুনে স্বপ্না মনে মনে খুব খুশি হল। ব্যস্তভাবে বললে, না না। বিশ্রামের কী আছে? একটা দিন বিশ্রামই যথেষ্ট। আমি কালই যোগ দিতে পারি, যদি সে রকম ব্যবস্থা থাকে।

অংশুমান কাজের লোক। কাজকে ভয় করে যারা ফাঁকি দিতে চায়, তাদের সে পছন্দ করে না। স্বপ্না কী কী ব্যয়বহুল অভ্যাস বিলাত থেকে সংগ্রহ করে এনেছে, তা সে জানে না। কিন্তু শীতপ্রধান দেশ থেকে পরিশ্রম করবার অভ্যাসটা অর্জন করতে পেরেছে দেখে খুশি হল।

বললে, না। ব্যবস্থা আছে। কোন অসুবিধা হবে না।

অংশুমান হাতের ঘড়িটা আড়চোখে দেখলে।

ওঠবার সংকেত। সীতানাথ উঠে দাঁড়াল এবং ধীরে ধীরে বেরিয়ে

গেল। কিন্তু স্বপ্না কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলে। তাকে নিরিবিলি অংশুমানের কিছু বলবার থাকতে পারে।

থাকেও। অভিজাত কলিকাতাবাসিনীদের নয়, কিন্তু বাইরে থেকে দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েরা যারা আসে, তাদের মাঝে মাঝে রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণ হয়। দূরের মেয়েরা রাত্রে থেকেই যায়। কলকাতায় যারা অভিভাবকের কাছে থাকে না, তারাও। অন্যেরা রাত্রেই ফিরে যায়। হয়তো একটু রাত্রি বেশি হয়। অংশুমান গাড়ি করে তাদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে।

স্বপ্নাও অনেক রাত্রি এই প্রাসাদে বাস করে গেছে। অনেক দিন পরে নতুন চটক দিয়ে বিলাত থেকে ফিরল সে। কালই আবার কাজে যোগ দেবে। প্রত্যাশা করছিল, আজও হয়তো অংশুমান তাকে রাত্রের নিমন্ত্রণ করতে পারে।

এক মিনিট, দু মিনিট, আড়াই মিনিট—

না। অংশুমান আর-কিছু বলবে বলে মনে হয় না। সে অন্যমনস্ক। তার কথা ভাবছেই না হয়তো।

স্বপ্না অন্য চাল চাললে। একটা রমণীসুলভ চাল।

ধীরে ধীরে অংশুমানের একান্ত সন্নিকটে এসে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে।

অংশুমান অন্যমনস্ক ছিল। এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। পায়ে ওর নরম হাতের স্পর্শ পেয়ে প্রথমটা থমকে উঠল। কিন্তু প্রশান্ত হাস্যে আশীর্বাদ-সূচক ওর পিঠে হাত রাখলে।

আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে স্বপ্না উঠল।

না। অংশুমানের প্রকাণ্ড পরিবর্তন হয়েছে। এবং এই কথাটা ভাবতে ভাবতে স্বপ্না অন্যমনস্কভাবে নীচে নেমে এল। সীতানাথ গাড়ির মধ্যে অপেক্ষা করছিল। ওকে দেখে দরজাটা খুলে দিলে।

সমস্ত পথ স্বপ্না এই কথাই ভাবতে ভাবতে গেল : অংশুমানের এই ব্যবহারের কারণ কী? সে কি কোনো কারণে স্বপ্নার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে? কী কারণে? সীতানাথ নিশ্চয়ই কারণ নয়। তার জীবনে সীতানাথের আবির্ভাবের হেতু অংশুমান স্বয়ং। স্পষ্ট কিছু না বললেও অংশুমানের পরোক্ষ ইঙ্গিত ছিল। কেন, তা সে জানে না। কেন অংশুমান কী কাজ করে তা

কেউ জানে না। স্বপ্না তো ছেলেমানুষ। কিন্তু সীতানাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার ইঙ্গিত সে ভুল পড়ে নি। ভুল হলে সীতানাথের তারই সঙ্গে বিলাত যাওয়া কখনই সম্ভব হত না। বিলাত যাত্রার আগে এখানেই ভ্রমসংশোধন হয়ে যেত।

সীতানাথ নয়। কিন্তু কী তবে?

সশব্দে গাড়িখানা থেমে গেল।

চমকে স্বপ্না জিজ্ঞাসা করলে, কী হল?

সীতানাথ হাসলে: কী আবার হবে? তোমার বাড়ির সামনে এসে গেছে। চিনতে পারছ না?

লজ্জিত ত্রস্ততায় নামতে নামতে স্বপ্না বললে, তাই বটে। অন্যমনস্ক ছিলাম। খেয়াল করি নি।

শাড়িটা ঠিক করতে করতে পিছনে চাইলে। সীতানাথ গাড়ির মধ্যে নিশ্চেষ্ট বসে।

স্বপ্না জিজ্ঞাসা করলে, তুমি নামবে না?

—কী হবে নেমে? তুমি তো এখন বিশ্রাম করবে। তার চেয়ে বরং—

মাথা নেড়ে স্বপ্না বললে, না, নাম।—অভিমান ক্ষুব্ধ স্বরে বললে,—তোমরা সবাই কী রকম হয়ে গেছ যেন।

—কী রকম হয়ে গেছি?—সীতানাথ গাড়িতে বসেই হাসতে লাগল।

মাথায় আর-একটা ঝাঁকি দিয়ে স্বপ্না বললে, জানি না, যাও। নাম।

সীতানাথকে নামতে হল। ড্রাইভারকে বললে, একটা কুলি ডেকে বাক্স-বিছানা উপরে পাঠিয়ে দিতে।

আগে স্বপ্না, পিছনে সীতানাথ। অনেক দিন পরে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে স্বপ্নার পায়ের গতি বেড়ে গেছে। তর্‌তর্‌ করে চলছে সে।

হঠাৎ ফ্ল্যাটের দরজায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

—চাবি কার কাছে?

—আমার কাছে।

—তবে চলে যাচ্ছিলে যে বড়!

পকেট থেকে চাবিটা বের করতে করতে সীতানাথ নিশ্চিন্ত মনে বললে, চলে কি গেছি?

—যাচ্ছিলে তো। আমি [illegible] চাই না!

—তাই নয়।—হেসে দরজাটা খুলতে খুলতে সীতানাথ বললে, —যাব কী করে? গেলে তোমার সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাবে কে?

ঝকঝক করছে ঘর। বিলাত থেকে সীতানাথ যখন ফেরে স্বপ্না তার ফ্ল্যাটের চাবিটা তার হাতে দিয়েছিল। গতকাল সীতানাথ লোক দিয়ে ধোয়া-মোছা করিয়ে রেখেছিল।

স্বপ্না ভারি খুশি হয়ে উঠল। বললে, গুড বয়।

আসবাব-সাজানো সে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। যেমন করে আগে সাজানো ছিল তেমন ভাবে নয়। অনেকটা ও-দেশের মতো। দু-একটি নতুন আসবাবও যোগ করেছে। জানলা-দরজার পর্দাগুলো বদলেছে। খাটে ধোপদুরস্ত চাদর।

কাছের সোফাটিতে বসে পড়ল স্বপ্না। খুশিতে ঝলমল করছে মুখ।

বললে, ভেরি গুড বয়।

সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তভাবে একটা হাই তুলে বললে, এত ঘুম পাচ্ছে!

নিজের ঘরে, নিজের সোফায় বসে এতক্ষণে বুঝলে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

সীতানাথ বললে, এখনই ঘুম নয়। বেশ করে স্নান করে এসে ঘুমিয়ে পড়। আমি যথাসময়ে এসে তোমাকে নিয়ে লাঞ্চে যাব।

—আসবে তো ঠিক?

সীতানাথ চলে যাচ্ছিল। ফিরে এসে কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সন্দেহ হয়?

চোখ মিট মিট করে স্বপ্না বললে, না।

সীতানাথ চলে যেতে স্বপ্না উঠে বাথরুমটা দেখে এল। সাবান, তোয়ালে, মাজন, ব্রাশ, যেখানকার যেটি সেখানে সাজানো রয়েছে। কিছুরই ত্রুটি নেই। এ ক'দিন সমস্ত ক্ষণ ধরে এই করেছে সীতানাথ।

স্নান করে এসে একটু গড়াতে যাবে এমন সময় লটি এল। ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করে গড় গড় করে বলতে লাগল: এসে গেছিস! আমি ভেবেছিলাম, স্টেশনে যাব। কিন্তু অত সকালে উঠতেই পারলাম না। কেমন ছিলি? বেশ ভালোই তো বোধ হচ্ছে। কেমন লাগল? ভালো না? ওয়াণ্ডারফুল! ফিরে এসে কিছুতে মন বসতে চায় না, সব ফাঁকা ঠেকে, কিছুই যেন জমে না, তাই না? বাঃ! এর মধ্যেই সব গুছিয়ে ফেলেছিস! চমৎকার সাজিয়েছিস তো! বিলেতে থাকলে রুচির অনেক উন্নতি হয়।

পাঁচ মিনিট ধরে লটি অনর্গল বকে গেল। আনন্দেই অবশ্য। নিজেই প্রশ্ন করে, নিজেই উত্তর দেয়। আবার কখনও বা প্রশ্ন করে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই অন্য প্রশ্ন করে বসে। এমনি কিছুক্ষণ অবিশ্রান্ত বকার পর এক সময় লটি উঠে দাঁড়াল। বললে, আচ্ছা, এখন উঠি, বুঝলি? তুই বিশ্রাম কর্। অন্য এক সময় আসব ফের। অ্যাঁ?

স্বপ্না আটকালে। জিজ্ঞাসা করলে, কর্তার খবর কী বলুন তো?

—ভালোই। মানে খারাপ কিছু শুনি নি তো। কেন বল্ দেখি?

স্বপ্না বললে, স্টেশন থেকে ফেরার পথে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

—তারপর?

—কেমন অন্য রকম মনে হল।

লটির চোখ কৌতুকে নেচে উঠল: কী রকম?

—কেমন যেন অন্যমনস্ক। উদাসীন ভাব।

লটি উচ্ছ্বসিত হেসে উঠল: ও সব কর্তার চাল! কত রকম রূপ যে আছে! ও মহাসমুদ্রকে আমি এত দিনেও চিনতে পারলাম না। তুই দু'দিনেই চিনবি?

শাড়িতে একটা তরঙ্গ তুলে লটি বেরিয়ে গেল।

॥ বাইশ ॥

অহল্যার অবস্থা হল চোরের মতো। চোর চুরি করতে গিয়ে জখম হয়ে এলে তার মায়ের জোরে কাঁদবারও উপায় থাকে না।

স্বপ্না যতদিন বিলেত থেকে ফেরে নি ততদিন সীতানাথ সন্ধ্যাবেলাটা মক্কেল আর মদ্য নিয়ে নীচের ঘরে কাটিয়েছে। অহল্যা সতর্কভাবে ছেলেমেয়েদের পাহারা দিয়েছে, কেউ যাতে না চট করে লাইব্রেরি-ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়। চাকর-বাকর জানতে পারবেই। শুধু ছেলেমেয়েরা যাতে না জানতে পারে সেই দিকে সে খরদৃষ্টি রেখেছিল। সকল সময় ভয়ে ভয়ে থাকত। সন্ধ্যার পূজা তার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বারান্দায় চেয়ার নিয়ে একখানা বই খুলে বসে থাকে, পাছে ছেলেমেয়েরা কেউ কোনো প্রয়োজনে নীচে নামে।

স্বপ্না ফেরার পরে অবস্থা আরও জটিল হল।

সপ্তাহের পাঁচটা দিন আগের মতোই কাটতে লাগল বটে, কিন্তু শনিবার আর রবিবারে অহল্যার দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। সেদিন সীতানাথ রাত্রে কখন ফিরবে তার কিছুই স্থিরতা থাকে না। প্রায়ই গাড়ি থেকে চাকরদের সাহায্যে নামাতে এবং উপরে নিয়ে আসতে হয়।

যেদিন বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় নামাতে হয় সেদিন বরং ভালো। কিন্তু যেদিন অবস্থা ততটা শোচনীয় হয় না, সেদিন তার গান এবং চিৎকারে পাড়ার লোক জেগে ওঠে। চাকরেরা হাসাহাসি করে। লজ্জায় কারও মুখের দিকে অহল্যা চাইতে পারে না।

অন্য স্ত্রীলোক হলে কলহ-ক্রন্দনে সীতানাথের জীবন বিষময় করে তুলত। কিন্তু ছেলেমেয়ে, চাকর-বাকর, পাড়া-প্রতিবেশীর সামনে তেমন একটা লজ্জাকর দৃশ্যের অবতারণা করতে অহল্যার আত্মসম্মানে বাধত।

অহল্যা নিজের বিছানা ছেলেমেয়েদের ঘরে করলে। সীতানাথের অসংযত দেহটাকে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে যেত। পরের দিনটা সমস্তক্ষণ গুম হয়ে থাকত। কারও সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ কইত না। সীতানাথের সঙ্গেও না।

কোনোদিন তাকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করত না, এসব কী হচ্ছে? ওর সামনে সীতানাথ কেমন লজ্জিত ভাবেই থাকত। চোখ তুলে ওর বিষণ্ণ গম্ভীর মুখের দিকে চাইতে পারত না। পরস্পর পরস্পরকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করত। হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গেলে দুজনেই বিব্রত বোধ করত।

মুশকিল হল ছেলেমেয়েদের।

বড়রা ব্যাপারটা বুঝতে পারে। তাদের সঙ্গী-সঙ্গিনীরা এ নিয়ে কৌতুক-পরিহাসও করে। তারা লজ্জা পায়। সীতানাথ যখন মত্ত অবস্থায় ফেরে তখন ছোটরা অবশ্য ঘুমিয়ে থাকে, জানতে পারে না। কিন্তু বড়দের ঘুম প্রায়ই ভেঙে যায়। কিন্তু তারা উঠতে পারে না। প্রত্যেকেই ঘুমের ভান করে মটকা মেরে পড়ে থাকে, পাছে পাশের ভাই বোন বুঝতে পারে সে ঘুমিয়ে নেই।

নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে তারা আলোচনাও করে না। মায়ের থমথমে মুখের দিকে তারা চাইতে পারে না। পারতপক্ষে তার সামনে দাঁড়ায় না। বাপের কাছে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। পাগলকে যেমন লোকে ভয় করে, সীতানাথকে তারা তেমনি ভয় করতে আরম্ভ করেছে।

সব চেয়ে মুশকিল হয়েছে চাকর-বাকরদের।

বাড়িতে এই নিয়ে কলহ-ক্রন্দন চলে, হৈ-চৈ, কেলেঙ্কারী ব্যাপারটা তা হলে তাদের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তার পরিবর্তে এই স্তব্ধ থমথমে ভাবটা তাদের কাছেও দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে হাসাহাসি করার চেষ্টা করে। কিন্তু এত ভয়ে ভয়ে এবং এমন সন্তর্পণে যে রসটাই মাটি হয়ে যায়। অহল্যাকে চিরদিন তারা এত ভয় করতে অভ্যস্ত যে, নিজেদের মধ্যে অন্য প্রসঙ্গে হাসাহাসি করতে, এমন কি জোরে কথা বলতেও সাহস করে না, পাছে অহল্যা কিছু সন্দেহ করে।

সুতরাং বাড়ির আবহাওয়াটাই দুরন্ত গুমটের মতো দুঃসহ হয়ে উঠল। কেউ জোরে কথা বলে না। কেহ হাসে না। এমন কি ছোট ছেলেমেয়েরাও চুপি চুপি খেলা করে। সবাই হাঁফিয়ে উঠল।

অহল্যা প্রত্যুষে উঠে স্নান করে তেতলায় পূজার ঘরে চলে যায়। সীতানাথ কোর্টে বেরিয়ে যাবার আগে নামে না। ছেলেমেয়েরা স্কুলে কলেজে যাওয়ার আগে যখন খেতে বসে, তখন নিঃশব্দে তাদের খাওয়ার কাছে এসে

একবার বসে। কার কী চাই, কে কম করে খাচ্ছে দেখে। আর যাদের কাছে এসে সে বসে, তারা কোনোমতে নাকে-মুখে দুটি গুঁজেই পালাতে পারলে বাঁচে।

দুপুরে আহারান্তে নিজের ঘরে এসে অহল্যা শোয়। ছেলেমেয়েরা না ফেরা পর্যন্ত শুয়েই থাকে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না জেগে আছে, না ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু ঘুম তার আসে না। সমস্ত দেহ-মনে অসহ্য জ্বালা অনুভব করে।

শরীর শীর্ণ হয়ে এসেছে। বর্ণের সে দীপ্তি আর নেই। সমস্ত দীপ্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে দুই কোটরপ্রবিষ্ট ধূমাঙ্কিত চোখে। সে দুটো হীরার মতো জ্বল জ্বল করে। কেউ চাইতে পারে না তার চোখের দিকে।

না। তার হার হয়ে গেল। অংশুমানের কাছে জীবনভোর হেরেই এল সব দিক দিয়ে।

অসহ্য জ্বালায় ছটফট করে সে।

হেরে গেল, হেরে গেল অহল্যা।

সর্বত্র তার হার হল। একটা হারের থেকে আর-একটা হার, তারপরে আর-একটা। হারের শৃঙ্খলে তার দেহ-মন অবদ্ধ।

পাওয়ার কথা নয়। কোথাও সে কিছু চায় নি। অংশুমানের কাছেও না, সীতানাথের কাছেও না। সে শুধু দিয়েছে। অম্লানবদনে, অকুণ্ঠচিত্তে দিয়েই এসেছে। এবং অবশেষে হেরেছে।

ভাগ্যিস চায় নি কোথাও! ভাগ্যিস হাত পাতে নি! তাহলে দুই অঞ্জলি তার ক্লেদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। না, ক্লেদ কোথাও জমে নি। শুধু জ্বালা, দেহের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরায় গলিত সীসার মতো শুধু জ্বালায় প্রবাহ বয়ে চলেছে। ক্লেদ নয়।

কিন্তু এত দম্ভই কি ভালো? পুরুষ নারী এত দম্ভ কারও ভালো নয়।

অংশুমান কত দিন তাকে ফোন করেছে, অত্যন্ত সকাতরে। সে যায় নি। প্রতিদিনই তার কাজ থাকে। কোনোদিই তার যেতে ইচ্ছা করে না।

এত দম্ভ ভালো নয়।

অহল্যা স্থির করলে তার যাওয়া উচিত। একদিন নয়, কথাটা যখন মনে এল তখন আজকেই যাওয়া দরকার। একদিন বললে তার কোনাদিনই যাওয়া হয় না। আজই যেতে হবে।

কিন্তু অংশুমানের কাছে যাওয়া তো সহজ নয়। বহুকাল যায় নি। হঠাৎ গেলে কী অবস্থায় দেখবে কে জানে? অহল্যা টেলিফোন করে গেল।

সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শুনেই অংশুমান বাইরে এসে দাঁড়াল। হ্যাঁ, সার্ অংশুমান। যার মস্ত বড় প্রাসাদ, মস্ত বড় মোটর এবং তারও চেয়ে বড় দম্ভ, যার হৃদয় নেই, যে কোনোদিন কাউকে ভালোবাসে নি,—ভালোবাসায় বিশ্বাসই করে না।

কিন্তু এই মুহূর্তে কেউ যদি তার বুকে হাত দেয়, দেখবে বুকটা হাপরের মতো লাফাচ্ছে।

লাফাচ্ছিল, যতক্ষণ না অহল্যার দৃষ্টিগোচর হল। অহল্যা কাছে দাঁড়াতেই স্পন্দন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

এই অহল্যা! সে রূপ কই? সে দীপ্তি কই? পরিধানে একখানা কালোপাড় শাড়ি। করপ্রকোষ্ঠ প্রায় রিক্ত।

থমকে দাঁড়িয়ে গেছে অহল্যাও। এ কী চেহারা হয়েছে সার্ অংশুমানের! শীর্ণ মুখ। ক্লান্ত চোখ। মলিন ললাট।

দুজনেই পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু মনে হল যেন কয়েক যুগ!

সম্বিৎ ফিরল অহল্যারই আগে। বললে, চল। ঘরে চল।

অংশুমান বললে, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে! হাঁপাচ্ছ কেন? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কি কষ্ট হল?

সেটা অহল্যাও টের পেয়েছে। সে বহুকাল তার নিজের বাড়িতেও একতলা দোতলায় ওঠা-নামা করে নি। করতে যে কষ্ট হয়, সেটা আজ বুঝলে।

কিন্তু মুখে বললে, না, হাঁফাই নি। আগে বল, তোমার শরীর ও-রকম হল কেন? কোনো কি অসুখ করেছে?

অংশুমান হেসে বললে, বুড়ো হচ্ছি না? শরীর কি চিরদিন এক রকম থাকে? কিন্তু তোমার শরীর অমন কেন?

—বোধ হয় আমিও বুড়ো হচ্ছি।

অংশুমান অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে হাসলে। আবার জিজ্ঞাসা করলে, এমন বেশ কেন?

—রাজবেশে কি কেউ ভিক্ষা করতে আসে? আমি ভিক্ষায় এসেছি।

—ভিক্ষায়? আমার কাছে!—অংশুমান ব্যস্ত হয়ে উঠল।—তুমি বোস তুমি কাঁপছ। বোস।

পাশের একটা শেফায় বসে পড়ে অহল্যা বললে, তুমি একদিন তোমার আলমোড়া না কোথাকার একটা বাড়ি আমাকে দিতে চেয়েছিলে। মনে পড়ে?

—পড়ে। নেবে আলমোড়ার বাড়িটা?

অংশুমান উৎসাহিত হয়ে উঠল। মনে হল, এই মুহূর্তেই সে দলিল করে লিখে দিতে প্রস্তুত।

অহল্যা বললে, না। বাড়ি আমি একটা—

—হ্যাঁ। শুনেছি। তোমার বালিগঞ্জের বাড়িটা নাকি প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

ঘাড় নেড়ে অহল্যা বললে, সে বাড়ি নয়। তার কথা জানি না। আমি একটা বাড়ি কিনব ভাবছি দেওঘরে। কেউ জানে না এখনও। তুমি প্রথম শুনলে।

—কেউ জানে না দেওঘরে বাড়ি কিনবে! অংশুমান ওর প্রায় রিক্ত করপ্রকোষ্ঠের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—টাকা কোথায় পাবে?

—হ্যাঁ। তোমার চোখে কিছুই এড়ায় না। ওই জঞ্জালগুলো বিক্রি করেই।

অংশুমান স্তব্ধভাবে বসে রইল।

অহল্যা সবিনয়ে বললে, আমার বসবার উপায় নেই। এখনি চলে যেতে হবে। অনুমতি কর আমি প্রার্থনার কথাটা বলি।

—প্রার্থনা?—একটা আশ্চর্য ভঙ্গীতে অংশুমান হাসলে।—বল।

—আমার স্বামীকে তুমি নিষ্কৃতি দাও।—অহল্যা হাত জোড় করে বললে।

অংশুমান কথাটা শোনামাত্র একবার চমকে উঠেই স্তব্ধ হয়ে গেল। অহল্যা করজোড়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

অংশুমান হঠাৎ বললে, আমার যা আছে,—ঘর বাড়ি, টাকাকড়ি, লক্ষলক্ষ টাকার জিনিস,—সব নেবে? নিয়ে আমাকে দয়া করবে?

ঘাড় নেড়ে মৃদু হাস্যে অহল্যা বললে, ও নিয়ে আমি কী করব?

—রাজারও লোভের জিনিস। তাতে তোমার কোনো আবশ্যক নেই?

—কিছুমাত্র নয়।

অংশুমান আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কী যেন ভাবলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোমার মিথ্যে সময় নষ্ট করব না। তোমাকে বলি, তোমার স্বামী আর আমার মুঠোর মধ্যে নেই। তোমার ধারণা নেই, সে এখন অনেক ওপরে উঠে গেছে।

—তোমার মুঠোর মধ্যে নেই?

—মুঠোর মধ্যে কেউ বেশিদিন থাকে না অহল্যা। মুঠোর চেয়ে মানুষ দেখতে দেখতে বড় হয়ে যায়। তখন মুঠোয় আর কুলোয় না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তুমি আমার কাছে কখনও কোনো প্রার্থনা কর নি। এই প্রথম।

—এবং শেষ।

—তাই মনে হচ্ছে। শেষ। সাধ্যে থাকলে এ প্রার্থনা আমি রাখতাম। বিশ্বাস কর।

অহল্যাও উঠল। চারিদিকে চেয়ে বললে, ঘর নতুন করে সাজিয়েছ?

—হ্যাঁ। সজ্জা দেখতে দেখতে পুরনো হয়ে আসে। আর ভালো লাগে না। তখন নতুন সজ্জার দরকার হয়।

—মানুষ পুরনো হয় না?

—হয়। মানুষও পুরনো হয়। হয়তো একটু দেরিতে।

—কোনো কোনো সময় হয়ও না।

—জানি না।

অহল্যা দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সিঁড়ি দিয়ে নামবে। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, আমার একটা কথা রাখবে?

—বল।

—শরীরের অযত্ন কোরো না।

—অযত্ন করি না তো।

—কর। নইলে এ রকম চেহারা হয় না।

অংশুমান হাসলে। বললে, অহল্যা, বড় হতে গেলে দেহ দিয়ে, মন দিয়ে তার মূল্য দিতে হয়। আমাকেও মূল্য দিতে হয়েছে। অযত্ন নয়।

—তাই?

—হ্যাঁ।

অহল্যা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অংশুমানের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললে, তা হোক। তবু যত্ন কোরো।

—আচ্ছা। দেখব।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে অংশুমান দেখলে অহল্যার শাড়ির প্রান্ত ধীরে ধীরে সিঁড়ির বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপরেও অকারণে অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল।

দিন কয়েক পরে সীতানাথ উৎসাহের সঙ্গে এসে বললে, বালিগঞ্জের বাড়িটা তো প্রায় শেষ হয়ে এল।

অহল্যা সাড়া দিলে না। নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সীতানাথ বললে, অন্য সব হয়ে গেছে। বাকি কেবল মেঝে মোজাইক করা আর দেওয়াল ডিস্টেম্পার করা।

অহল্যা নিঃশব্দে তেমনি চেয়ে রয়েছে।

—তুমি কবে যাচ্ছ?—সীতানাথ জিজ্ঞাসা করলে।

অহল্যার এতক্ষণে যেন ধ্যান ভাঙল। চমকে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায়?

সীতানাথ হেসে উঠল: বাঃ! কী শুনলে তবে এতক্ষণ?

—কিছুই শুনি নি।

সীতানাথ আবার আগের কথার পুনরুক্তি করলে। বললে, আমার যা করবার করলাম। এইবার তোমার কাজ।

—আমার কী কাজ?

—কোন্ ঘরের দেওয়াল মেঝে কী রকম হবে সে তো তোমার পছন্দের ওপর নির্ভর করে।

অহল্যা তাড়াতাড়ি বললে, না, না। আমার পছন্দের ওপর কিছুই নির্ভর করে না। তোমার যেমন খুশি।

বাধা দিয়ে সীতানাথ বললে, বিলক্ষণ! বাড়ি তোমার, আর পছন্দ করব আমি! শোন, আজ বিকেলে দেখতে যাবে চল।

—আজ বিকেলে?—ব্যস্তভাবে অহল্যা বললে,—আজ বিকেলে তো সময় হবে না আমার।

বিরক্তভাবে সীতানাথ বললে, কেন? কী আবার আছে? সিনেমা?

সিনেমার নামে অহল্যা একটু হাসলে। বললে, না, সিনেমা নয়। অন্য কাজ আছে।

—তোমার আবার কাজ কী?

—কেন, তুমি ভাব তোমারই শুধু কাজ আছে? আমার কাজ থাকতে নেই?

—না। কী কাজ আছে বল?

সীতানাথ ছাড়বে না। অহল্যাকে বলতে হল: আজ বিকেলে গুরুদেবের ওখানে যেতে হবে।

—গুরুদেব!—সীতানাথের মুখে উপেক্ষাপূর্ণ বিদ্রূপের ভার ফুটে উঠল।—আচ্ছা, এই গুরুদেবটিকে কোত্থেকে জোটালে বল তো?

ওর প্রশ্নে অহল্যা কিন্তু চটল না। হেসে বললে, জোটাতে হয় না।

—আপনিই এসে জোটেন?

—হ্যাঁ। মানুষের যখন প্রয়োজন হয়, তার মন যখন আলোর জন্যে হাহাকার করে, তখন ঠাকুর জুটিয়ে দেন।

—কিন্তু এসব বাতিক তো তোমার ছিল না?

—ছিল হয়তো মনের মধ্যে, টের পাই নি।

গম্ভীর ভাবে সীতানাথ বললে, অহল্যা, এসব বাতিক ছাড়। আবার সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হও। বাড়িটা কী হয়ে গেছে দেখছ না?

—কী হয়ে গেছে?

—এ বাড়িতে কেউ হাসে না। কেউ জোরে কথা বলে না। যেন ভূতে পেয়েছে।

—ভূতেই পেয়েছে! —অহল্যা হাসলে।—তুমি সেটা বুঝতে পেরেছ?

—তার মানে?

—ভূতেই পেয়েছে গো। তুমি ঠিকই ধরেছ।

বলে একটা আড়মোড়া ভেঙে অহল্যা দাঁড়াল। চাকরটাকে বললে, ছোট গাড়িটা বের করবার জন্যে ড্রাইভারকে বলতে। তারপর, সম্ভবত বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ তেইশ ॥

শনিবার-রবিবার ছাড়া অন্য দিন সন্ধ্যায় আশ্রমে বিশেষ ভিড় হয় না। আশ্রম শহরের মধ্যে নয়, দূরে। সমস্ত দিন কাজকর্মের পর ইচ্ছা সত্ত্বেও এতদূর আসা যায় না। যাদের গাড়ি নেই তাদের পক্ষে তো নয়ই, যাদের গাড়ি আছে তাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। শনিবার এবং রবিবার সময় পাওয়া যায়। সেই দিনই অধিকাংশ ভক্ত আসে। সমাবেশ হয় কোনোদিন আশ্রমে, কোনোদিন বা অন্য কোনো ভক্তের গৃহে।

সুতরাং অহল্যা যখন আশ্রমে এল তখন আশ্রম নির্জন। এইমাত্র আরতি হয়ে গেছে। বারান্দায় একখানা চেয়ারে স্বামীজি একাকী বসে আছেন।

অহল্যা প্রণাম করতেই গুরুদেব আশীর্বাদ করলেন, এস মা, এস। রাজরাণী হও।

অদূরে মেঝের উপর বসে অহল্যা সকাতরে বললে, না প্রভু, আর যাই আশীর্বাদ করুন ওই আশীর্বাদ করবেন না।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, কেন মা?

অহল্যা বললে, গৃহস্থের বউ হয়েই মন বিষিয়ে উঠেছে। রাজার রাণী হলে পাগল হয়ে যাব।

গুরুদেব স্তব্ধভাবে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তারপর বললেন, তাই বটে মা। পাগল হবারই কথা। এর নাম সংসার।

বললেন, সংসার মানেই সংগ্রাম। এখানে এসে মানুষ জন্মের দিন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সংগ্রাম করে। সে যে কী দুরন্ত সংগ্রাম, ভাবতে পারা যায় না।

—কিসের জন্যে সংগ্রাম? বাঁচবার জন্যে? উদরান্নের জন্যে?

গুরুদেব হাসলেন: বাঁচবার জন্যে, উদরান্নের জন্যে যে সংগ্রাম, সে তো নিতান্ত তুচ্ছ সংগ্রাম।

—তবে?

—আসল সংগ্রাম চলে পাবার জন্যে।

—কাকে?

—কাকে নয়? —গুরুদেব পাগলের মতো হা-হা করে হাসতে লাগলেন—বাপ-মা চায় সন্তানকে বশে রাখতে, সন্তান চায় বাপ-মাকে; স্বামী চায় স্ত্রীকে বশে রাখতে, স্ত্রী চায় স্বামীকে। শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই আশ্চর্য সংগ্রাম চলেছে। কত পুঁথি লেখা হল!

অহল্যা বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, পুঁথি লেখা হল?

—হল বইকি। নইলে বশে থাকবে কেন?

—কে পুঁথি লিখলে?

—কত মুনি-ঋষি, কত কবি। কত অপূর্ব ছন্দে, কত মিষ্টি করে। ছেলেকে বশে রাখবার জন্যে লিখলেন রামের কথা, স্ত্রীকে বশে রাখবার জন্যে সীতা-সাবিত্রীর কথা, ভাইকে বশে রাখবার জন্যে লক্ষ্মণের কথা।

এতক্ষণে অহল্যা ব্যাপারটা বুঝলে। জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি ভালোবাসার কথা বলছেন?

—হ্যাঁ মা।—গুরুদেব মিষ্টি করে হাসলেন।—তোমরা যাকে ভালোবাসা বল, আসলে সেটা বিজিগীষার পোশাকী রূপ। ওর ভিত্তি হল সম্পত্তি-বোধের উপর।

অহল্যার আবার গোলমাল লাগল: কী রকম?

—বুঝিয়ে দিই।

গুরুদেব নড়ে-চড়ে বসলেন। বলতে লাগলেন:

—দস্যু রাজ্য জয় করে রাজা হল। সঙ্গে সঙ্গে সে ঈশ্বরের অংশ হল। রাজ্য তার সম্পত্তি। পুরুষ নারীকে জয় করে পতি হল। সঙ্গে সঙ্গে সেও ঈশ্বরের অংশ হল। স্ত্রী তার সম্পত্তি। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখতে পারেন।

অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, সম্পত্তিবোধ আপনি কাকে বলেন?

গুরুদেব উত্তর দিলেন, সেই বোধকে, যার থেকে একজন অন্যকে ভাবে তার, আর-কারও নয়।

—তাকে কি আপনি খারাপ বলেন?

—তা যা আমি তাই বলছি, ভালোও নয়, মন্দও নয়।

—কিন্তু এই বোধই তো সমাজকে ধারণ করে আছে!

—আছে। এবং এই বোধ থেকেই সমাজে পরম শান্তি এবং চরম অশান্তির

সৃষ্টিও হয়। পরম শান্তির মধ্যে কারও জীবনে ক্লান্তি আসে। চরম অশান্তির মধ্যে কারও জীবন বিষময় বোধ হয়।

জিজ্ঞাসা করলে, ক্লান্তি আসে কেন ?

গুরুদেব বললেন, তোমরা যাকে শান্তি বল মা,—পার্থিব শান্তি, ক্লান্তি তার মধ্যেই রয়েছে। বাইরে থেকে আসে না।

এ কথাটাও অহল্যা মনে মনে বিচার করতে লাগল।

প্রশ্ন করলে, এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী ?

—বাঁধন কেটেই বাঁধনের থেকে পরিত্রাণ পেতে হয়। আর অন্য উপায় কী ?

অহল্যা একটা কঠিন প্রশ্ন করে বসল : প্রভু, আপনি তো বাঁধন কেটেছেন। শান্তি কি পেয়েছেন ?

স্বামীজি একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাসলেন। ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে, বললেন, না।

—না! তবে ?

তেমনি হাসতে হাসতে গুরুদেব জবাব দিলেন, আমি তো বাঁধন কাটি নি মা। শুধু এক বাঁধন কেটে আর-এক বাঁধনে নিজেকে জড়িয়েছি।

বুঝতে না পেরে অহল্যা অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

গুরুদেব বলতে লাগলেন : ঘরের বাঁধন কেটে বাইরের বাঁধনে পড়েছি। শান্তি কী করে পাব মা ? বাইরের বাঁধনও তো বাঁধন।

একটু থেমে আবার বললেন, যেমন ধর, কিছুদিন তোমার কথা ভাবছি।

অহল্যা চমকে উঠল : আমার কথা! আমার কী কথা ভাবছেন ?

ওর চমকের ভাবটা স্বামীজি যেন লক্ষ্যই করলেন না। বললেন, ভাবছি অনেক কথা যা তুমি জান না, আমি জানি। ভাববার চেষ্টা করি আরও অনেক কথা যা আমি জানি না, তুমিই জান।

—আমার কথা ভাবেন আপনি ?

—ভাবি বই কি মা। তোমার কথা, আরও অনেকের কথা। ভাবি, ভাববার চেষ্টা করি। শান্তি নষ্ট হয়। দুঃখ পাই।

স্বামীজির চোখ করুণায় ছলছল করে উঠল। তাঁর দিকে চেয়ে অহল্যার মনও ব্যথিত হয়ে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলে, বাঁধন কখন কাটে প্রভু ?

—বাঁধন যখন বাজে তখন। তখনই মুক্তির জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

—তখন কী করে বাঁধন কাটে প্রভু? খুবই কি জোর লাগে? হৃদয় কি রক্তাক্ত হয়?

স্বামীজি আবার হাসলেন: না মা, এ বাঁধন জোর করে কাটা যায় না।

—তবে?

—বাঁধন যখন বাজে, মন যখন মুক্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, সমস্ত বাঁধন তখন আপনি ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে।

গুরুদেব সস্নেহ দৃষ্টিতে অহল্যার দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু অহল্যা তা জানতেও পারলে না। তার চোখ মাটির দিকে নিবদ্ধ। মন দূর পথে উধাও হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পরে অহল্যা বললে, প্রভু, বাঁধন আমাকে বাজছে।

—জানি মা।

—মনে মুক্তির ব্যাকুলতা জেগেছে।

—তাও বুঝতে পারি মা।

হঠাৎ অহল্যা গুরুদেবের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল: প্রভু, আমাকে তুমি বাঁচাও।

সঙ্গে সঙ্গে তার চৈতন্য বিলুপ্ত হল।

এক অধিবেশনটা বসেছিল ইন্দ্রনাথের বাড়িতে। যথারীতি বহু ভক্তের সমাবেশ হয়েছিল। জনে জনে এসে স্বামীজির পায়ের ধুলো নিলে। স্বামীজি প্রত্যেককে কুশল প্রশ্ন করলেন। প্রত্যেকের বাড়ির ছেলে মেয়ে থেকে আরম্ভ করে সকলের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। যারা আসে নি বা আসতে পারে নি তাদের না-আসার কারণ জানতে চাইলেন। যার অসুখ করেছে সে কেমন আছে, কী অসুখ, কে দেখছেন সে বিষয়েও আগ্রহ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। দেখা গেল, প্রত্যেকের সম্বন্ধে তাঁর সমান ঔৎসুক্য। কিছুই তাঁর দৃষ্টিও এড়ায় না। নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যেতে পারে, অহল্যার অনুপস্থিতিও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। অথচ আশ্চর্য, সকল অনুপস্থিত ভক্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেও তিনি অহল্যার সম্বন্ধে একটি প্রশ্নও করলেন না। ইন্দ্রনাথকেও না, সুজাতাকেও না।

নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করলেন।

বিষয়বস্তু: ভক্ত ও ভগবান।

বক্তব্য : বিচারের ক্ষেত্রে ভগবানের পদ্ধতি মানুষের থেকে স্বতন্ত্র। মানুষ কাজের বিচার করে। ভগবান করেন হৃদয়ের। দস্যু রত্নাকরকে আদালতে এনে দাঁড় করালে সাত বৎসর জেল হয়ে যেত। কিন্তু ভগবানের বিচারে তিনি বাল্মীকি ঋষিতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। স্ত্রৈণ তুলসীদাস সাধক তুলসীদাসে পরিণত হলেন। আমরা অবাক হয়ে ভাবি, এমন আশ্চর্য ব্যাপার কী করে সম্ভব হয়? অথচ হয় যে তাতে আর সন্দেহ নেই।

অনেক লোক আছে যারা কখনও কোনো অন্যায় কাজ করে নি। সমাজে তারা আদর্শচরিত্র ধার্মিক বলে পরিচিত। সকলে তাদের শ্রদ্ধা করে। সংসারের জোয়াল কাঁধে নিয়ে নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে জীবনটা কাটিয়ে যায়। তার ওপরে আর ওঠে না। এরা মাঝারি মানুষ,—গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত।

আবার একদল আছে, জীবনের প্রথমাংশে যারা দুর্দান্ত, ডানপিটে জীবন কাটায়। চরিত্রে শিথিল, কাজে বেপরোয়া, নিম্নস্তরের আমোদ-প্রমোদে নিমজ্জিত, নির্মম, নিষ্ঠুর। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, তাঁরা মানুষের গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

ত্যাগ এবং বিরক্তি।

এরা আগুন, সমস্ত জঞ্জাল পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। তার আর চিহ্ন রাখে না। সেই আগুনে দস্যু রত্নাকর পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কার মধ্যে সেই আগুন আছে কেউ জানে না। সে নিজেও না। হঠাৎ উত্তাপের স্পর্শে জ্বলে ওঠে। সমস্ত বাসনায় আগুন লাগে। ঐশ্বর্যের দুলাল পালকি থেকে নেমে উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়ান। আর ঘরে ফেরেন না।

দীর্ঘক্ষণ ধরে স্বামীজি বৈরাগ্যের এই আশ্চর্য তত্ত্ব বিবৃত করতে লাগলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে। সেই আশ্চর্য তত্ত্ব যা আমরা সবাই জানি, অথচ কেউ জানি না, বৈরাগ্যের সেই প্রচ্ছন্ন তত্ত্ব।

বক্তৃতা শেষ হলে একে একে সকলেই প্রণাম করে চলে গেল। সুজাতা এসে দাঁড়াল। আহার্য প্রস্তুত।

স্বামীজি আহারে বসলে সুজাতা ধীরে ধীরে বললে, ঠাকুরঝি আজ আসতে পারল না।

—তাকে বলা হয়েছিল নিশ্চয়ই?

—অনেকবার।

—হুঁ।

একটু চুপ করে থেকে সুজাতা বললে, আমি অবাক হয়ে গেলাম. আপনি সকলের কথা জিগ্যেস করলেন, কিন্তু তার কথা একবারও জিগ্যেস করলেন না।

—না।

আবারও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুজাতা প্রশ্ন করলে, সে কোনো অপরাধ করেছে প্রভু?

—না। অপরাধ করবে কেন?

সুজাতা আর-কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলে না।

প্রত্যেক ভক্তের গৃহে একটি করে জলচৌকি আছে। সেটি গুরুদেবের আসন। উপরে একখানি কার্পেট বিছানো। সেটি পূজার ঘরে থাকে। গুরুদেব ছাড়া আর-কেউ তাতে বসে না। গুরুদেব এলে সেটি বার করা হয় তাঁর বসবার জন্যে। আহারান্তে গুরুদেব সেইখানে বসলেন।

বললেন, অহল্যা-মাকে নিয়ে খুব মুশকিলে পড়েছি সুজাতা-মা।

সুজাতা প্রশ্ন করলে না। নিঃশব্দে জিজ্ঞাসু নেত্রে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

গুরুদেব বললেন, মা আমার সংসার ত্যাগ করতে চান।

অনেক আশঙ্কা সুজাতার মনের মধ্যে উঠেছিল। কিন্তু এমন একটা আশঙ্কা স্বপ্নেও তার মনে আসে নি।

বললে, সে কী!

—হ্যাঁ। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমাদের আশ্রমে মেয়েদের থাকবার কোনো ব্যবস্থা নেই। সে প্রয়োজনও কখনও হয় নি।

আশ্বস্তভাবে সুজাতা বললে, সে কথা তাকে জানিয়েছেন?

—জানিয়েছি। সে বলে, আশ্রমের মধ্যে আশ্রয় যদি নাই মেলে, আশ্রমের কাছাকাছি কোনো ব্যবস্থা করা যায় না?

—আপনি কী বললেন?

—কী যে বলি ভেবে পাচ্ছি না মা। আমাদের দেওঘর আশ্রমের পাশেই একটা বাড়ি আছে। বাড়িটা খালি, কিন্তু ভাড়া দেবে না, বিক্রি করতে চায়।

ব্যাকুল কণ্ঠে সুজাতা বললে, কিন্তু ওর যে স্বামী আছে, ছেলে মেয়ে রয়েছে!

—জানি মা। সমস্ত ছেড়েই সে যেতে চায়।

—কিন্তু তারা যেতে দেবে কেন ?

—এই মায়াময় সংসারে যেতে কি কেউ কাউকে দেয় মা ? তবু মানুষ ঘর ছাড়ে। তাকে কেউ আটকাতে পারে না।

—কিন্তু আপনি বাধা দেবেন না ? ওর যে ঘর-সংসার সব ভেসে যাবে !

গুরুদেব হাসলেন : পরোক্ষভাবে আমি বাধা দিচ্ছি মা। কিন্তু ওর যদি সময় হয়ে এসে থাকে, বেশ জানি, আমার বাধাও টেঁকবে না।

সুজাতা হতাশভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

গুরুদেব বললেন, হয়তো শেষ অবধি ওর যাওয়া আটকে যাবে। বাড়িটা যদি ভাড়া না দেয়, ও কি কিনতে পারবে ?

সুজাতা তৎক্ষণাৎ বললে, পারবে। সেদিকে ওর অসুবিধা হবে না।

ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল অনেক দিন আগের সেই দৃশ্য : ওর বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে অংশুমান। অংশুমান থাকতে টাকার অসুবিধা ওর নেই। অহল্যা যদি ঘর ছেড়ে চলে যায়, অংশুমানের ক্ষতি কী ? বরং লাভই হবে তার।

গুরুদেব বললেন, সে অসুবিধা না থাকলে কে ওকে আটকাতে পারে ?

—আপনি পারেন না ?

—না মা। আমিও না। ঠাকুরের ডাক যদি ওর কাছে এসে থাকে,

সুজাতা ফোঁস করে উঠল : ঠাকুরের ডাক পাবার মেয়ে ও নয় প্রভু। সে মেয়ে ও নয়।

যাবার জন্যে গুরুদেব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, নিশ্চিন্ত থাক মা, ঠাকুরের ডাক না এলে ওর সাধ্য কী যায় ?

গুরুদেবের বাক্যে সুজাতা কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারল না। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করল। ইন্দ্রনাথও খবরটা শোনামাত্র সুজাতার মতোই ভয় পেয়ে গেল। এবং এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে দ্বিমত রইল না যে, সর্বপ্রকারে অহল্যার এই অপচেষ্টায় বাধা দিতে হবে।

কিন্তু বাধা দিতে যাবে কে ?

ইন্দ্রনাথ সুজাতাকে ঠেলে। সুজাতা ইন্দ্রনাথকে।

ইন্দ্রনাথ বলে, তোমার সঙ্গে সখিত্ব আছে, তোমার পক্ষে বলা সহজ। তাতেও কাজ হবে।

সুজাতা বলে, তুমি দাদা। তোমাকে মান্য করে। তোমার কথা শুনবে।

ইন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে বলে, তুমি তাকে চেন না। শিশুকাল থেকে সংসারের মধ্যে থেকেও সংসার থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কারও সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল না। বরাবর নিজের মনে একা একা থাকত। তার ওপর অসম্ভব জেদী। আমার কথা সে শুনবে এমন ভরসা রাখি না। এমন অবস্থায় দাদা হয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা ঠিক নয়।

—কিন্তু আমার কথাই কি সে রাখবে?

—হয়তো রাখবে না। তাতে তোমার লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু আমি দাদা, আমার কথা যদি সে না রাখে, আমি লজ্জা পাব।

এ কথার যাথার্থ্য সুজাতাকে মনে মনে স্বীকার করতে হল। স্বামীকে আর সে জেদ করলে না। নিজেই যেতে সম্মত হল। কালকেই নয়, ভালো করে ভেবেচিন্তে সুবিধামত আর-একদিন।

এবং দিন কয়েক পরে একদিন দুপুরে চলে গেল অহল্যার বাড়ি।

সেদিনটা ছুটির দিন নয়। সীতানাথ কাছারি গেছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে-কলেজে। অহল্যা একা রয়েছে। এবং নিরিবিলি তাকে পাবার জন্যেই সুজাতা এমনি দিন বেছে নিয়েছে।

অহল্যা তখন তার পড়বার ঘরে মেঝেয় বসে কঠোপনিষৎ পড়ছিল। সুজাতার পায়ের শব্দে চমকে মুখ তুলেই লাফিয়ে উঠল:

—বউদি, তুমি! কোনো খবর না দিয়ে! হঠাৎ!

সুজাতা বললে, হঠাৎ তোমাকে ধরব বলেই কোনো খবর দিই নি। অন্যায় করেছি?

—কিছুমাত্র না। বোস, বোস। আহা! মেঝেয় কেন? সোফার ওপর উঠে বোস।

ওর হাত ধরে তুলে সোফায় বসিয়ে অহল্যা নিজেও তার পাশে বসল।

জিজ্ঞাসা করলে, খবর কী বল? দাদা, ছেলেমেয়েরা সব ভালো?

মুচকি হেসে সুজাতা বললে, বলব কেন? আমি কি আমার বাড়ির খবর দেবার জন্যে তোমার বাড়ি এসেছি? আমার বাড়ির খবর গিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

—তাই বুঝি?

—নিশ্চয়।

দুঃখিতভাবে অহল্যা বললে, অনেকদিন তোমার বাড়ি যাওয়া হয় নি। প্রায়ই যাব-যাব করি। যাওয়া আর হয়ে ওঠে না।

—কেন? কাজটা কী?

হেসে অহল্যা বললে, কিছুই না। দেখ, যার কাজ থাকে, তার অবসরও থাকে। যার কাজ নেই, তার অবসরও নেই। আমার তাই হয়েছে।

—তাই বলে গুরুদেব যেদিন এলেন সেদিনও গেলে না?

—না। যাওয়া আর হয়ে উঠল না। উনি কি সে জন্যে কিছু বলছিলেন?

এইবার সুজাতা মনে-মনে কোমর বাঁধলে। বললে, সেজন্যে কিছু বলেন নি। কিন্তু অন্য অনেক কথা বললেন। সেই ঝগড়া করতেই তো আসা।

অহল্যা সভয়ে পিছিয়ে গেল। বললে, কী সর্বনাশ! তুমি কি ঝগড়া করতে এসেছ?

—নিশ্চয়। ভীষণ ঝগড়া।

অহল্যা হাত জোড় করলে: দোহাই বউদি, ঝগড়া নয়। হয়তো অনেক অপরাধ তোমাদের সবারই কাছে করেছি। তবু ঝগড়া নয়। আমাকে তোমরা ক্ষমা কোরো।

এমন করুণ কণ্ঠে কথাগুলো অহল্যা বললে, সুজাতার বুকের ভিতরটা হু-হু করে উঠল। দু হাত বাড়িয়ে অহল্যার শীর্ণ হাত দুটি ধরে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, তুমি নাকি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ ঠাকুরঝি?

—ছেড়ে?—অহল্যা ভাবতে লাগল, এ কথা সুজাতা কোথায় শুনলে! গুরুদেব ছাড়া এ কথা তো এখনও আর-কেউ জানে না! বললে, কোথায় যাচ্ছি?

—তুমি নাকি সংসার ছেড়ে দিচ্ছ?

—কার কাছে শুনলে?

—গুরুদেবের কাছে।

অহল্যার মুখ ধীরে ধীরে শক্ত হতে লাগল। বললে, সত্যি।

—কেন যাচ্ছ? সংসারে থেকে কি ধর্ম করা যায় না? তার জন্যে সন্ন্যাস নিতে হবে?

—সন্ন্যাস!—অহল্যা বিস্মিত কণ্ঠে বললে,—কে বললে আমি সন্ন্যাস নিচ্ছি? গুরুদেব নিশ্চয়ই বলেন নি!

—তুমি নিজেই তো স্বীকার করলে, তুমি সংসার ছেড়ে যাচ্ছ।

এবার অহল্যা হেসে ফেললে : সংসার ছেড়ে যাওয়া আর সন্ন্যাস নেওয়া কি এক ? সন্ন্যাস নেওয়ার যোগ্যতা আমি কোথায় পাব ? সে কি সহজ কথা ?

সুজাতা জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু সংসারই বা ছেড়ে যাবে কেন ? সংসারে তোমার কিসের দুঃখ ?

অহল্যা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। বললে, সংসার আমার আর ভালো লাগছে না।

-- কেন ?

—সে তো অনেক কথা বউদি। সব আমি বলতেও পারব না। বললেও তুমি বুঝতে পারবে না। এক কথায় বলি, সব দিকেই আমার হার হয়ে গেছে। আমার আর ভালো লাগছে না। অমি বাকি জীবনটা মানুষের সংস্রব থেকে দূরে থাকতে চাই।

—তার মানে ?

—তার মানে আমিও খুব ভালো বুঝি না।

অহল্যার স্বর অসম্ভব ক্লান্ত। এ আলোচনা সে আর চালাতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু সুজাতা ছাড়বে কেন ?

জিজ্ঞাসা করলে, তোমার স্বামী ছাড়বেন কেন ?

— না ছাড়তে চান, আমার সঙ্গে যাবেন।

—এই বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কাজ-কর্ম সমস্ত ছেড়ে দিয়ে ?

—না ছাড়তে পারেন, যাবেন না।

—তোমার ছেলে-মেয়ে তোমার সঙ্গে যাবে ?

—তারা কী করে যাবে ? তাদের পড়াশুনো রয়েছে।

—তাদের ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে ?

অহল্যা হাসলে : কী জানি ! কখনও তো ছেড়ে থাকি নি !

—পারবে না।—সুজাতা জেদের সঙ্গে বললে,—আমি বলছি, পারবে না।

—না পারি ফিরে আসব। তাতে তো কোনো বাধা নেই।

অহল্যা আবার হাসলে। শীর্ণ ম্লান হাসি—শীতের অপরাহ্নের মতো। সুজাতা তথাপি ক্ষান্ত হল না। জিজ্ঞাসা করলে, ছেলেমেয়েরা ছাড়বে কেন ?

—লেখাপড়া শিখতে ছেলেরা কি মায়ের কাছ-ছাড়া হয় না ? মেয়েরা যখন শ্বশুরবাড়ি যায়, মাকে সঙ্গে নিয়ে যায় ?

সুজাতার এ যুক্তি টেঁকল না। তখন সে জিজ্ঞাসা করলে, সীতানাথবাবু কি মত দিয়েছেন?

—তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না।—অহল্যা হেসে বললে,—জানবার সময়ও আসে নি। আসল কথা, এখনও কিছুই স্থির হয় নি। হলে, তোমাকে খবর দোব, আশ মিটিয়ে ঝগড়া করে যেয়ো।

অহল্যা হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল।

॥ চব্বিশ ॥

যথাসময়ে বালিগঞ্জের বাড়িটা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেল। বাড়িটা একবার দেখে যাবার জন্যে এবং গৃহসজ্জার আবশ্যকীয় নির্দেশ দেবার জন্যে সীতানাথ বহুবার অহল্যাকে সাধ্যসাধনা করেছে। কোনো-না-কোনো কাজের অছিলায় অহল্যা যায় নি।

যখন নিতান্তই সে যাবে না তখন অগত্যা সীতানাথই নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি এবং রুচি অনুযায়ী সজ্জা অনেকটা সম্পূর্ণ করলে। ওদের বড় ছেলে দীপঙ্করের বি. এ. পরীক্ষার ফলও তখনই প্রকাশিত হল।

অহল্যা সীতানাথকে জিজ্ঞাসা করলে, এবার দীপঙ্কর করবে কী? তার সম্বন্ধে কিছু কি স্থির করেছ?

কিছুই স্থির করে নি। অত যার পসার, মামলা ছাড়া আর কোনোদিকে মনোযোগ দেবার তার সময় কোথায়? সত্য কথা বলতে গেলে, দীপঙ্কর যে এবার বি. এ. দিয়েছে সে খবরটাও সে ভালো করে জানে না। একদিন যেন কথায়-কথায় শুনেছিল, কিন্তু ভালো মনে নেই।

সীতানাথ জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কী স্থির করেছ?

—আমার তো স্থির করার কথা নয়। তুমি রয়েছ। তা ছাড়া যে পড়বে তার একটা মতামত আছে।

—ঠিক কথা। সে কী বলে?

—তার সঙ্গে কথা বল।

—বেশ তো। দীপু, ও দীপু!

পাস করার আনন্দে মশগুল হয়ে দীপঙ্কর তখন তার ঘরে শিপ্রার সঙ্গে গল্প করছিল। সীতানাথের ডাকে কাছে এসে দাঁড়াল।

সীতানাথ বললে, ভারি খুশি হয়েছি তোমার পরীক্ষা পাসের খবরে। বল, এবারে কী করবে?

মাথা চুলকে দীপঙ্কর বললে, সবাই যা ঠিক করে দেবে।

অহল্যা বললে, এ কি একটা কথা হল! তোমার তো একটা ইচ্ছা আছে! জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে!

ইচ্ছা! জীবনের উদ্দেশ্য! এ সব কথা এর মধ্যে সে ভাববার অবসরই পায় নি। এতদিন শুধু পাস করবার কথাই ভেবেছে। তার জন্যে পরিশ্রম করেছে। মায়ের কথায় এই প্রথম সে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হল। খেয়াল হল, এখন সে সাবালক। তার নিজের একটা ইচ্ছা থাকা উচিত, আছেও।

বললে, আমার ব্যারিস্টারি পড়বার ইচ্ছা।

—এখান থেকে আইন পাস করে যাবে?

—কী দরকার? মিথ্যে কয়েকটা বছর নষ্ট।

—বেশ। তা হলে যাওয়ার ব্যবস্থা কর।

কিন্তু সে যে এতখানি সাবালক হয়েছে, তা সে কল্পনাও করতে পারে নি। এত সহজে, এক কথায় তার বিলাত যাওয়ার এবং ব্যারিস্টারি পড়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবে নি।

সে প্রায় লাফাতে লাফাতে চলে গেল, সম্ভবত শিপ্রাকে এই সুখবরটা জানাবার জন্যে। এত বড় একটা ব্যাপারের জন্যে সে নিজেই প্রস্তুত ছিল না। শিপ্রা তো নিশ্চয়ই নয়।

ওর যাওয়া দেখে অহল্যা এবং সীতানাথ দুজনেই পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে।

আনন্দেরই কথা। দীপঙ্কর বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে আসবে এই ইচ্ছা উভয়ের মনেই ছিল। কত দিন,—অবশ্য এখন নয়, অনেক দিন আগে যখন দুজনে অনেক কথা হত,—এ নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করেছে। সেই ইচ্ছা যখন আজ পূর্ণ হবার অবস্থায় এসেছে সীতানাথের আপত্তির কী থাকতে পারে? বিশেষ এখন তার যখন অর্থের অভাব নেই।

বস্তুত প্রস্তাবটা শুধু দীপঙ্করকে নিয়ে এইখানে থেমে গেলেই ভালো হত। কিন্তু তা হবার নয়। গত কিছুকাল থেকে অহল্যা কেবলই ভেবেছে। একা একা ভেবেছে। কারও সঙ্গে পরামর্শ করবার সুযোগ পায় নি। এমন কি তার গুরুদেবের সঙ্গেও না। এটা তার পারিবারিক কথা। বাইরের কারও সঙ্গে আলোচনা করার যোগ্য নয়।

সেই কথাটা এবারে সে পাড়লে। কথা পাড়া নয়, যেন একটা বোমা ফেললে।

অহল্যা বললে, শুধু ও নয়। আমি ভাবছি শিপ্রাও ওর সঙ্গে যাক। শিপ্রা ইণ্টারমিডিয়েট পড়ছে।

সীতানাথ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, সে কী করতে যাবে?

—পড়বে।

-- বি. এ.টা পাস করুক।

—তখন তো দীপু থাকবে না। দুই ভাই বোনে একসঙ্গে গেলে শিপ্রার অনেক সুবিধা হবে।

প্রস্তাবটা অযৌক্তিক নয়, কিন্তু অপ্রত্যাশিত।

শিপ্রাকে বিলাত পাঠাবার কথা সীতানাথ কোনোদিনই ভাবে নি। এমন কি, স্বপ্নাকে বিলাতে দেখেও তার কোনো সময় মনে হয় নি, শিপ্রাকে বিলাতে পাঠাতে হবে। এ রকমের একটা সম্ভাবনার কথা তার মনেই আসে নি।

অনেকক্ষণ সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

তারপর বললে, আজকাল কিছু কিছু মেয়ে অবশ্য বিলাত যাচ্ছে। কিন্তু এত অল্প বয়সে পাঠাতে সাহস হচ্ছে না।

অহল্যা জবাব দিলে, সেই জন্যেই তো দীপঙ্করের সঙ্গে পাঠাচ্ছি। সে সঙ্গে থাকলে ভয়ের কী আছে? সব দিক ভেবেই ওকে আমি তাই এখনই পাঠাতে চাচ্ছি।

সীতানাথ জবাব দিতে না পেরে চুপ করে রইল।

অহল্যা বললে, শিপ্রাকে ডেকে খবরটা দোব? ও খুব খুশি হবে। সত্যি কথা বলতে কি, দীপু চলে গেলে ও কী করে থাকবে তাই ভেবেই সারা হচ্ছিলাম। যা দুজনে ভাব!

এতক্ষণ পরে সীতানাথের মনে একটা প্রশ্ন জাগল: আচ্ছা, তুমি তো দীক্ষা নিয়েছ, পূজো-আহ্নিক-জপ-তপ নিয়ে মেতেছ। তুমি মেয়েকে বিলেত পাঠাতে চাচ্ছ কী করে?

এ রকম প্রশ্নের জন্যে অহল্যা তৈরিই ছিল। হেসে উত্তর দিলে, আমি তো যাচ্ছি না। মেয়ে যাচ্ছে। সে কোনোদিন জপ-তপ করবে, এমন ভরসা নেই।

অহল্যা হাসতে লাগল।

সীতানাথ বললে, কিন্তু তোমারই তো মেয়ে।

অহল্যা হেসে বললে, তোমারও।

—কিন্তু তুমি তো চাও, ও তোমার মতো ধার্মিক হবে।

—না। আমি চাই, ও ওর নিজের মতো হবে। তোমার মতোও না, আমার মতোও না। যাই, শিপ্রাকে খবরটা দিইগে।

তার কাজ হয়ে গেছে। সে উঠে গেল।

সীতানাথের মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। অতটুকু মেয়েকে তার বিলাত পাঠাতে ইচ্ছা ছিল না। দীপঙ্করই বা কতটুকু? তার সঙ্গে পাঠানোরও মানে হয় না। কিন্তু সে জানে, অহল্যা যখন জেদ ধরেছে, ছাড়বে না। ইদানীং অহল্যার সঙ্গে সীতানাথের সম্পর্কটি এমন হয়েছে যে, ওর সঙ্গে মতান্তর করতে সীতানাথ ভয় পায়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সীতানাথকে রাজি হতে হল।

পাসপোর্ট এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যবস্থা করে নভেম্বরে ওরা দুজনে চলে গেল। এবার বালিগঞ্জের নতুন বাড়িতে উঠে যাওয়ার পালা।

সীতানাথ সেই পরামর্শ করতে এল। দেখে, শোবার ঘরে মেঝেয় বসে অহল্যা নতমুখে কী যেন চিন্তা করছে আর আঙুল দিয়ে মেঝেয় নকশা কাটছে।

সীতানাথকে দেখে অহল্যা একমুখ হাসির সঙ্গে ওকে অভ্যর্থনা করলে। ওর মুখে এমন অনাবিল হাসি সীতানাথ বহুদিন দেখে নি।

হেসে জিজ্ঞাসা করলে, মেঝেয় বসে?

—কেন, মেঝে কি খারাপ জায়গা? ওই চেয়ারটায় বোস। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

চেয়ারে বসে সীতানাথ পরিহাস করে বললে, আমার সঙ্গে! আমি ভেবেছিলাম, আমার সঙ্গে তোমার সমস্ত কথা শেষ হয়ে গেছে।

—এখনও যায় নি।

অহল্যা হাসতে লাগল। তার অনেক দিন আগেকার হাসি। সীতানাথ অবাক হয়ে দেখলে, হাসলে এখনও তার গালে টোল পড়ে। অহল্যা হাসতে পারে। এখনও হাসতে ভুলে যায় নি।

তার মনের মধ্যে বিন্দু বিন্দু মধু জমতে লাগল।

বললে, বল কথা। শুনি। অনেক দিন তোমার কথা শুনি নি। অথচ জান না, তোমার কথা, তোমার হাসি আমার কি ভালো লাগে!

চোখে একটা বিলোল কটাক্ষ টেনে অহল্যা জিজ্ঞাসা করলে, কত ভালো লাগে?

মানুষের মন কি ফিল্ম নয়? শূন্য মুকুর? কিছুই কি সেখানে স্থায়িভাবে থাকে না? যে যখন সামনে থাকে তার ছবি পড়ে, চলে গেলেই আবার যে-মুকুর, সেই শূন্য মুকুর?

স্বপ্না এখন সামনে নেই। সীতানাথের মনের মুকুর জুড়ে অহল্যার ছবি।

বললে, তোমার কোনো ধারণা নেই।

আবেগে সীতানাথের কণ্ঠ গদগদ।

স্মিত হাস্যে অহল্যা বললে, কোনো ধারণাই নেই! ধারণা একটা করিয়ে দাও না।

—তুমি নিজে না ধারণা করলে আমি কী করে করিয়ে দিই বল?

—আমাকে নিজেকে ধারণা করতে হবে?

—নিশ্চয়। প্রেমের মানে-বই নেই।

—তাই?—অহল্যা আর একটা কটাক্ষ হানলে,—আচ্ছা, আমি যদি বলি, তোমার বাড়ি-ঘর, টাকাকড়ি, মামলা-মক্কেল সমস্ত ফেলে দিয়ে আমার সঙ্গে চল। যেতে পার?

—কোথায়?

—যেখানে আমি নিয়ে যাব। বনে, কিংবা ধর কোনো আশ্রমে।

সীতানাথ হাসতে লাগল: দোহাই তোমার, তা পারব না। বালিগঞ্জে বাড়ি করলাম শখ করে, সেখানে বাস করতে হবে। লোকজন, টাকাকড়ি, মান-সম্ভ্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি,—এক কথায় যাকে ঐশ্বর্য বলে—বিন্দু বিন্দু করে তা পান করতে হবে। আমার অনেক সাধ, অনেক আকাঙ্ক্ষা। সে সমস্ত ছেড়ে যেতে পারব না।

অহল্যা হেসে বললে, অর্থাৎ আমার সঙ্গে তুমি সিনেমা-থিয়েটার পর্যন্ত যেতে পার। তার বেশি নয়। না?

সীতানাথও হেসে বললে, হ্যাঁ।

অহল্যা ধীরে ধীরে আবার গম্ভীর হয়ে আসছে। বললে, যতীন সেনগুপ্তের একটা কবিতা আছে। পড়েছ?

—না। কবিতা আমি পড়ি না। কী কবিতা?

অহল্যা বললে, কবিতার দুটি লাইন হচ্ছে :

মরণে কে হবে সাথী ?

প্রেমধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি।

সীতানাথ হো-হো করে হাসতে লাগল : ঠিক লিখেছেন। চমৎকার লিখেছেন। এই যে বললে, সিনেমা পর্যন্ত একসঙ্গে দুজনে যেতে পারি। তার বেশি নয়। এই সংসার।

—হ্যাঁ। এই সংসার।—দেখতে দেখতে অহল্যার সুন্দর মুখ গাম্ভীর্যে কঠিন হয়ে উঠল।—তোমাকে বলা হয় নি, আমি দেওঘরে একটা বাড়ি কিনেছি।

সীতানাথ চমকে উঠল : তুমি! দেওঘরে!

—হ্যাঁ। ছোট্ট বাড়ি। খবর পেয়েছি, তার টুকিটাকি মেরামত শেষ হয়েছে। এখন কোনও রকমে সেখানে বাস করা যায়।

—বাস করা যায়! সীতানাথ লাফিয়ে উঠল।—তুমি সেইখানে বাস করার কথা ভাবছ ?

—হ্যাঁ।

—বালিগঞ্জের অমন চমৎকার বাড়ি ফেলে! মাথা খারাপ!

অহল্যা হাসলে। শীর্ণ ম্লান একফালি হাসি। বললে, তাই হবে বোধ হয়। মাথাই খারাপ হচ্ছে। কিন্তু এ আমি স্থির করে ফেলেছি।

—স্থির করে ফেলেছ ? তোমার ছেলেমেয়ের কথা ভেবেছ ?

—ভেবেছি। ভেবেই ওদের দুজনকে বিলেত পাঠালাম।

—আর ছোটটি ?

—তাকে গুরুদেবের আশ্রমে রাখব।

—এও স্থির করেছ ? আমার অনুমতির দরকার হয় নি ?

—না। আমি তোমার দৃষ্টান্ত থেকে ওদের দূরে রাখতে চাই।

—আমার দৃষ্টান্ত থেকে ? কেন, আমি কী ?

এবারে সীতানাথ রেগে উঠল।

—সে তুমিই জান।

শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিয়ে অহল্যা চলে যাচ্ছিল।

তার পথরোধ করে সীতানাথ চিৎকার করে উঠল : না। বিলুকে আশ্রমে পাঠানো হবে না। তুমি যেতে পাবে না। আমি এ পাগলামিকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেব না।

অহল্যার চোখ দিয়ে যেন এক ঝলক আগুন বেরিয়ে এল। তথাপি সংযত কণ্ঠে বললে, চেঁচিও না। চাকর-বাকর রয়েছে। কেলেঙ্কারি করার মিথ্যে চেষ্টা করো না। আমার সংকল্পের বদল হবে না। সর।

শেষ শব্দটা বোধ হয় একটু জোরেই উচ্চারিত হয়েছিল। সীতানাথ সরে দাঁড়াল। অহল্যা ঘর থেকে চলে গেল।

॥ পঁচিশ ॥

সীতানাথের সঙ্গে অহল্যার বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেল।

স্ত্রীলোকের এত স্পর্ধা সে সহ্য করতে পারে না। অথচ অহল্যাকে সে চেনে। জানে, সে যাবেই। চাকর-বাকরের সামনে মিথ্যে কেলেঙ্কারি করে সত্যিই লাভ নেই।

একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে সে রয়েছে। কখন খায়, কখন বাড়ি ফেরে তার স্থিরতা নেই। কোনও কোনও রাত্রে সে একেবারেই ফেরে না।

বিল্কু আশ্রমে চলে গেল। সীতানাথ জানতেও পারলে না। বাধা দেওয়া তো দূরের কথা।

বাধা দেওয়ার বোধ হয় আর তার ইচ্ছাও ছিল না।

অহল্যার সঙ্কল্পের কথা প্রথম যখন সে শুনলে, তখন তার পায়ের তলার মাটি যেন কাঁপছিল। এক্ষুনি সরে যাবে যেন পায়ের তলা থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে যেন সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন আর পৃথিবীর কাছে, সমাজের কাছে, মানুষের কাছে তার কোনও দায়িত্ব থাকবে না।

গত কিছুকাল থেকে যে সম্পর্ক অহল্যার সঙ্গে দাঁড়িয়েছে তাতে তাকে নিরস্ত করতে পারে এমন শক্তি তার নেই। অহল্যা হৈ-চৈ করে না—নিঃশব্দ, গম্ভীর। ভিতরে তার জেদের যে ফল্গুধারা বয়, সীতানাথ জানে, তার গতি রোধ করতে কেউ পারে না। সে নিজে তো নয়ই। আজ তার জীবন উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে, কিন্তু যখন তা ছিল না, মতভেদের ক্ষেত্রে চিরদিন তাকেই নতিস্বীকার করতে হয়েছে।

কিন্তু মামলা-মোকদ্দমার চাপে কিছুটা, কিছুটা নতুন উচ্ছৃঙ্খল জীবনের জন্যে, অন্য কথা ধীরে-সুস্থে ভাববার তার সময়ও নেই, মনও নেই। নইলে তার মনে প্রশ্ন জাগত, অহল্যা এমন করে চলে যাচ্ছে কেন?

অবশ্য প্রশ্ন জাগলেই যে অহল্যার মনের সব কথা সে বুঝতে পারত তা নয়। তবু নিজের দিকের কথাটা অন্তত বুঝত। দৃষ্টি পড়ত নিজের

উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের দিকে। সন্দেহ করতে পারত, তার আচরণের সঙ্গে অহল্যার সংসার-ত্যাগের ইচ্ছার নিগূঢ় সংযোগ আছে। তার জন্যে হয়তো নিজেকেই সম্পূর্ণ দায়ী করত। কিন্তু তার বাইরে আরও কারণ যে থাকতে পারে, সে সব কি বুঝতে পারত?

নিরুপায়ের উপায় হিসাবে ও গেল অংশুমানের কাছে। যদি অংশুমান কিছু করতে পারে। অংশুমান নিঃশব্দে সমস্ত কথা শুনলে। এর কিছু সে জানত, কিছু অনুমান করতে পারলে, অবশিষ্ট জানত না।

যেমন, অহল্যার বাড়ি কেনার ইচ্ছার কথা জানত। গহনা বিক্রির কথাটাও। জানত না, বাড়ি কেনা হয়ে গেছে। কিন্তু অনুমান করতে পারে। দীপঙ্কর-শিপ্রা বিলাতে গেছে, সে কথা জানে। কিন্তু ছেলেটিকে আশ্রমে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে তা জানত না। অনুমানও করে নি। জানত, অহল্যা শেষ জীবনটা দেওঘরে কাটাবার সঙ্কল্প করেছে। কিন্তু এত শীঘ্র যাবে তা অনুমান করে নি। যাবেই যে, তারও কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। বরং ভরসা করেছিল, শেষ পর্যন্ত অহল্যা না যেতেও পারে। ঘর-সংসার ছেড়ে যাওয়া তো সহজ কথা নয়। একদিন মান-অভিমানের পালা মিটে যাবে। অহল্যাও রয়ে যাবে। সীতানাথের কথা শুনে বুঝলে, অহল্যা সংসারে থাকবে না। ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে।

সীতানাথ উত্তেজিতভাবে সমস্ত কথা বলতে লাগল। অংশুমান নিঃশব্দে সমস্ত কথা শুনে গেল। কখনও ললাটে ভ্রূকুটিরেখা ফুটে উঠল, কখনও চোখে বিস্ময়, কখনও বা শান্তভাবে শুনে গেল।

অবশেষে সীতানাথ জিজ্ঞাসা করলে, আমি কী করি বলুন?

অংশুমান জবাব দিতে পারলে না। স্ত্রী যখন চলে যাবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়, নিষ্ফল কেলেঙ্কারি করা ছাড়া স্বামী তখন কী করতে পারে?

বললে, কিছুই করবার দেখছি না।

সেটা সীতানাথও জানে। সে নিজেও কিছুই করবার দেখছে না। কিছুই করতে পারেও নি। কিন্তু সেই উত্তরই যখন অংশুমানের মুখ থেকে এল তখন উত্তেজিত হল।

বললে, কিছুই করবার নেই? স্ত্রী স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে যাবে? নিজের ছেলে অনাথ বালকের মতো আশ্রমে মানুষ হবে?

—তাকে আপনি জোর করে নিজের কাছে রাখতে পারেন। কিন্তু ছেলে

নিতান্ত ছোট, আপনিও বেশির ভাগ সময় বাইরে নানা কাজে ব্যস্ত। তাকে দেখবে কে?

—সেই তো ভাবছি।

আরও কিছুক্ষণ ভেবে সীতানাথ আরও উত্তেজিত হল: সেই ছেলেমেয়ে দুটো বিলেত থেকে ফিরে দেখবে,—কি হয়তো তার আগেই খবর পাবে, আমার চিঠিতেই হোক আর ওর চিঠিতেই হোক—মা বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে!

সান্ত্বনার স্বরে অংশুমান বললে, ধর্ম করতে।

—ধর্ম করতে!—সীতানাথ বারুদের মতো ফেটে পড়ল।—একে ধর্ম বলেন! স্বামীকে ছেড়ে, ছেলেমেয়ে ছেড়ে, সংসার ছেড়ে, এমনি করে মেয়েদের ধর্ম হয়! ধর্মের মুখে আগুন তা হলে।

দুই হাত মুঠিবদ্ধ করে সীতানাথ উঠে দাঁড়াল।

এবং আরও কিছুক্ষণ চিৎকার করে, উত্তেজিতভাবে পায়চারি করে অবশেষে এক সময় সে চলে গেল।

একেবারে স্বপ্নার কাছে।

স্বপ্না তার কিছু আগে কাজ থেকে ফিরে স্নানান্তে প্রসাধন করছিল। ঝড়ের বেগে সীতানাথকে ঢুকতে দেখে এবং তার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে সে চমকে উঠল।

মৃদু অথচ দৃঢ় ভর্ৎসনার স্বরে বললে, ছিঃ! দিনের বেলা থেকেই খেতে আরম্ভ করেছ?

ব্যস্তভাবে কোটটা খুলে হ্যাঙ্গারে রেখে সীতানাথ বললে, না। এইবার আরম্ভ করব। সমস্ত রাত, যতক্ষণ না জ্ঞান হারাচ্ছি।

সদ্য-কেনা সেলার থেকে সীতানাথ মদ বার করলে। এবং মেঝেয় বসে গ্লাসে ঢেলে নির্জলা ঢক ঢক করে পান করতে লাগল।

স্বপ্না ছুটে এসে ওর হাত চেপে ধরলে: কর কী! কর কী!

সীতানাথ চিৎকার করে উঠল: চোপ রও।

স্বপ্না সভয়ে পিছিয়ে এল।

বিদায়ের দিন একটা নিরিবিলি মুহূর্তে অহল্যা ওর লাইব্রেরি-ঘরে গেল। হেসে বললে, সন্ধ্যে ছটায় আমার গাড়ি। তুমি কি তখন ফিরতে পারবে?

সাজ-সজ্জা অহল্যা অনেক দিন ত্যাগ করেছে। তার আজকের মতো দীন বেশ সীতানাথ কিন্তু কখনও দেখে নি। মনটা তার একবার একটু তরল হয়েই আবার শক্ত হয়ে গেল।

বললে, বোধ হয় না। একটা জরুরী মামলায়

বাধা দিয়ে অহল্যা বললে, আমিও সেই রকমই অনুমান করেছিলাম। তাই প্রণাম করবার জন্যে এলাম।

গলায় আঁচল দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করতে গিয়ে অহল্যা মাথাটা ওর পায়ের ওপর অনেকক্ষণ রাখলে। তারপর উঠে মুখে হাসি টেনে বললে. আমি কোনও দুঃখ নিয়ে যাচ্ছি না। কারও ওপর আমার রাগ-অভিমান নেই। তুমিও মনে কোনও দুঃখ রেখো না।

সীতানাথ বললে, তোমার সঙ্গে শেষবারের মতো দুটো মনের কথা বলি. এমন সময় আমার নেই। তবু জিজ্ঞেস করি, কেন যাচ্ছ জানতে পারি ?

—ভালো লাগছে না বলে। বিশ্বাস কর, এই মুহূর্তে এ ছাড়া আমার যাওয়ার আর-কোনও কারণ নেই।

সীতানাথ আর-কিছু বললে না। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে। চাকরটা সমস্ত ফাইল তুলে দিয়ে এল। সীতানাথ কোটটা কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়াল।

অহল্যা বললে, বিল্‌কুর খবর মাঝে মাঝে নিয়ো।

উত্তরে সীতানাথ গোঁ-গোঁ করে কী বললে বোঝা গেল না। অহল্যা আর অপেক্ষা না করে চলে এল।

হাতে এখনও অঢেল সময়। গোছগাছের বাকি কিছু নেই। দুটো কম্বল আর একটা বালিশ বাঁধা হয়ে গেছে। একটা টিনের তোরঙ্গে খানকয় শাড়ি, সেও বিনুর মা সকালেই গুছিয়ে রেখেছে।

বিনুর মা অহল্যার সঙ্গে যাবে। কিছুতেই ছাড়লে না। এ বাড়িতে সে-ই সবচেয়ে পুরনো ঝি। অহল্যা বধূবেশে এ বাড়ি যেদিন আসে, তার অনেক আগে থেকে সে আছে। তারপরে কত দাসী-চাকর এসেছে গেছে, সে কিন্তু একটানা রয়ে গেছে।

বললে, আমি তোমার সঙ্গে যাব বউদি।

—তুই কী করতে যাবি ?

—না বউদি, যাব। থেকেই বা কী করব বল ? বয়েস হয়েছে, খেটে খাবার গতর নেই। তিনকুলে আপনার বলতেও কেউ নেই। তোমার

কাছেই এতকাল কাটালাম। শেষ ক'টা দিন আর 'না' বোলো না। তোমার আচ্ছয়েই থাকতে দাও।

চলুক।

তা ওরও কোনো সাড়া নেই। অহল্যা ওর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে, বাক্স-বিছানা আর একটি রাশ পোঁটলা-পুঁটলির মধ্যখানে বিন্নুর মা চুপ করে বসে আছে।

—ও কী রে! অত জিনিসপত্র কিসের?

বিরক্তভাবে বিন্নুর মা বললে, এইটে কোথায় রাখি বল তো? তোমার বাক্সয় জায়গা আছে?

—কী ওটা?

—একটুখানি পুরনো তেঁতুল বউদি। খাওয়ার শেষে একটুখানি টক না হলে আমার পেট ভরে না। বিদেশ বিভুঁই, সেখানে হয়তো তেঁতুল পাওয়াই যায় না। হবে একটু জায়গা?

অহল্যা অবাক।

বললে, তুই কী ভেবেছিস বিন্নুর মা! আমরা কি চেঞ্জে যাচ্ছি?

—তা ভাবব কেন? কিন্তু সন্নিসীকেও তো দুটো খেতে হবে বউদি। পোড়া পেট তো মানবে না।

বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বিন্নুর মা বললে।

অহল্যা রেগে বললে, পোড়া পেট নিয়ে তুই এইখানেই থাক্ তা হলে। তোকে যেতে হবে না।

—ওই তে তোমার দোষ বউদি। একটুকুনেই রেগে যাও। কী, না একটুখানি তেঁতুল। তা থাক্, তেঁতুল আমার এই পোঁটলার মধ্যেই নোব।

বিন্নুর মা গজগজ করতে করতে পোঁটলার মধ্যেই তেঁতুলের তালটা রাখলে। পোঁটলার আয়তন এবং ভিতরের জিনিসপত্র দেখে অহল্যা গালে হাত দিলে।

—অত বড় পোঁটলায় কী আছে রে?

বিন্নুর মা ব্যস্তভাবে বললে, কিছু নেই বউদি। তোমার দিব্যি করতে পারি।

—কিছু নেই যদি তো অমন মোটা হল কী করে?

—ও দেখতেই মোটা বউদি। ভেতরে কিছু নেই।

—খোল্। দেখি, ভেতরে কিছু আছে কি না!

বিন্নুর মাকে খুলতে হল। দেখা গেল, কিছু সোনামুগের ডাল, দু-তিন রকমের বড়ি, সরষে, পোস্ত, ভাঁড়ারের কোনও জিনিসই বাদ যায় নি। সব কিছু কিছু আছে, মায় খানিকটা আমসত্ত্ব পর্যন্ত।

গম্ভীরভাবে অহল্যা বললে, বিন্নুর মা, তুই যাস না। তুই থাক্। আমি ব্যবস্থা করে দিয়ে যাচ্ছি। তোকে কেউ কিছু বলবে না। শেষ জীবনটা এইখানে নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবি।

—না।

বিন্নুর মা হাঁউ মাউ করে উঠছিল আর কি। অহল্যা ধমক দিলে, আমার সঙ্গে যেতে গেলে ওসব কিছু নিয়ে যেতে পারবি না।

—কিছু না?

—না। একটা বাক্স শুধু। আর আমি টাকা দিচ্ছি, দুখানা কম্বল কিনে আন্।

এইবার বিন্নুর মা অহল্যার পা দুটি জড়িয়ে ধরলে।

—সোনামুগ, ঝোলের বড়ি, আমসত্ত্ব থাক্। কিন্তু বিছানা নইলে ঘুম হবে না বউদি। আমি সব পারি, শুধু খেটে খুটে এসে একটু নরম পোস্কার বিছানা নইলে ঘুমুতে পারি না।

অহল্যার হাসি এসে গিয়েছিল। কোনমতে হাসি চেপে বললে, আচ্ছা, তা হলে বিছানাটা নে আর ওই বাক্সটা। আর যদি কিছু নিবি, সব আমি ট্রেনের জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

বলেই আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে হাসি চাপতে নিজের ঘরে চলে গেল।

•

বাস্! ছুটি। অহল্যার ছুটি হয়ে গেল।

খাটের উপর বিছানায় যখন সে শুয়ে পড়ল, মনে হল শরীরের গ্রন্থিগুলো সব শিথিল হয়ে গেছে। কিছুটা শ্রান্তিতে, কিছুটা প্রশান্তিতে। দীর্ঘকালীন যুদ্ধের ফলে এত শ্রান্তি যে তার দেহে-মনে জমে ছিল, এই মুহূর্তের আগে সে টেরই পায় নি।

যুদ্ধ শেষ।

সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ-অশান্তি, জয়-পরাজয়ের দুশ্চিন্তা থেকে এবারে

অবারিত ছুটি। টান বাজছে না স্নায়ু-শিরায়। মনের আকাশ প্রশস্ত প্রশান্তিতে উদার নির্মল। দেহ যেন ভারমুক্ত।

সীতানাথের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে। তা যে এত সহজ হবে তা ভাবে নি। মনে মনে ভয় ছিল এই চরম মুহূর্তের জন্যে। এক গাদা ব্রীফ নিয়ে ব্যস্ত সীতানাথ গাড়িতে গিয়ে উঠল। অহল্যার দিকে চাইবার ফুরসতও তার নেই।

অহল্যা হাসল।

না, সীতানাথের উপর বিন্দুমাত্র রাগ অভিমান তার নেই। সমস্ত দিকের বাঁধন ঠাকুর অত্যন্ত সহজেই কেটে দিলেন।

এখন অংশুমানের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া। আবশ্যক কিছু নেই। তবু একবার নেওয়া। আজই যে অহল্যা চলে যাচ্ছে, হয়তো সে জানেই না। কী করে জানবে? অহল্যার সঙ্গে অনেক কাল তার দেখাই নেই।

অহল্যার উঠতে ইচ্ছা করছে না। আরও অনেকক্ষণ এমনি শুয়ে থাকতে চায় সে। তবু উঠল। টেলিফোনে ডাকলে তাকে।

অহল্যার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত প্রথম শব্দেই অংশুমান তাকে চিনে ফেললে। যেন এই কণ্ঠস্বরের জন্যেই সে অপেক্ষা করছে, এমনি ব্যগ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে :

—অহল্যা ?

—হ্যাঁ।

—ছটায় তোমার গাড়ি ?

অহল্যা অবাক হয়ে গেল, অংশুমান সমস্ত খবরই রাখে!

বললে, হ্যাঁ, সেই রকমই তো ঠিক হয়েছে।

—অহল্যা, তুমি জান না, চিরদিন তোমাকে ভয় করে এসেছি। আজও ভয়ে ভয়ে একটা কথা জিগ্যেস করি। জবাব দেবে ?

—বল।

—আমাদের ছেড়ে তুমি কেন চলে যাচ্ছ? আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে গেলেই কি শান্তি পাওয়া যায় ?

—তা জানি না। তবে শান্তি পেতে গেলে আত্মীয়-স্বজনকে ছাড়বার দরকার হয় কখনও কখনও।

—এই কথা তোমার গুরুদেব বলেন ?

—কখনও-কখনও বলেন বই কি।

—কিন্তু শুনেছি তাঁর অনেক গৃহী শিষ্য-শিষ্যা আছেন। তাঁদের সবাইকেই তিনি সংসার ছাড়তে বলেন?

—সবাইকে বলেন না নিশ্চয়ই। বললে তাঁরা সংসারে থাকবেন কেন?

—শুধু তোমাকেই বলেছেন?

—আর যাঁরা তাঁর সঙ্গে আশ্রমে থাকেন তাঁদেরও বলেছেন বোধ হয়।

একটু থেমে অংশুমান আবার জিজ্ঞাসা করলে, আমাদের ওপর কোনো রাগ নেই তো তোমার?

অহল্যা তৎক্ষণাৎ বললে, কিছুমাত্র না। বিশ্বাস কর, কারও ওপর আমার রাগ-অভিমান নেই। আসল কথা, আমার ভালো লাগছে না।

—কেন লাগছে না?

—তাও জানি না। শুধু জানি, ভালো লাগছে না। এই কথা ওঁকেও বলেছি।

—সীতানাথবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—হয়েছে।

—তিনি খুব রেগে গেছেন বোধ হয়?

—বোধ হয়।

—তিনি কি স্টেশনে যাচ্ছেন?

—না বোধ হয়। তাঁর সময় কোথায়?

অংশুমান আবার একটুক্ষণ কী যেন ভাবলে। জিজ্ঞাসা করলে, তোমার সঙ্গে কে যাচ্ছে?

—আমার ঝি বিন্দুর মা। সে ছাড়লে না। আর আশ্রমের একজন সন্ন্যাসী।

—আর-কেউ না?

—আর কে যাবে বল?

—আমি যদি যাই, আমাকে সঙ্গে নেবে?

—দেওঘর পর্যন্ত এই পথটুকু?

—না। তারও পরে যতটা পথ আছে ততটা?

কথাটা পরিহাসের মতো শোনাল না। কণ্ঠস্বর বড় করুণ, বড় কোমল, ভিজে।

—তোমার ঐশ্বর্য, তোমার সহস্র কাজ, তোমার প্রভাব-প্রতিপত্তি

—সমস্ত ফেলে দিয়ে যাব। ওসব আমাকে আর টানছে না।

—সত্যি ?

—সত্যি। তুমি একবার ডাক, তুমি একবার বল, চল। দেখ পারি কি না!

অহল্যা স্তম্ভিত।

অনেকক্ষণ পরে বললে, আমার ডাকে ?

—হ্যাঁ। তোমার গুরুদেবের ডাকে নয়। ঈশ্বরের ডাকেও নয়। কিন্তু তুমি ডাকলে পারি।

অহল্যা অকস্মাৎ কেমন অভিভূত হয়ে গেল। তার যেন কথা বলার শক্তি চলে গেছে।

কোনোমতে আবার জিজ্ঞাসা করলে, সত্যি পার ?

—নিশ্চিত পারি। ডেকে দেখ। জঞ্জাল যা জমিয়েছি, লোকে যাকে রাজার ঐশ্বর্য বলে, সমস্ত দু' পায়ে মাড়িয়ে চলে যেতে পারি।

—কোথায় ? তুমি যেখানে নিয়ে যাবে। জানতে চাইব না কোথায়। একবার ডেকে দেখ।

অহল্যা যেন দারুভূত হয়ে গেছে। সাড়া দিতে পারছে না।

অংশুমান আবার বললে, তুমি ডাকতে পারবে না জানি। তাই কী করেছি জান ?

অহল্যা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কী করেছ ?

—মধুপুরে আমিও একটা ছোট্ট বাড়ি কিনেছি।

—কী করবে সেখানে ?

—কিছুই করব না। শুধু তোমার কাছাকাছি রয়েছি এই আনন্দে মশগুল হয়ে থাকব। না, না। তোমার ভয় পাবার কারণ নেই। নিশ্চিন্ত থাক, আমি কোনও দিন তোমার আশ্রমপীড়া ঘটাব না। কোনও দিন তোমার সামনে পর্যন্ত যাব না।

অহল্যা চুপ করে রইল।

অংশুমান বললে, কী ভাবছ ?

—ভাবছি তোমার তৃষ্ণা কি মিটে গেল ?

অংশুমান হো-হো করে হেসে উঠল। ছেলেবেলাকার সেই হাসি, যা শুনে অহল্যা অনেক দিন চমকে উঠেছে।

বললে, তৃষ্ণা মেটে না। আমি পুজো-আচ্চা করি নি, কিন্তু সংসারে দেখেছি অনেক। তৃষ্ণা মেটে না। তোমার মেটে নি, তোমার গুরুদেবেরও মেটে নি, আমারও না। তৃষ্ণা শুধু মোড় ফেরে। ঘুরে ঘুরে মোড় ফেরে। এক বস্তু থেকে আর-এক বস্তুতে। পাওয়া থেকে না-পাওয়ায়। আমার কথা বুঝতে পারছ?

--না।—অহল্যা অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। আর্তকণ্ঠে বললে,—কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি আমাকে আর লোভ দেখিও না।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে অংশুমান উত্তর দিলে,—লোভ তো দেখাই নি অহল্যা। তুমি জানতে চাইলে, তাই বললাম। এবার টেলিফোন ছেড়ে দিই? তোমায় আর দেরি করাব না।

শুষ্ক কণ্ঠে অহল্যা বললে, হ্যাঁ। যাবার আগে তোমাকে প্রণাম করা হল না কিন্তু।

—কিছু দরকার নেই। আমি এমনি তোমাকে আশীর্বাদ করছি। তোমার কল্যাণ হোক, তোমার যাত্রা সফল হোক।

ফিরে এসে অহল্যা আবার খাটে শুয়ে পড়ল। দেহ আর যেন হালকা নয়, গুরুভার। যা ছিল তুলার মতো হালকা, জলে ভিজে তা লোহার মতো ভারী হয়ে গেছে।

সমস্ত পথ ট্রেনের ঘটাঘট ঘটাঘট শব্দের সঙ্গে তাল দিয়ে চলেছে, অংশুমানের সেই কথা: তৃষ্ণা মেটে না। মানুষের তৃষ্ণা কখনও মেটে না। মানুষের তৃষ্ণা...

শুক্ল সন্ধ্যা। বাইরে চাঁদ উঠেছে আকাশে। এক ফালি বাঁকা চাঁদ। কী সুন্দর চাঁদ! অহল্যার একমাত্র সঙ্গী, ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে।

লেখক-পরিচিতি

সৃষ্টি-সাধনার জীবনই সাহিত্য-স্রষ্টার প্রকৃত জীবন, তার দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনটা হচ্ছে এই মহাজীবনেরই পরিপূরক। এবং পরিপূরক বলেই কথাশিল্পীর ব্যবহারিক জীবন-কথাও জানা আবশ্যক হয়ে পড়ে অনেক সময়।

১৯২৭ সনে 'আত্মশক্তি' সাপ্তাহিকেই ছোটগল্প-লেখকরূপে সরোজ-কুমারের প্রকৃত আত্মপ্রকাশ বলা যেতে পারে। এর দুই বছর আগে অবশ্য 'নিরুপমা বর্ষস্মৃতি' নামের এক সাহিত্য-সংকলনে একটি গল্প লিখেছিলেন তিনি। তবু 'আত্মশক্তি'র ওই গল্প-("রমানাথের ডায়েরি")-টিই সাহিত্য-জগতে ওঁর প্রাথমিক পরিচিতির মূল।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত বহু গল্প, বহু উপন্যাস লিখে চলেছেন সরোজ-কুমার, আজও তাঁর সৃষ্টিধারা অম্লান, এবং বলা কর্তব্য, তাঁর রচনা স্বকীয়তায় বিশিষ্ট—নতুন ধারা ও চিন্তায় চিহ্নিত।

গিরিডিতে ১৯০৩ সালে সরোজকুমারের জন্ম। পিতার নাম—মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী। বাল্যকাল মুখ্যত কাটে ছোটনাগপুরে। পৈতৃক নিবাস মুর্শিদাবাদে মালিহাটি গ্রামে এবং এখানেই তার শিক্ষার শুরু।

কৈশোর-কালে চলে আসেন তিনি ছোটনাগপুরে। সালার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯১৮ সনে। কলেজের পাঠ শুরু হয় হাজারিবাগে, তার পর বহরমপুরে। বহরমপুরে যখন বি-এ পড়ছেন, তখন এদেশে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল প্রবাহ। কলেজ ছেড়ে সেই প্রবাহে ভেসে পড়লেন সরোজকুমার।

আন্দোলনের প্রবাহ কিছু মন্দগতি লাভ করবার পর, সরোজকুমার ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন কিছুকাল। সেই সূত্রে নাগপুর, পাটনা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করে অবশেষে ফিরে এলেন কলকাতায়।

কলকাতায় তখন 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরোজকুমার অবিলম্বে ভর্তি হলেন 'জাতীয় বিদ্যালয়ে' এবং যথাসময়ে বেরুলেন বি-এ পাস করে। এখানেই তাঁর পরিচয় হয় সুভাষচন্দ্র বসুর এবং কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে। সুভাষচন্দ্রের অনুরোধেই তিনি 'আত্মশক্তি'র সম্পাদকীয়

বিভাগে যোগদান করেন। শুরু হল তাঁর সাংবাদিক-জীবন। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য 'আত্মশক্তি' ছেড়ে 'বৈকালী' 'নায়ক' প্রভৃতি কাগজে কাজ করে আবার একসময় ফিরে আসেন 'আত্মশক্তি'তে। 'আত্মশক্তি' নব-কলেবরে 'নবশক্তি'-রূপে প্রকাশিত হলে, তিনি হন এর সম্পাদক। 'নবশক্তি'তে রবীন্দ্র মৈত্রের রাজদ্রোহমূলক একটি কবিতা প্রকাশিত হয় এবং যথারীতি রাজরোষে পড়ে সম্পাদক হিসাবে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় সরোজকুমারকে।

কারাপ্রাচীর থেকে মুক্তি লাভ করার পরই সরোজকুমারের সাহিত্যিক জীবনের শুরু। এই 'শুরু'র আভাষ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

কথায় বলে, 'যার শুরু আছে, তার শেষও আছে।' কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে একথা ঠিক খাটে না। সাহিত্যরচনার শেষ হয়তো একদিন ঘটে কিন্তু তার দীপ্তি অত সহজে হারিয়ে যায় না, তা কাল থেকে কালান্তরে বিকরিত হতে থাকে। সরোজকুমার আজও সমান সক্রিয়, এমন কি আজও তাঁর রচনায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই।

ব্যবসায়, সাংবাদিকতা ও কারাজীবন—ব্যবহারিক জীবনের এই মূলত ত্রিধাবিভক্ত অভিজ্ঞতার আলোয় তিনি মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন, এবং ওই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিই তাঁর বহু রচনার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে ছড়িয়ে আছে।

তাই তাঁর সাহিত্যশিল্পকর্ম এত সংহত, এত আন্তরিক এবং এত মর্মস্পর্শী। তাঁর চোখ আছে, মন আছে, মনন আছে, আর আছে দরদী অন্তর।

গ্রাম্য কৃষকজীবনকে ভিত্তি করে তাঁর উপন্যাসত্রয়—ময়ূরাক্ষী, গৃহকপোতী, সোমলতা—একদিকে যেমন মাধুর্য আর শান্তরসে মণ্ডিত, তেমনি তীব্র তীক্ষ্ণ বাস্তব নাগরিক জীবনের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে—শৃঙ্খল, শহরতলী, শতাব্দীর অভিশাপ, কালোঘোড়া প্রভৃতি গ্রন্থে।